আকাশ-বাসর

আকাশ-বাসর

শ্রীসজনীকান্ত দাস

ইষ্টার্ণ পাব্‌লিশার্স সিণ্ডিকেট, লিঃ
পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক
৮-সি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

—প্রকাশক—
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৮-সি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা

কার্ত্তিক, ১৩৫১

মূল্য চার টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীত্রিদিবেশ বসু বি. এ.
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা

শ্রীযুক্ত পশুপতি চৌধুরী

শ্রীচরণেষু

এই বইয়ে সংগৃহীত গল্পগুলি (শেষ গল্প "মৃত্যু-দর্শন" ছাড়া) ১৩৩১ হইতে ১৩৪০ বঙ্গাব্দের মধ্যে লিখিত এবং বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। অধিকাংশই বাহির হইয়াছিল 'প্রবাসী' পত্রিক । গল্পগুলির রচনার কাল স্চীপত্রে দেওয়া হইয়াছে।

নানা কারণে এগুলি এতকাল পুস্তকাকারে প্রকাশ করি নাই। প্রকাশকদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাগিদ দিয়া দিয়া আমার দ্বারা এতদিনে ওই কার্য্য সাধন করিলেন। তিনি আমার ধন্যবাদার্হ, পাঠক-সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইবেন কি না তাঁহারাই জানেন। এই বইয়ের ভালমন্দের দায়িত্ব তাঁহাদের, আমার নয়।

"আশ্রয়হীনা" গল্পটি একটি উপন্যাসের খসড়া মাত্র, উপন্যাসটি লেখা হয় নাই বলিয়া খসড়াটিই স্থান পাইয়াছে। "গল্প" গল্পে স্থানে স্থানে রবীন্দ্রনাথের ভাষা হুবহু আসিয়া পড়িয়াছে ।

২৫।২ মোহনবাগান রো,

কলিকাতা

১ কার্ত্তিক ১৩৫১

শ্রীসজনীকান্ত দাস

সূচী

হরিমতি

সকালে হস্পিটালে এমার্জেন্সী ওয়ার্ডে আমাকে আসিতে হইয়াছিল। একটা কম্পাউণ্ড ফ্র্যাক্চার আর একটা ইরিসিপেলাস কেস দেখিয়া হাত ধুইতেছি, কে যেন কাঁধের উপর হাত রাখিয়া ঝাঁকানি দিল। একটু চমকাইয়া মুখ তুলিতেই দেখি, আমাদের শ্যামচরণ অর্থাৎ আমাদের কলেজ-জীবনের উদীয়মান কবি ও সাহিত্যিক শ্যামচরণ হাজরা। ছেলেবেলা হইতে আই-এসসি ক্লাস পর্য্যন্ত একসঙ্গে পড়িয়াছিলাম; তারপর আমি ভর্ত্তি হইলাম মেডিক্যাল কলেজে, শ্যামচরণ বি-এসসি ফেল করিয়া সসম্মানে পি অ্যাণ্ড ও ব্যাঙ্কে লেজার-কীপারের কাজ করিতেছিল। এই পর্য্যন্ত জানিতাম, তারপর প্রায় আড়াই বৎসরের অসাক্ষাতের পর এই দেখা।

বলিলাম, আরে, শ্যামচরণ যে, খবর কি?

শ্যামচরণ আমার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বাহিরে বারান্দায় আনিয়া বলিল, ভাই, বড় বিপদ!

বিপদ তো দেখিতেছিলাম আমার নিজের, স্টুডেণ্ট আর পেশেণ্টরা ফ্যালফ্যাল করিয়া ব্যাপারটা দেখিতেছিল। কি ভাবিল, কে জানে! মনের বিরক্তি মনেই চাপিয়া বলিলাম, তাড়াতাড়ি বল, অনেকগুলো কেস এখনও—

শ্যামচরণ একটু থতমত খাইয়া বলিল, আমারও একটা কেস ছিল।

বলিলাম, বেশ তো নিয়ে এস।

শ্যামচরণ অঙ্গুলিনির্দ্দেশে সামনের একটা ট্যাক্সি দেখাইল ; একজন বলিষ্ঠ যুবকের কোলে কে একজন শুইয়া আছে। আমি স্ট্রেচার পাঠাইয়া রোগিণীকে অপারেশন টেবিলে আনাইবার ব্যবস্থা করিয়া প্রশ্ন করিলাম, কে ?

শ্যামচরণ বলিল, আমার একটি আত্মীয়া ; কাল রাত্রে হঠাৎ অ্যাপোপ্লেক্সির একটা স্ট্রোক—

রোগিণী ততক্ষণে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহাকে মোটামুটি পরীক্ষা করিয়া হস্পিটালে মেয়েদের জেনারেল ওয়ার্ডে একটা বেডের বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম। শ্যামচরণকে বলিলাম, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি যাও, যা করবার আমি করছি। বিকেলে আবার এস।

অনেকগুলি রোগী অপেক্ষা করিতেছিল। আমি তাহাদের লইয়া পড়িলাম।

সেদিন আর সুবিধা হইল না ; আমার অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সুরেশবাবু পরীক্ষা করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আমি শ্যামচরণের রোগীকে নিজে দেখিতে পারিলাম না। বৈকালে শ্যামচরণের সঙ্গেও দেখা হইল না।

পরদিন দ্বিপ্রহরে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, অবস্থা খারাপ। আরও নানা খটকা মনে জাগিল। শ্যামচরণের আত্মীয়া কেমন করিয়া সম্ভব !

বৈকালে অবসর ছিল, শ্যামচরণ আসিলে তাহার সহিত তাহার আত্মীয়াটিকে দেখিয়া বলিলাম, আমার বাসায় চল, এক কাপ চা খাবে, অন্য কথাও আছে।

এ কথা সে কথার পর প্রশ্ন করিলাম, তোমার আত্মীয়া ?

শ্যামচরণ একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, ঠিক নয়, কেন এ কথা জিজ্ঞেস করছ বল তো ?

বলিলাম, কারণ আছে। চিকিৎসার সুবিধার জন্যে হিস্ট্রিটা একটু শোনা দরকার।

শ্যামচরণ কবি মানুষ, সরাসরি ইতিহাস বলা তাহার পক্ষে সম্ভব নয়, সে প্রায় একটা গল্প ফাঁদিয়া বসিল।

* * * *

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। চাকুরিতে সদ্য মাহিনা-বৃদ্ধি হইয়াছে, গৃহিণী এবং হিতৈষী বন্ধুজনেরা সৎ পরামর্শ দিলেন নিজে স্বতন্ত্র বাসা করিয়া থাকিতে। গৃহিণীর পিত্রালয়ে ঘরের সংখ্যা কম, তাঁহার অসুবিধা হইতেছিল। স্বাধীনতা এবং আহারের সুবিধা, কোন্‌টার ওজন বেশি, তখনও স্থির করিতে পারি নাই, তথাপি একটা বাসা ভাড়া করিলাম এবং একদিন শুভলগ্ন দেখিয়া বেলেঘাটাস্থিত পিত্রালয় হইতে গৃহিণীকে ট্যাক্সি-যোগে নেবুতলাস্থ পতিগৃহে লইয়া আসিলাম। গৃহিণীর বড় মাসী নূতন সংসার পাতিবার সাহায্যার্থে সঙ্গে আসিলেন। আমার প্রথম পুত্র, আমার মহিমান্বিত প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের (wails !) বৃথাগ্রচূড়া তখন সবেমাত্র দেখা গিয়াছে, সশরীরে আসিতে তখনও তাহার পাঁচ সাত মাস বিলম্ব।

মাহিনায় না কুলাইলেও এই অবস্থায় গৃহকর্ম্মে সাহায্য করিবার জন্য রাঁধুনী বামুন হোক বা দিনরাতের ঝি বা চাকর হোক, একজন লোক আবশ্যক। ঠিকা ঝি সারদা ঘর ঝাঁট দেওয়া বাসনকোসন মাজা ইত্যাদির জন্য পূর্ব্বেই বাহাল হইয়াছিল, কিন্তু তাহার আরও তিন বাড়ির কাজ এবং কোলে রুগ্ন শিশু। ঠিক দরকারটির সময় তাহাকে পাওয়া যাইত না। পাশের বাড়ির ললিত আমার বন্ধু, সেই নূতন বাসা ঠিক করিয়া দিয়াছিল, কাকীমা অর্থাৎ ললিতের মার নিকট দরখাস্ত পেশ করিলাম। ফলে, পরদিন বৈকাল নাগাদ আমার বাড়িতে দিনরাতের ঝিয়ের কাজ করিবার জন্য দুই মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল ; একজন অপেক্ষাকৃত সমর্থ বয়সের, মেস বাড়ি হইলে তরুণী বলিয়াও চালানো যাইত, রঙ ময়লা, দোহারা গড়ন, অন্য জন প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় উপনীত, বিধবা, রঙ ফরসা, বাঁ চোখটা যে কারণেই হোক নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তৎসত্বেও তাহার মুখে

এবং ভাবভঙ্গীতে এমন কিছু ছিল যাহাতে চট্ করিয়া ঝি বলিয়া মানিয়া লইতে বাধে, গিন্নীবান্নী গোছের কেহ বলিয়াই বোধ হয়।

অফিস হইতে সবে ফিরিয়াছি, দেখি, এই দুইটি জীবকে সামনে লইয়া মাসী-বোনঝিতে পরস্পর মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিতেছেন। আড়-চোখে চাহিয়া দাড়ি কামাইতে বসিলাম। কিছুক্ষণ পরে গিন্নী পাশে আসিয়া ফিসফিস করিয়া জানাইলেন যে, মেয়েটি মাসিক ছয় টাকা বেতন চাহিতেছে, তাহা ছাড়া দুইবেলা আহার, দুইবেলা জলখাবার, বৎসরে তিন জোড়া কাপড়, শীতে কম্বল। আমি জবাব না দিয়া মুখ ফিরাইয়া আর একবার আড়চোখে চাহিয়া দেখিলাম, অপেক্ষাকৃত তরুণীটি অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। ঘোমটাবৃত বৃদ্ধা বসিয়া আছে। মাহিনা এবং আনুষঙ্গিক প্রার্থনা এমন কিছু বেশি নহে, শান্তভাবে প্রশ্ন করিলাম, ও পারবে তো ?

চটিবার কোনও কারণ ছিল না, তবু গৃহিণী চটিলেন। ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন, না পারলে বিদেয় ক'রে দেব। ঝিয়ের তো আর মড়ক হয় নি।

ইহার উপর কথা চলে না। পরের দিন হইতেই নূতন ঝি কাজে বাহাল হইল।

তাহার নাম হরিমতি, প্রথমটা কিছুকাল তাহাকে মূক মনে হইলেও পরে বুঝিলাম হরিমতি মুখরা। ছয় টাকা মাহিনায় রাজি হইয়াছিলাম, দুই মাস যাইতে না যাইতেই হিসাব করিয়া দেখিলাম তাহাকে ৭৸৵০ করিয়া দিতে হইতেছে, ১৸৵০ এক ভরি আফিমের দাম, তাহার সমস্ত মাসের মৌতাত।

প্রথম প্রথম আমাকে হরিমতি ভারি লজ্জা করিত, আধ হাত ঘোমটা টানিয়া কাছে আসিত, কথা বলিত না। নিতান্ত প্রয়োজনে ফিসফিস করিয়া যাহা বলিত, তাহার অর্দ্ধেক বোঝা যাইত না। গৃহিণী খুশি বলিতেন, নূতন ঝি মোটেই বেতরবিৎ নয়। অথচ এদিকে ঠিকা ঝি

সারদার সহিত তাহার বচসার কথা প্রায়ই শুনিতে পাইতাম; তকতকে ঝকঝকে কাজ বুঝিয়া লইতে হরিমতি ভালবাসে, এক চুল এদিক ওদিক হইলেই কথা শুনাইতে বসে। ক্রমশ গিন্নীও কথা শুনিতে লাগিলেন এবং সংসারে খিটিমিটি শুরু হইল।

তিতিবিরক্ত হইয়া তাহাকে জবাব দিব স্থির করিলাম, গিন্নী বলিলেন, লোক না হইলেও তিনি চালাইয়া লইতে পারিবেন। কিন্তু সামনে পৌষ মাস। পৌষ মাসে জবাব দেওয়া যায় না। কার্ত্তিকে বাহাল হইয়াছিল মাঘ পর্য্যন্ত হরিমতি রহিয়া গেল। ইহার মধ্যে একটা জিনিস লক্ষ্য করিলাম, সে এক মুহূর্ত্তের জন্য বাহিরে যাইত না। স্ত্রীপুরুষ কাহাকেও কখনও তাহার নিকট আসিতেও দেখি নাই। কৌতূহলী হইয়া গৃহিণীকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তিনি অপ্রসন্ন মুখে বলিয়াছিলেন, তিন কুলে নেই কেউ তো আবার আসবে কে? সবাইকে খেয়ে তবে ও এখানে এসেছে। পাপ বিদেয় হ'লে বাঁচি।

শেষের কথা যেন শুনিতেই পাই নাই, বলিলাম, তবু?

—তবু আবার কি? তারকেশ্বরের কাছে কোথায় ঘর, জাতে তেলী, ভাজের সঙ্গে রাগারাগি ক'রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে।

তাহার পর পাঁচ বৎসর অতীত হইয়াছে, ইহার অধিক পরিচয় হরিমতি সম্বন্ধে সংগ্রহ করিতে পারি নাই। অতীত জীবনের কোনও কথাই কোনও অসতর্ক মুহূর্ত্তে তাহার মুখ দিয়া বাহির হয় নাই। বাড়ি ছাড়িয়া এগারো বারো বৎসর এখানে-ওখানে ঝিগিরি করিবার পর সে আমাদের বাড়ি আসিয়াছিল। এই বারো বৎসরের কোন কথাও শুনি নাই, শুধু প্রত্যেক পূজার সময় একটি নির্দ্দিষ্ট বয়সের ছেলের জন্য সে আমাকে দিয়া জামা-ইজের খরিদ করাইত এবং ঠিক সপ্তমীর দিন প্রাতঃকালে কাহাকে যেন দিয়া আসিত। সেই শিশুর বয়স প্রত্যেক বৎসরে এক বৎসর করিয়া বাড়িয়াছে, এইটুকু মাত্র জানিতে পারিয়াছি।

মাঘের ২রা তারিখে হরিমতির বিদায় হইবার কথা, হঠাৎ হুড়মুড় করিয়া আমার অর্দ্ধোন্মাদ পিসীমাকে সঙ্গে লইয়া পিসেমশাই, পিসতুতো দাদা-বউদিদি ইত্যাদি আজিমগঞ্জ হইতে একেবারে কলিকাতায় আমার ছোট বাসায় উপস্থিত। হরিমতি রহিয়া গেল, কিন্তু স্থানাভাবে গৃহিণীকে পিত্রালয়ে সরিতে হইল, ছেলে হওয়া পর্য্যন্ত সেখানেই তিনি থাকিবেন।

বাড়িতে জায়গার অভাব, নীচে অন্য ভাড়াটে থাকে, আমার ভাগে মোট আড়াইখানি ঘর ও একটি রান্নাঘর। ঘর আড়াইখানি পিসীমা পিসেমশাই, দাদা বউদিদি দখল করিলেন, আমি পাশে ললিতদের বাড়িতে আশ্রয় লইলাম। এখানেই হরিমতির সহিত পরিচয় আরম্ভ হইল। রাঁধুনীবামুন রান্না করিয়া যায়। আমার দেরি হইলে হরিমতি আঁচলের তলায় ভাত লইয়া গিয়া আমাকে খাওয়াইয়া আসে। তাহার আধহাত ঘোমটা কমিয়া আঙুল চারেকে দাঁড়াইল এবং "বাবা" সম্বোধনে এক-আধটা কথাও সে বলিতে শুরু করিল। তাহার নিজের অসুবিধার অন্ত ছিল না, ভিজা রান্নাঘরেই শয়ন করিতে ও ঠাকুরের মুখ চাহিয়া চলিতে হইত।

হঠাৎ একদিন কাকীমার (ললিতের মা) মুখে খবর পাইলাম, হরিমতি কাঁদিয়া কাটিয়া তাহার বাবাকে অর্থাৎ আমাকে দেখাশোনা করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ জানাইয়া গিয়াছে।—মাগী যেন কি, আমার চাইতে তার যেন দরদ বেশি !

দরদ বেশি, কি কম, ভগবানই তাহার পরীক্ষা লইলেন। চৈত্র মাসের মাঝামাঝি ললিতদের বাড়িতেই প্রবল জ্বরে অবসন্ন হইয়া পড়িলাম এবং বিকারের ঘোরে অনুভব করিলাম, আমার বসন্ত হইয়াছে। পিসীমার অসুখ তখন বাড়িয়াছে। দাদা-বউদিদি ইত্যাদি তাঁহাকে লইয়াই ব্যস্ত।

পরে শুনিয়াছি, হরিমতি যেন এই সময়টা পাগলের মত হইয়া গিয়াছিল। নীচের ভাড়াটেদের হাতে পায়ে ধরিয়া তাহাদের একটি ঘর খালি করাইয়া আমাকে সে সেখানে লইয়া আসে এবং বিছানা পাতিয়া

শোয়াইয়া সেই যে আমার মাথাটি কোলে লইয়া বসে, যখনই চোখ মেলি দেখিতে পাই একটি কল্যাণ-হস্ত আমার ললাটে ন্যস্ত, অন্য হাতে সে মাছি তাড়াইতেছে। মা শীতলা তাহার একটি চক্ষু লইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাহার পথে-পাওয়া বাবাকে লইয়াও টানাটানি শুরু করিয়াছেন, এটা সে বরদাস্ত করিতে পারে নাই। মা শীতলার সহিত হরিমতি যেন ভক্তির আতিশয্যেই লড়াই করিল এবং একুশ দিন পরে আমাকে তাঁহার কবল হইতে ফিরাইয়া আনিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইল। পিসেমশাইরা পিসীমাকে সামলাইতে ব্যস্ত ছিলেন, অন্তঃসত্ত্বা গৃহিণীরও বসন্তরোগীর কাছে আসিবার হুকুম ছিল না। আমাকে খাওয়ানো, ওষুধ মালিশ করা, বাতাস করা— বৃদ্ধার যেন ক্লান্তি ছিল না। ইহারই মধ্যে আমার ঘুমের অবসরে বেলেঘাটায় হাঁটিয়া গিয়া গৃহিণীকে খবর দেওয়া—কাজের ঝোঁকে হরিমতির চার আঙুল ঘোমটাও ঘুচিয়া গেল এবং আমাকে কোলের শিশুর মত মনে করিয়া সে বকিতে-ঝকিতে শুরু করিল।

পিসীমাকে লইয়া সকলে খুলনা গেলেন, রাঁধুনীবামুনকে ছাড়াইয়া দেওয়া হইল, হরিমতী ঝি-পদবি হইতে একেবারে রাঁধুনীত্বে প্রোমোশন পাইল; এবং সকলের অজ্ঞাতসারে কখন যে সে ঘরের গৃহিণী হইয়া বসিল জানিতেই পারিলাম না। শ্রাবণ মাসে সন্তান প্রসব করিয়া আশ্বিন মাসে নিজের বাসায় আসিয়া গৃহিণী দেখিলেন, হরিমতির কর্ত্রীত্ব এড়াইয়া চলা তাঁহার পক্ষেও কঠিন। তাহাতেই গোল বাধিয়া হেস্তনেস্ত যাহোক একটা তখনই হইয়া যাইত, আজ হরিমতির কথা বলিবার জন্য তোমার কাছে উপস্থিত হইতাম না, কিন্তু যিনি রহস্যচ্ছলে এই বিশ্বসংসার নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন তাঁহার অন্য মতলব। কিছু দিন যাইতে না যাইতে গৃহিণী হঠাৎ নিদারুণ বাতব্যাধিতে শয্যাশায়ী হইলেন। চলচ্ছক্তিরহিত অবস্থায় শিশুসন্তানের প্রতিপালনের জন্য এই বৃদ্ধারই মুখ চাহিয়া থাকা ছাড়া তাঁহার অন্য পথ ছিল না; তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাকে মানিয়া

লইলেন। তিন মাসের শিশুকে মানুষ করিবার অধিকার পাইয়া বুড়ী বর্ত্তাইয়া গেল।

খোকনের ভাগ্যে মাতৃস্তন্য জুটিল না, পলিতায় দুধ খাইয়া ও হরিমতির শুষ্ক বুকে মুখ গুঁজিয়া সে বড় হইতে লাগিল। হরিমতি যে কি করিয়া এই মাতৃস্নেহবঞ্চিত শিশুকে মানুষ করিয়াছে, সে ইতিহাস ভাল করিয়া আমারই জানা নাই। গৃহিণী জানেন, কিন্তু সকল সত্যের মত এ সত্যটাও স্বীকার করিতে তাঁহার অহঙ্কারে বাধে, এবং বাধে বলিয়াই মা হইয়া তাঁহার শিশুর এই উড়িয়া-আসিয়া-জুড়িয়া-বসা মাকে তিনি কখনও সহ্য করিতে পারিলেন না। এখান হইতেই যে ট্র্যাজেডির সূত্রপাত, আমার সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কিত এই বৃদ্ধা শেক্সপীরীয় নাটকের নায়িকার মত সকল আঘাত সহ্য করিয়া আজ অসাড় চেতনাহীন অবস্থায় সেই নাটকের যবনিকা-পতনের অপেক্ষায় তোমাদের হাসপাতালে পড়িয়া আছে। আমি এখানে বসিয়া তোমাকে তাহার ছন্নছাড়া জীবনের ইতিবৃত্ত বলিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছি।

বিপদ হইল আমার, আমাকে হরিমতি "বাবা" বলিলেও গৃহিণী ঠিক মায়ের পদবীতে উঠিতে পারিলেন না; একটা অকারণ রাগ, ছেলেকে কেন্দ্র করিয়া একটা অর্থহীন হিংসা তাঁহাকে রোগের মধ্যেই আচ্ছন্ন করিতে লাগিল, অথচ হরিমতিকে না হইলেও তাঁহার চলিত না। খোকাকে মানুষ করা ছাড়াও, গৃহিণীর সেবা ও সংসারের অন্যান্য কাজ সে একাই করিতে লাগিল। এখন বুঝিতে পারি খোকনের ভার না পাইলে সে অন্য কোনও কাজই করিতে পারিত না। খোকনও মাকে ভাল করিয়া বুঝিবার আগেই এই নিঃসম্পর্কীয়া বৃদ্ধাকে বুঝিল এবং তাহাকে আঁকড়াইয়া শিশুমনের ক্ষুধা মিটাইতে লাগিল। আমি কথার উপর কথা দিয়া ভুলাইয়া রোগিণীকে ঠাণ্ডা রাখিতে লাগিলাম। গৃহিণী যখন সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিলেন, তখন খোকন মায়ের কাছ হইতে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে, মাকে

আর তাহার বিশেষ কোন প্রয়োজনও নাই। সে দিদিকে জানে, দিদিকে বুঝে।

পাঁচ মাসে পড়িতেই খোকনের অন্নপ্রাশনের একটা দিন স্থির হইল; ষষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি। খুব যে ঘটা করিয়া হইবে তাহা নয়। সামান্য রকম একটা উৎসব। গৃহিণী সবে সারিয়া উঠিতেছেন, হৈ-হৈ করিবে কে? হরিমতি কিন্তু অল্পে সন্তুষ্ট নয়, সে কারণ দেখাইল, প্রথম ছেলে। কিন্তু খোকন দ্বিতীয় ছেলে হইলেও কারণের অভাব হইত না। ইহা লইয়া একদিন মায়ে-ঝিয়ে তুমুল বচসা হইয়া গেল এবং আমি গরিবের ছেলে মাঝ হইতে মারা পড়িতে বসিলাম।

চাকুরিতে ঢোকার পর মাস তিনেক পর্য্যন্ত হরিমতি নিয়মিত মাহিনা লইয়াছে, তাহার পর প্রায় নয় দশ মাস সে একটিও পয়সা লয় নাই। শুধু আফিমের ১৮৵০; অনেক টাকা বাকি পড়িয়াছে। গৃহিণীর সহিত কলহের ফলে খোকাকে কোলে লইয়া হরিমতি আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে আসিয়া আমার নিকট বিদায় ও বাকি বেতন প্রার্থনা করিল—এখানে থাকা আর পোষাইবে না। একটা পেট যেমন করিয়াই হোক চলিয়া যাইবে। কাঁটাটাকে একটু ভালবাসিয়াছিলাম, তা আমার মত হতভাগীর সেটা বাড়াবাড়ি হইয়াছে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি আকাশ হইতে পড়িলাম, অত টাকা এই সময়ে একসঙ্গে যোগাড় করা অসম্ভব। গৃহিণীকে বুঝাইলাম, হরিমতিকে বুঝাইলাম এবং শেষে নিরুপায় হইয়া ধরাধরি করিয়া অফিস হইতে আগাম বেতন লইয়া তাহার মাহিনা চুকাইয়া দিলাম।

কিন্তু একদিন, দুইদিন, তিনদিন, হরিমতি যায় না। ললিতের ভাই অবনী হরিমতির কাছে যাতায়াত করিতেছে দেখিলাম। বোধ হইল তাহার চাকরি জুটাইয়া দিতেছে। এদিকে খোকনের অন্নপ্রাশনের দিনও প্রায় আসিয়া উপস্থিত হইল। একদিন সকালে অবনী একগাছা সোনার

হার আনিয়া আমাকে দেখাইয়া বলিল, কেমন হয়েছে বলুন তো! অবনীর প্রতি চিত্ত অপ্রসন্ন ছিল। আমি সংক্ষেপে বলিলাম, ভাল। অবনী বলিল, হরিমতি এটা খোকনের ভাতের সময় দেবে ব'লে গড়িয়ে আনিয়েছে।

আমি কথা বলিতে পারিলাম না। এই জন্যই মাহিনার তাগাদা! চাকুরিতে ইস্তফা দেওয়ার ব্যাপারটা তাহা হইলে কিছু নয়! বাঁচা গেল। গৃহিণীর মনও ভিজিল, তিনি কিছুদিন ঠাণ্ডা রহিলেন।

গৃহিণীর এই অসুখটার সময় আমার নিত্যসহচর বন্ধুরা হরিমতিকে ভাল মতেই চিনিয়াছিল। আড্ডায় পড়িয়া দিগবিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দেওয়া আমার স্বভাবগত। গৃহিণী একা পড়িয়া পড়িয়া যন্ত্রণায় কাতরাইতেছেন, তাঁহার ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা নাই, আমি অফিস হইতে আড্ডা দিয়া গভীর রাত্রে বাড়ি ফিরিলাম, দেখি হরিমতি গজগজ করিয়া আমার বন্ধুদের শ্রাদ্ধ করিতে করিতে খোকাকে কোলে দোল দিতেছে। এই অবস্থায় তাহার কাছে যা-না-তাই শুনিয়া হজম করিতে হইত। দুই-একজন বন্ধু কচিৎ-কখনও বাড়ি পর্য্যন্ত আসিয়া হরিমতির বাক্যবাণে আক্রান্ত ও আহত হইয়া ফিরিয়াছে, তাহার পর হইতে আমাদের বাড়িমুখো হইতে তাহারা ভরসা করিত না। হরিমতি তাহাদের কাছে জুজুর মত ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছিল।

ইহার পরেই আমার দ্বিতীয় সন্তান মহামহিমান্বিতা শ্রীমতী গৌরীর আগমনী উদ্ঘোষিত হইয়াছে। বেদখল খোকনকে হরিমতির কবল হইতে উদ্ধার করিবার পূর্ব্বেই গৃহিণীর সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটিল। তিনি মুখভার করিয়া শত্রুর হাতে প্রথম সন্তানকে সমর্পণ করিয়া নূতনের অভ্যর্থনার আয়োজন করিবার জন্য পিতৃগৃহে গমন করিলেন। খোকন ও খোকনের পিতা হরিমতির জিম্মায় রহিল।

প্রায় এক বৎসর কাল এভাবে নির্ঝঞ্ঝাটে কাটিল। খোকনের মা

গৌরীকে লইয়া ব্যস্ত, খোকনের উপর হরিমতির একছত্র অধিকার। তাহার আনন্দ কত! জীবনে যে কাহাকেও পায় নাই, ভগবান তাহার প্রতি বোধ হয় কৃপা করিলেন, খোকন "দিদি" বলিতে অজ্ঞান। তাহাকে ধোয়াইয়া মুছাইয়া খাওয়াইয়া শোওয়াইয়াও হরিমতির তৃপ্তি নাই। আমি আমার দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের জীবনে একুনে যে পরিমাণ প্রসাধনদ্রব্য ব্যবহার করি নাই, খোকন এক বৎসরেই তাহার চাইতে বেশি হেজলিন, পাউডার, এসেন্স মাখিয়া ফেলিল। অমুক বাড়ির অমুক ছেলের জামার ছিটটা কি চমৎকার, খোকনের জন্য ওই ছিটের একটা জামা চাই; দুই দিন অন্তরই খোকার ইজের ছোট হইয়া যাইতে লাগিল, জামায় ঘামের গন্ধ থাকিলে খোকন পরিতে পারে না, তাহার অসুখ করে। আমি পদে পদে বিপন্ন হইতে লাগিলাম।

বহু কষ্টে নিজের শোবার ঘরে একটা সিলিং-ফ্যানের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, গরমে খোকা রাত্রে ঘুমাইতে পারে না, তাহারও একটা পাখা চাই।—তোমরা যদি না দাও, আমার মাহিনার টাকা হইতে একটা পাখা কিনিয়া আন। অগত্যা পঁয়ত্রিশ টাকা ব্যয় করিয়া একটা টেবিল-ফ্যানের বন্দোবস্ত করিতে হইল।

গৃহিণী আসিয়া তেলেবেগুনে জ্বলিয়া গেলেন। বলিলেন, আর ওকে রাখা নয়। ছেলে খারাপ হইয়া যাইতেছে। আমি এত সহজে মামলা নিষ্পত্তি করিতে পারিলাম না, ছেলেকে যে বাঁচাইল, ছেলেকে বাঁচাইবার অজুহাতে তাহাকে তাড়াই কি করিয়া? বাড়িতে রোজই অশান্তি ঘটিতে লাগিল। আমি বাহিরে বাহিরে থাকি, বাড়িতে ফিরিলেই ফোঁসফোঁস শুনি, একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলাম।

হরিমতি গৌরীকে দেখিতে পারে না, তাহার ধারণা, খোকনকে যথাযোগ্য সমাদর করিবার পূর্ব্বেই সে আসিয়া ভাগ বসাইয়াছে; তাহা ছাড়া, আজ বাদে কাল যে পর হইয়া যাইবে, তাহার জন্যই বা এত কেন!

খোকনের জামা-জুতা ছোট হইয়া গিয়াছে, গৌরীকে তাহা পরাইবার জো নাই। ছেলের ও মেয়ের জামার কাপড়ের ছিটে যে তফাত থাকিতে পারে, মেয়ের জামার ছিট একটু জমকালো স্বভাবতই হয়, হরিমতি তাহা স্বীকার করে না। গৌরীর কাঁথা কাচিতে কাচিতে প্রাণ গেল, এদিকে কাঁথার ব্যবহার খোকনই করে বেশি। হরিমতি এবং গৃহিণীতে খোলা আদালতে একটা মামলা হইতেই শুধু বাকি রহিল।

টানাটানির মধ্যে পড়িয়া গৌরীর অন্নপ্রাশনই হইল না। মেয়েছেলের আবার অন্নপ্রাশন! গৃহিণীও হরিমতিকে তাড়াইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। অফিস হইতে বাড়ি ফিরিয়া হরিমতির কথায় তিনি কাঁদিতেছেন—এরূপ দৃশ্যও দুই-একদিন দেখিলাম। ইতিমধ্যে হরিমতির বাকি মাহিনার অঙ্ক শ'য়ের কোঠায় এক দুই করিয়া উঠিতেছে। হট করিয়া তাহাকে ছাড়াইয়া দেওয়াও যায় না।

বাহিরে শুনিয়া আসি, আমার ভাগ্য ভাল, এমন একজন লোক পাইয়াছি। ঘরে শুনি, আমিই তাহাকে নাই দিয়া মাথায় তুলিয়াছি, নহিলে একটা সাধারণ ঝি, কোথাকার কে, ঘরের লোকের মত খায়-দায় শোয় আবার চোখও রাঙায়। খোকা আর গৌরী যেন দুই শরিক, আমি যতটা পারি চোখ বুজিয়া চলিতে লাগিলাম।

বাড়াবাড়ি যে হরিমতি না করিতেছিল তাহা নয়। ঝিগিরি করিয়া যে জীবনের অর্দ্ধেক কাটাইল, ঠিকা ঝি সারদার সম্বন্ধে তাহার কি সুগভীর ঘৃণা! চার বৎসরের মধ্যেই সে এমন পোক্ত বড়লোক হইয়া গিয়াছে যে, ছোটলোককে ছোটলোক বলিতে তাহার একটুকু বাধিত না। ধোপা ছোটলোক, নাপিত ছোটলোক, হিন্দুস্থানী চাকর রামলখন সে ছোট-লোক; গণেশ নামক এক ছোকরা কিছুদিন বাড়িতে কাজ করিল, সে শুধু ছোটলোক নয়, চোর,—আমার পয়সা বেশি হইয়াছে তাই সকলকে আস্কারা দিতেছি।

আমার উপরেই কি কম অত্যাচার চলিতে লাগিল! ট্যাক্সি করিয়া কোনও দিন বাড়ি আসিবার জো ছিল না,—নবাবের জামাইয়ের খুব পয়সা হয়েছে দেখছি! বন্ধু-বান্ধবদের ডাকিয়া খাওয়ানো তো এক প্রকার ছাড়িয়াই দিয়াছিলাম, মাঝে মাঝে দুই চার কাপ চা—তাহাও সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া দিবার উপায় ছিল না। এমন কি, একবার বাবা আসিয়া আমাদের বাসায় কিছুদিন থাকিয়া গেলেন। হরিমতির রাগ দেখে কে!—নিজের পেনশনের টাকা জমিয়ে ব্যাটার পয়সায় খেতে এসেছেন! থাকো দুদিন অসুখে প'ড়ে, কে তোমায় দেখে দেখি! কখনও শুনি—আগে দেনাগুলো শোধ কর ; তার পর নবাবি ক'রো।

আমি সহ্য করি, আমার সহ্য করিবার কারণ আছে। আমি জানি, পৃথিবীতে এই স্ত্রীলোকটির আর কোনও অবলম্বন নাই, আপনার বলিতে কেহ নাই। ভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে একটি আশ্রয় তাহার জুটিয়াছিল, খোকনকে কেন্দ্র করিয়া এই শুষ্ক মৃতপ্রায় বৃক্ষটি পুষ্পিত হইবার প্রাণপণ প্রয়াস করিতেছিল, কিন্তু দীর্ঘ অর্দ্ধশতাব্দীর স্নেহচ্ছায়াহীন কঠোরতা তাহার প্রতিবন্ধক। সে কিছুতেই এখানে নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারিল না।

কিন্তু গৃহিণী বোঝেন না, আর কেহ বোঝে না। নীচজাতীয়া এই স্ত্রীলোক কোন্ স্পর্দ্ধায় মনিবের সমান হইতে চায়, খোকনের সহিত স্নেহসম্পর্ক তাহাকে কেমন করিয়া খোকনের মায়ের মর্য্যাদা দিতে পারে, ইহা বোঝা শক্ত। তাহার স্বভাব হোঁচট খায়, ব্যবহারে নীচতা প্রকাশ পায়, অতীত জীবনের অভদ্রতা দুই-একটি নীচ কথায় আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলে ; কিন্তু আমি জানি, তাহার মনের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে এবং পরিবর্ত্তনই তাহার দুর্দ্দশার কারণ হইল।

খোকন হরিমতির ন্যাওটো, সেইখানেই তাহার জোর। খোকনকে দুধ খাওয়াইবার ক্ষমতা গৃহিণীর নাই। কাঁদিলে হরিমতি ছাড়া কেহ

ভুলাইতে পারে না। কোনদিন মাই না পাইয়াও সে এখন পর্য্যন্ত মাই-টানার শখটা বজায় রাখিয়াছে, রাঁধিতে রাঁধিতে হরিমতি তাহাকে মাই দিতে বসে। সমস্ত রাত্রি হরিমতিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া না শুইলে তাহার ঘুম হয় না। মায়ের তাহা সহিবে কেন! পরিশ্রান্ত দেহে রাত্রির অবসর আমার বিষাক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু চুপ করিয়া রহিলাম।

আমাকে নীরব দেখিয়া গৃহিণী স্বয়ং ব্যবস্থা করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি একটু একটু করিয়া খোকনকে তাহার দিদির নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে লাগিলেন। আমি বুঝিলাম, দেখিলাম, কিন্তু কি বলিব! গৌরীর ঝঞ্ঝাট অনেকটা কমিয়াছে। খোকনের ঝক্কিও তিনি সহিবেন। তাহা ছাড়া হরিমতির কাছে কাছে থাকিলে সংস্রব-দোষ ঘটিতে পারে; এখন হইতে সাবধান হওয়া ভাল। বেশ বুঝিলাম, ব্রহ্মাস্ত্রের ব্যবহার হইতেছে।

একচক্ষু হরিণের মত একচক্ষু হরিমতি যে দিক হইতে আপনাকে নিরাপদ ভাবিয়াছিল, ঠিক সেইদিক হইতেই আঘাত আসিল। এই মূর্খ স্ত্রীলোক হঠাৎ একদিন অনুভব করিল, তাহার একমাত্র আশ্রয়, সীমাহীন সমুদ্রে তাহার নিজ হাতে রচনা করা একটি মাত্র ভেলা তাহার হাত হইতে সরিয়া যাইতেছে। খোকন আর শুধু হরিমতিগত প্রাণ নয়। বৃদ্ধা চমকিয়া উঠিল, অকারণে খোকনের মায়ের সহিত ঝগড়া করিয়া কাঁদিল এবং আবার একদিন প্রাতঃকালে আমাকে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া বলিল, সে থাকিবে না। আমি শুধু "আচ্ছা" বলিয়া তাহাকে নিরস্ত করিলাম।

তাহার পর হইতেই দেখিলাম, হরিমতির মেজাজ অত্যন্ত খারাপ হইয়াছে, মুখে আর কিছু আটকায় না, যাহাকে তাহাকে যা-তা বলে। যে ভালবাসা তাহার জীবনে সংযম আনিয়াছিল, সেই ভালবাসা হারাইবার ভয়

তাহাকে অসংযত করিল। খোকনকেই সে কটুকাটব্য করিতে লাগিল। সারদা, রামলঘন, আমাদের বাড়ির অন্যান্য ভাড়াটে, গৃহিণী, এমন কি পাড়াপ্রতিবেশীরা পর্য্যন্ত বিরক্ত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। তাহার চুলগুলি রুক্ষ হইল, কপালে নীল শিরা দেখা দিল।

ইতিমধ্যে হরিমতির ঘরের টেবিল-ফ্যানটি হঠাৎ বিকল হইয়া গেল। পাখার হাওয়ায় ঘুমাইতে অভ্যস্ত খোকন বিনাদ্বিধায় দিদিকে ভুলিয়া আমাদের শুইবার ঘরে সন্ধ্যা হইতে আশ্রয় লইল। একদিন, দুইদিন চলিয়া গেল। সকালেই ঘুম ভাঙিতেই শুনি, উপরের কলের জল লইয়া হরিমতি তারস্বরে নীচের কাহাকে গালি-গালাজ করিতেছে। কয়লা-ভাঙা লইয়া ঝগড়া, বাসন-মাজা লইয়া ঝগড়া। তাহার এমন উগ্রমূর্ত্তি আমি কখনও দেখি নাই। আবার এমন নরমও সে কোনদিন ছিল না, একলা বসিয়া বসিয়া প্রায়ই কাঁদিত; গৃহিণী বালতেন, বোধ হয় পাগল হইয়া যাইবে।

আমার লোভী ছেলে শৈশবের কথা ভুলিতেছে, তাহার বয়স চার হইয়াছে, এখন তাহার অনেক আশা, অনেক আকাঙ্ক্ষা; শুধু দিদি আর তাহার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নয়। বাহিরের জগৎ তাহাকে টানিতেছে, দিদি ভাসিয়া গেল, মাও একদিন ভাসিয়া যাইবে, গৃহিণী সে কথা এখন ভাবিতে পারেন না।

চির-আশ্রয়হীনা এই হতভাগিনী যে নিজের স্বভাবের বিরুদ্ধে চলিয়া ভিতরে ভিতরে গুমরাইয়া মরিতেছিল তাহা আমিও অনুভব করিয়া উঠিতে পারি নাই, একদিন বৈকালে সংবাদ পাইলাম, হরিমতি বসিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে। পদ্মা ভিতরে ভিতরে ক্ষয় সমাপ্ত করিলে পাড় ধ্বসিয়া পড়ে। আমরা পাড় ধ্বসাটাই দেখি, চমকাইয়া উঠি; ভিতরের খবর কতটুকু জানিতে পারি!

বাড়ি আসিয়া দেখিলাম, ডাক্তার আসিয়াছেন। অ্যাপোপ্লেক্সির

স্ট্রোক—জিহ্বায় জড়তা আসিয়াছে। কথা বলিতে পারে না, শূন্য দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে সে চাহিল। কি বলিতে চেষ্টা করিল। আভাসে বুঝিলাম, খোকনকে খুঁজিতেছে।

দিনের পর দিন, সাতদিন চলিয়া গেল, হরিমতি তেমনই পড়িয়া রহিল। চোখ বন্ধ, বিকৃত বিশীর্ণ মুখ দিয়া লালা ঝরিতেছে; তাহার দক্ষিণাঙ্গ ঘন ঘন স্পন্দিত হইতেছে। বহুকষ্টে নিশ্বাস লইয়া বহির্মুখ প্রাণটাকে সে দেহে রাখিতে চাহিতেছিল। অন্য চেতনার লক্ষণ নাই। কিন্তু যেই খোকন কাঁদিল, কি· কাছে কোথায়ও কথা কহিল, অমনই ঘোলাটে চক্ষুটি মেলিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া সে এদিক-ওদিক তাহাকে খুঁজিত। হরিমতির ঘরে খোকন খাইতে বসিলে সে একদৃষ্টে তাহাকে দেখিত; খোকন এক-আধ বার কাছে গিয়া 'দিদি' বলিয়া ডাকিলে হরিমতি হাত বাড়াইয়া তাহাকে ধরিতে চেষ্টা করিত, পারিত না। অকৃতজ্ঞ শিশু এ দৃশ্য দেখিতেও চাহিত না। পলাইয়া যাইত। আমি জোর করিয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিতাম, সামনে বসিতে বলিতাম, তাহার খেলায় মন; হাত ছাড়াইয়া চলিয়া যাইত। হরিমতির নষ্ট চোখটি ছাপাইয়া জল ঝরিত।

গৃহিণী হরিমতিকে তাড়াইতে চাহিয়াছিলেন, সে নিজেও চলিয়া যাইবে বলিয়াছিল, কিন্তু এভাবে যে সে যাইবে তাহা কে জানিত! গৃহিণী শেষে কথা বলিতেন না, নিঃশব্দে এই অসহায়া বৃদ্ধার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিতেন। রাত্রে দেখিতাম, তিনি ঘন ঘন হরিমতির কাছে যাইতেছেন। আমাকে শুধু বলিতেন, বড় কষ্ট হচ্ছে ওর, না গো? ছেলের অকৃতজ্ঞতায় তিনিও লজ্জিত। 'পাজি' ছেলেকে তাহার দিদির কাছে হাজির থাকিবার জন্য তিনি কাতর অনুরোধ করিতেন, কিন্তু চার বৎসরের শিশুর মনস্তত্ত্ব কে বুঝিবে?

হরিমতি যদি মরে, তবে বুঝিব এই স্নেহই তাহার কাল হইল।

জীবনের পঞ্চান্ন বৎসর সকল স্নেহ-বন্ধনকে উপেক্ষা করিয়া শুচিবায়ুগ্রস্তা বিধবা যেমন করিয়া এঁটোকাঁটা-সক্‌ড়ি লম্বা লম্বা পদক্ষেপে ডিঙাইয়া যায়, তেমনই করিয়া সকল আকর্ষণকে সে ডিঙাইয়া আসিয়াছিল, খোকনকে ভালবাসিয়া স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়া মৃত্যুমুখে পড়িল। যে ভালবাসা মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার করে, সেই ভালবাসাই মৃত্যুর মুখে তাহাকে ঠেলিয়া দিল। ইহা কাহারও পরিহাস কি না তোমরাই ভাল বলিতে পারিবে। নিরুপায় হইয়া উহাকে তোমাদের নিকট আনিয়াছি, দেখিও ও যেন শান্তিতে মরিতে পারে। আমার আর কিছু বলিবার নাই।

*   *   *   *

শ্যামচরণ চুপ করিল, তাহার কপাল ঘামিয়া উঠিয়াছে, চোখের কোণে জলও যেন চকচক করিল। অস্বীকার করিব না, আমিও কিঞ্চিৎ অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। পেয়ালায় অর্দ্ধভুক্ত চা ঠাণ্ডা জল হইয়া গিয়াছে। দুর্ব্বলতা ঝাড়িয়া ফেলিবার জন্য হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলাম, সবই তো বুঝলাম শ্যামচরণ, তুমি তো বেশ নিঃশব্দে তোমার গৃহিণী আর সন্তানের ঘাড়ে দোষটা চাপিয়ে মনে মনে বীরত্ব অনুভব করছ—আমরা ডাক্তার মানুষ, সব জিনিস আমাদের র'য়ে-স'য়ে নিতে হয়। সাইকলজিক্যাল গল্প হিসেবে তোমার গল্পটা ভাল, কিন্তু নিছক গল্প ওটা।

শ্যামচরণ যেন আহত হইল। ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, তুমি কি বলছ বুঝতে পারছি না। বলিলাম, বুঝতে ঠিকই পারছ, সত্যের খাতিরে এমন একটা কল্পনাকে মাঠে মারা যেতে দিতে চাও না।

শ্যামচরণ অবাক হইয়া আমার দিকে চাহিল। আমি বলিলাম, অর্থাৎ, খোকনের সংস্রব না এলেও, আজ হোক, দুদিন বাদে হোক এ স্ট্রোক ওর আসতই। নিজের অপরাধে যে বিষ ওর শরীরে ঢুকেছে স্বয়ং ভগবানেরও ওকে বেকসুর খালাস দেবার ক্ষমতা ছিল না। স্ট্রোকটা সিফিলিটিক।

শ্যামচরণ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। হঠাৎ অত্যন্ত আবেগে আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া ধরা গলায় বলিল, তা হোক, তবু—

আমি তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলাম, নিশ্চয়ই, আমার ডিউটি আমি করব বই কি! এস।

বৃদ্ধা তেমনই অসাড় ভাবে পড়িয়া ছিল। শ্যামচরণ কাছে যাইতেই একবার চোখ মেলিয়া দেখিল এবং আরও যেন কি খুঁজিতে লাগিল।

আমি সস্নেহে তাহার ব্যাকুল চোখের পাতার উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে শ্যামচরণকে বলিলাম, এবার যখন আসবে তোমার খোকনকে সঙ্গে এনো।

কেষ্টর মা

কাজে-অকাজে গ্রামের শুচিবায়ুগ্রস্ত গৃহিণীরা পর্য্যন্ত তাহাকে ডাকিতেন—নাড়ু কুটিতে, খই-মুড়ি ভাজিতে, নারিকেলের তক্তি বানাইতে, বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে পান সাজিতে, তরকারি কুটিতে এবং সহস্রবিধ ক্ষুদ্র বৃহৎ অথচ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কার্য্যে কেষ্টর মাকে বাদ দিবার উপায় ছিল না। গ্রামের সমস্ত ভদ্র গোষ্ঠীর সেও একজন হইয়া পড়িয়াছিল। কাজে-কর্ম্মে অবশ্যপ্রয়োজনীয় বলিয়া তাহার পূর্ব্ব ইতিহাস যেন লোকে ইচ্ছা করিয়াই বিস্মৃত হইয়াছিল।

কিন্তু খুব অধিক দিনের কথা নহে, এই সামান্য নারীকে লাঞ্ছিত করিবার জন্য গ্রামের মহামহিম মোড়লমণ্ডলীর শিখা ও হুঁকা একসঙ্গে সবেগে আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার কথা উঠিলেই সতীসাধ্বী গৃহিণীরা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া মৌখিক শতমুখী প্রহারে বেচারাকে জর্জ্জরিত করিতেন; গ্রামের রসিকা যুবতীরা গোপনে তাহার সম্বন্ধে

আলোচনা করিত। গাঁয়ের গিন্নীবান্নী বউ ঝি, সমাজপতি ও ছেলে-ছোকরাদের এই নিন্দা সমালোচনা ও রূঢ়বাক্য যখন পল্লবিত হইয়া কেষ্টর মার কর্ণগোচর হইত, সে তখন যথাসম্ভব আপনার সামান্য কুটীর-প্রাঙ্গণে আত্মগোপন করিয়া অতীব সঙ্কোচে দিন কাটাইত,—পারতপক্ষে কখনই ঘরের বাহির হইত না। কোনও দিক দিয়া কোনও প্রকার বাধা না পাইয়া হতাশ হইয়া নিন্দুকেরা ক্ষান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ক্রমে সমাজে তাহা প্রতিষ্ঠা হইল—অন্তত তাহার নিন্দা কেহ আর করিত না, তবু এই প্রৌঢ়া 'বিধবা' নারী তাহার অভ্যস্ত সঙ্কোচটুকু পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। শুভ্র বসনখানিতে নিরাভরণ দেহখানি যথাসম্ভব আবৃত করিয়া মূর্ত্তিমতী ব্যথার মত সে গ্রামের ঘরে ঘরে নিতান্ত প্রয়োজনের কালে বিচরণ করিত। কিন্তু তাহার যত জ্বালা ছিল কেষ্টকে লইয়া। সে মাঝে মাঝে অন্তর্দ্ধান হইয়া গোপন গৃহকোণ হইতে এই প্রৌঢ়াকে টানিয়া আনিয়া গ্রামের পথে বাহির করিয়া দিত,—আহারের সময়ে গৃহে না ফিরিয়া এই অসহায়া নারীকে লোকের দ্বারে দ্বারে, ছেলেদের আড্ডায় আড্ডায় খোঁজ করিয়া ফিরিতে বাধ্য করিত। যখন গ্রামে তাহার সম্বন্ধে নিন্দার বান ডাকিত, সমাজপতিরা মাথা মুড়াইয়া মাথায় ঘোল ঢালিয়া গ্রাম হইতে তাহাকে বহিষ্কৃত করিবার জন্য রায়েদের চণ্ডীমণ্ডপে প্রত্যহ নূতন করিয়া রায় দিতেন, তখনও তাহাকে যথেষ্ট সঙ্কোচ লইয়া কেষ্টর সম্বন্ধে তদারক করিতে হইয়াছে। কালপ্রবাহে যে নিন্দা সমাজ বিস্মৃত হইল, কেষ্টর মা নিজে তাহা কখনও বিস্মৃত হইতে পারে নাই, আপনার জোরে কোন দিনই সে তাই কিছু অধিকার করিতে পারে নাই; আপনাকে যথাসম্ভব আড়ালে রাখিয়াই সে পরের কাজ করিয়া যাইত।

* * *

এখানে প্রথম ইতিহাস কিছু বলা আবশ্যক। কেষ্টর মা বলিয়া আজ সে সর্ব্বত্র পরিচিত হইলেও আসলে সে কেষ্টর মাতা নহে—কেষ্টই তাহাকে

এখন মা বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জা পায়। এই নিঃসহায় বিধবার দুঃখ লজ্জা সঙ্কোচের সব চাইতে বড় কারণও সেখানে।

রাইচরণ মোদকের গৃহিণী জ্ঞানদা যেদিন একমাত্র পুত্রকে স্বামীর পদতলে রাখিয়া চিরদিনের জন্য চক্ষু বুজিল, সেদিন রাইচরণ চক্ষে অন্ধকার দেখিল। স্ত্রীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যথাসম্ভব ধূমধামের সহিত শেষ করিয়া মাতৃহারা অপোগণ্ড রোরুদ্যমান শিশুকে লইয়া সে যখন ঘরের দরজায় আসিয়া বসিল, তখন পাড়ার বৃদ্ধ বৃদ্ধা হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার সমবয়স্ক বন্ধুরা পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই তাহাকে দ্বিতীয় বার সংসার করিবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যথোচিত ও অযাচিত উপদেশ দিয়া গেল। রাইচরণ একটিও কথা বলিল না। মৌন থাকিয়া তাহাদের কথায় সম্মতি দিল ভাবিয়া তাহারা প্রত্যেকেই খুসির ভাব দেখাইয়া আড়ালে বলাবলি করিল, "কি নির্ম্মম লোক গো, বউয়ের মরবার তর সয় না।" কিন্তু উপদেশ ও নিন্দার দ্বারা ভারাক্রান্ত হইয়াও রাইচরণ পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিতে পারিল না।

রাইচরণ লোকটা ছিল অত্যন্ত নিরীহ, গোবেচারী। বিবাহ না করিবার কোনও ধনুর্ভঙ্গ পণ তাহার ছিল না, বরঞ্চ বিবাহ করিয়া শিশুপুত্রকে লালন-পালন করিবার উপযুক্ত একটি লোক পাইলে সে অনেক যন্ত্রণার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে—ইহাও বিশ্বাস করিত, তবু নানা ঝঞ্ঝাটের ভয়ে সে বিবাহ করিতে পারিল না। যদি এক কোপে বলি দেওয়ার মত সহজেই কাজটা নিষ্পন্ন হইয়া যাইত তাহা হইলে বিবাহ করিতে তাহার বাধিত না, কিন্তু অনেক তোড়জোড়, অনেক হাঁক-ডাক করিয়া তবে একটি বিবাহ করিতে পারা যায়, তা সে দ্বিতীয় পক্ষই হউক আর তৃতীয় পক্ষই হউক; লোক-লৌকিকতা পাওনা-দেনা, মন্ত্রতন্ত্র, পুরোহিত-নাপিত—সে অনেক হাঙ্গামা; রাইচরণ বিবাহ করিতে পারিল না, অথচ দুগ্ধপোষ্য শিশুটিকেও মানুষ করিতে হইবে। পিতৃকুলে তাহার

আপনার বলিতে কেহ ছিল না। মাহিনা করিয়া লোক রাখিয়া ছেলেকে মানুষ করিবে এমন অর্থেরও তাহার অভাব ছিল। তাহাকে খাটিয়া খাইতে হয়। রীতিমত হাড়ভাঙা পরিশ্রম না করিলে দুইবেলা অন্নসংস্থান হওয়াই দুর্ঘট ; ছেলেকে লইয়া নিজে যে কিছু সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিবে তাহার সুযোগও ছিল না, অনভ্যস্ত কাজে অতিরিক্ত যত্ন দেখাইতে গিয়া শিশুর অবিরাম ক্রন্দনে সে দিশাহারা হইয়া পড়িতে লাগিল।

এরূপ ক্ষেত্রে আবাল্য-বিধবা শ্যালিকা কুসুমের কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। শাশুড়ী বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহার হাতেই সন্তানকে সঁপিয়া দিয়া সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিত, এখন থাকিবার মধ্যে এই এক কুসুম আছে। দাদার সংসারে অনেকগুলি সন্তান-পরিবৃত বউদিদিদের মন যোগাইয়া চলিতে তাহাকে যথেষ্টই পরিশ্রম করিতে হইত, অধিকন্তু উঠিতে বসিতে বউদিদির গঞ্জনা ও দাদার লাঞ্ছনা তাহাকে সহিতে হইত। বসিয়া বসিয়া অন্নধ্বংস করিয়া সে যে দাদার সমূহ ক্ষতি করিতেছে এবং একদিন স্বামী ও শ্বশুরকুলের মত এই সংসারের কাহাকেও যে গ্রাস করিবে ইত্যাদি কথা শুনিয়া শুনিয়া তাহারও বিশ্বাস হইয়াছিল, সে দাদার সংসারে ভয় ও ভার স্বরূপই অবস্থান করিতেছে।

শ্যালকের কাছে রাইচরণ প্রস্তাব করিয়া পাঠাইল—কুসুমকে তাহার নিকটে পাঠাইয়া দেওয়া হউক, ছেলে একটু বড় হইলেই কুসুম ফিরিতে পারিবে। কিন্তু শ্যালক রাজি হইলেও শালাজ প্রথমটা রাজি হইল না। মুখে অন্য কথা বলিলেও অপোগণ্ড সন্তান-পরিবৃত সংসারে কুসুম তাহার যন্ত্রণার কতখানি লাঘব করিত সে তাহা ভালরকমেই জানিত। কুসুম চলিয়া গেলে তাহার দুর্দ্দশার অবধি রহিবে না। শ্যালকের উত্তর শুনিয়া রাইচরণ দমিয়া গেল, এবং একদিন শিশুপুত্রকে সঙ্গে লইয়া গরুর গাড়ি সহযোগে শ্যালকের গৃহে দর্শন দিয়া অন্তত এক বৎসরের জন্য কুসুমের সহায়তা প্রার্থনা করিল। রাইচরণের বিশ্বাস ছিল যে, তাহার ও

শিশুর দুরবস্থা দেখিয়া শ্যালকের মন গলিবে। শ্যালক ও শ্যালক-পত্নীর মন গলিল কি না বুঝা গেল না বটে, কিন্তু কুসুম দিদির কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল। গরুর গাড়ির ভিতর হইতে সেই যে সে দিদির অনেক বয়সের অনেক আদরের ও অনেক পূজা-মানতের ফল এই কাঁটা-টুকুকে কোলে তুলিয়া লইল, আর তাহাকে কোল হইতে নামাইতে পারিল না। তাহার শূন্য মরুময় জীবনে এই শিশুটি যেন অমৃতবর্ষণ করিল। শৈশবে কখন তাহার বিবাহ হইয়াছিল, কখন সে নারীর চরম দুর্ভাগ্য বৈধব্য বরণ করিয়াছিল, এসব তাহার স্মরণেই ছিল না। তবে তাহার নিরাভরণ দেহ, পাড়হীন বসন ও সিন্দুরহীন সিঁথি, সে অন্য পাঁচজনের অপেক্ষা যে ভিন্ন কিছু, তাহা শৈশব হইতেই তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল। তারপর উঠিতে বসিতে শাশুড়ী, মাতা-পিতা ও পাড়া-প্রতিবেশীর কাছে বৈধব্যের জন্য সে খোঁটা খাইয়াছে, সকলে তাহার পোড়া কপালের দোষ দিয়াছে; সে ইহার প্রত্যুত্তরে কথা খুঁজিয়া পায় নাই। গত জন্মের নিদারুণ পাপের প্রত্যক্ষ প্রমাণ যখন এমনভাবে পাওয়া যাইতেছে, তখন তাহার বলিবার আছেই বা কি?

শৈশব ছাড়িয়া কৈশোরে, এবং কৈশোর ছাড়িয়া যৌবনে সে পদার্পণ করিল কিন্তু তাহার অপরিপক্ব মনে কোনও বিকার আসিতে পারিল না, মনের গোপন কোণেও বিন্দুমাত্র রং ধরিল না, সে শিশুই রহিয়া গেল। দাদার সংসারে কাজের চাপে সে নিভৃতে নিজেকে যাচাইয়া দেখিবার অবকাশ পায় নাই, তাহার আর পাঁচজন সমবয়সী যে স্বামীদের লইয়া আমোদ-আহ্লাদ করে, সে পারে না, ইহা বিচার করিয়া দেখিবার মত অবসরও সে পায় নাই। মনের পরিণতি না ঘটিলেও দেহে তাহার যৌবনের বান ডাকিয়াছিল, এবং ঘাটের পথে পাড়ার রসিক ছোকরারা সঙ্গীতে ইঙ্গিতে সেটি তাহাকে বুঝাইবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছিল, কিন্তু সক্ষম হয় নাই। যৌবনের অপরূপ লাবণ্যহিল্লোল সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়াও কুসুম শিশু

ছিল। দাদার সন্তানদের মানুষ করিবার ভার হাতে পাইয়াও বউদিদির অত্যাচারে সে মাতৃত্ব অনুভব করে নাই। দিদির পুত্রটিকে কোলে পাইয়া সে সহসা শৈশব হইতে অনেক ধাপ প্রমোশন পাইয়া একেবারে মা হইয়া বসিল। যে সঙ্কোচ সে এতকাল মনের মধ্যে অহরহ অনুভব করিতেছিল তাহা যেন কোথায় মিলাইয়া গেল, সে দাদা ও বউদিদির সামনে বিশেষ জোরের সহিত গিয়া বলিল যে, ভগিনীপতির সহিত সে যাইবে। বলিয়া দিদির পুত্রটিকে বুকের কাছে লইয়া চুমু খাইল। দাদা বলিল, বটে! আচ্ছা। কুসুম চলিয়া যাইতেই তাহার বউদি তাহার এই অকারণ শিশুপ্রীতি দেখিয়া এমন একটা কুৎসিত ইঙ্গিত করিল যে স্বামীর কাছেই সে ধমক খাইল।

কুসুম রাইচরণের সহিত চলিয়া গেল। সেই যে তেইশ বৎসর বয়সের সময় সে রাইচরণের গৃহে পদার্পণ করিয়াছিল, তাহার পর সে প্রৌঢ়া হইল তবু দাদার গৃহে সে ফিরিতে পারে নাই, রাইচরণের শিশু তাহাকে এমনিভাবে আষ্টে-পিষ্টে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল। পেটে না ধরিলেও সে এক মুহূর্ত্তের জন্যও আর ভাবিতে পারে নাই যে, কেষ্ট তাহারই সন্তান নয়।

কেষ্টর প্রতি স্নেহ ছাড়াও দাদার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পথে আর একটি প্রবল অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছিল। রাইচরণের সহিত তাহার একটা কুৎসিত ঘনিষ্ঠতার কথা দিদির শূন্য গৃহে পদার্পণ করিবার অল্পদিনের মধ্যেই রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল—নিন্দুকেরা যেন ইহার জন্য ওত পাতিয়া ছিল। সত্য হউক, মিথ্যা হউক, এতবড় কলঙ্কের কথা শুনিয়াও রাইচরণ বা কুসুম কখনও ইহার প্রতিবাদ করে নাই। রাইচরণ তাহার দোকানের গণ্ডীর মধ্যেই ডুব মারিল এবং কুসুম কেষ্টকে বেশি করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া ঘরের কোণ আশ্রয় করিল, পারতপক্ষে ঘরের বাহির হইত না।

বস্তুত নিন্দা উঠিবার এমন সহজ সুযোগ আর কোনও মানুষে দেয় নাই। বিপত্নীক হইলেও রাইচরণের বয়স এমন কিছু বেশি হয় নাই

যাহাতে "সোমত্ত"বয়সী এই বিধবা শ্যালিকার সহিত একত্রবাস লোকে উপেক্ষা করিতে পারে। বাড়িতে এক কচি শিশু ছাড়া জনপ্রাণী থাকে না, এমত অবস্থায় অন্যায় কিছু না ঘটাই অন্যায়। লোকে বিশেষ বিশেষ দিন ও ঘটনার উল্লেখ করিতে পর্যন্ত ছাড়িল না, কে কি শুনিয়াছে, কে কি দেখিয়াছে, রায়দের চণ্ডীমণ্ডপে তাহার শুনানি হইল। সমাজপতিরা আগুন হইলেন। গাঁয়ের গিন্নীবান্নীরা পুকুরঘাটে যথেষ্ট তোলপাড় শুরু করিলেন, ঘৃত এবং অগ্নিনামক পদার্থের পরস্পর সান্নিধ্য কি ভীষণ কুফল-প্রদ তাহার জ্ঞাত ও শ্রুত অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল। এমনই করিয়া কুসুমের আগমন গ্রামের শান্ত জীবনযাত্রায় কিছু রং ধরাইয়াছিল বটে, কিন্তু নিন্দা কটূক্তি টিকিবার পক্ষে যে প্রতিবাদ ও ক্রোধ প্রকাশের প্রয়োজন, রাইচরণ বা কুসুমের দিক হইতে তাহার একটিও না আসাতে এক হাতে তালির মতই তাহা ক্রমশ নিঃশব্দ হইয়া আসিল।

এই নিন্দার প্রথম হিড়িকে রাইচরণ কিছু প্রমাদ গনিয়াছিল এবং কুসুমকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে শ্যালককে অনুরোধ করিয়া পত্রও দিয়াছিল। সে কোনও কারণ দেখায় নাই, কিন্তু এই নিন্দার ঢেউ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পৌঁছাইতে বেশি সময়ও লাগে নাই। কুসুমের দাদা অনতিবিলম্বেই ভগিনীর ভ্রষ্ট চরিত্রের কথা শুনিয়া রাগে গরগর করিতে লাগিল। স্ত্রী তাহাকে শুনাইয়া বলিল, কেমন, বলিয়াছিলাম কি না! তখন তো ভগ্নীর সতীপনা দেখিয়াছিলে! সুতরাং দাদার গৃহে কুসুমের স্থান হইল না, সে রাইচরণের আশ্রয়েই রহিয়া গেল। সেও কোনদিন মুখ ফুটিয়া অন্যত্র যাইবার কথা রাইচরণকে বলে নাই, কারণ কেষ্টকে ছাড়িয়া থাকিতে সে পারিবে না; নিন্দা সহিতে সে বরং প্রস্তুত আছে। রাইচরণও আর বিশেষ কিছু চেষ্টা করিল না। কানে তুলা গুঁজিয়া ও পৃষ্ঠে কুলা বাঁধিয়া সে গ্রামেই রহিয়া গেল। কুসুম চলিয়া গেলে কেষ্টকে মানুষ করিবে কে?

কেষ্ট কুসুমের আদরে যত্নে মানুষ হইতে লাগিল, এবং তাহাকেই মা বলিয়া জানিল। এদিকে গ্রামের নিন্দার বান কমিতে কমিতে রাইচরণের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে একেবারেই বন্ধ হইয়া গেল।

পাঁচ বৎসরের শিশুপুত্র এবং স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সমস্ত কুসুমের হাতে সমর্পণ করিয়া রাইচরণ একদা সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। তাহার এই অকালমৃত্যুতে 'আহা' করিবার লোকও ছিল না। কুসুম কেবল স্তব্ধ হইয়া পিতৃমাতৃহীন সন্তানকে আঁকড়িয়া ধরিয়া গ্রামের মাতব্বরদের পায়ে ধরিয়া যথাকর্তব্য সম্পাদন করাইল।

কুসুমের দাদা ভগিনীপতির মৃত্যুসংবাদ এবং তাহার পরিত্যক্ত নগদ অর্থের সংবাদ একটু অতিরঞ্জিতভাবেই শুনিল, লোকের কাছে বলিয়া বেড়াইল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে।

একদিন সে হঠাৎ রাইচরণের গৃহে দেখা দিল। সকলকে বলিল, মায়ের পেটের বোনকে সে ফেলিবে কি করিয়া, তা সে যতই কেন—ইত্যাদি।

রাইচরণের শ্যালক যাহাই শুনিয়া থাকুক, মৃত্যুর সময় রাইচরণ কুসুমের হাতে নগদ পাঁচ শত টাকার কিছু অধিক ধরিয়া দিয়া বলিয়াছিল, কেষ্টকে যেন এই অর্থে সে লেখাপড়া শেখায়। জমিজমা ও দোকানঘর বিক্রয় করিয়া বিধবার ও শিশুর ভরণপোষণ চলিয়া যাইবে—ইহাও সে বলিয়া গিয়াছিল। অশ্রুসজলচক্ষে ভগিনীপতির মৃত্যুশয্যায় কুসুম বলিয়াছিল, যেন মৃত্যুকালে কেষ্টর জন্য সে বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে। সে জীবিত থাকিতে কেষ্টকে কোন দুঃখ পাইতে দিবে না, তাহাকে লেখাপড়া শিখাইবে। দাদার কথাবার্তা শুনিয়া তাহার গোপন মতলব বুঝিতে কুসুমের বিলম্ব হইল না। সে দৃঢ়কণ্ঠে বলিল যে, রাইচরণের ভিটা ছাড়িয়া সে কোথাও এক পা নড়িবে না। অনুনয় বিনয় উপরোধ ক্রোধে কোনও ফল হইল না, অভিশাপ দিতে দিতে দাদা প্রস্থান করিল।

তাহার পর হইতে পাঁচ বৎসরের শিশুকে লইয়া এই নারী কায়ক্লেশে

দিন যাপন করিয়াছিল। এখানে-ওখানে কাজে-অকাজে সাহায্য করিয়া যাহা জুটিত, তাহাতেই কোনও রকমে দুইজনের পেট চলিত, দোকান-ঘরখানি বিক্রয় করিয়াও কিছু অর্থ হাতে আসিয়াছিল। গ্রামের লোকেরা বিরুদ্ধাচরণ ত্যাগ করিয়া এই বিধবাকে সাহায্য করিতে লাগিল। কেষ্টকে লইয়া সুখে দুঃখে কুসুমের দিন যাইতে লাগিল। কেষ্টকে গ্রামের পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল, সমাজপতিদিগের তরফ হইতে কোনও বাধা আসিল না। কেষ্ট দিনে দিনে বড় হইতে লাগিল। লেখাপড়াতে তাহার খুব মনোযোগ, রাইচরণ ও দিদিকে স্মরণ করিয়া কুসুম মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিত।

কিন্তু অকস্মাৎ একদিন, যে দিক হইতে বিপদের কোনও আশঙ্কা না করিয়া কুসুম নিশ্চিন্ত ছিল বিপদ আসিল সেইদিক হইতেই। কেষ্টর হাতেই কুসুম আঘাত পাইতে লাগিল বেশি। কুসুম গোপনে অশ্রুবিসর্জ্জন করে ও আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয়, এ কথা কাহাকেও বলিবার নহে।

কেষ্ট কুসুমের আদর-যত্নে বাড়িতে লাগিল, সকল বিষয় বুঝিয়া দেখিবার মত বুদ্ধি তাহার হইল। সে কুসুমকে মা বলিয়াই জানিত ও ভক্তি করিত, কিন্তু অকারণে আগুন জ্বালাইবার লোকের অভাব পৃথিবীতে নাই। কে একদিন নির্ম্মমভাবে বালককে বুঝাইয়া দিল যে, কুসুম তাহার মাতা নহে। তাহার পিতার রক্ষিতা মাত্র। রক্ষিতা বলিতে কি বুঝায়, বালক কেষ্ট তাহা ঠিক না বুঝিলেও মর্ম্মান্তিক আঘাত পাইল। তাহার মনে হইল, কুসুম এতদিন অকারণে তাহাকে ঠকাইয়াছে। একজন দুইজন করিয়া অনেকেই এখন এ কথা তাহাকে শোনায় এবং অতিরঞ্জিত করিয়াই শোনায়। কুসুমের প্রতি তাহার পিতার অবৈধ প্রীতিই যে তাহার মাতার মৃত্যুর কারণ, এমন কথাও কেহ কেহ তাহাকে বুঝাইল। দশ বৎসরের বালক পিতার রক্ষিতার উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেল।

ইহার পর হইতে কুসুমের আদরযত্ন কেষ্টর বিষবৎ মনে হইত।

তাহার শিশুমনের উপর এই অস্পষ্ট কানাঘুষাগুলি অত্যধিক প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। যাহাকে সে মাতৃ-জ্ঞানে ভক্তি করিয়াছে, আদর-আবদারে যাহার চিত্তকে ভরাইয়া রাখিয়াছে, তাহাকেই এখন সে ডাইনী রাক্ষসী ইত্যাদি বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিল। কেষ্ট লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইবে—রাইচরণের এই মৃত্যুকালীন বাসনা কুসুম অহরহ স্মরণ করিত; এই লেখাপড়াতেই কেষ্টর শৈথিল্য লক্ষিত হইল। নানা-দিকের ঘাত-প্রতিঘাতে তাহার শিশুচিত্ত বিক্ষিপ্ত হইল।

তাহার সমবয়সীরা তাহাকে সামনে পিছনে উপহাস করে, কুসুমের সম্বন্ধে কুৎসিত ইঙ্গিত করে,—কেষ্ট কুসুমের প্রতিই ইহাতে ক্রুদ্ধ হয়। তাহার জন্যই তো তাহার এই অপমান! সেও বন্ধুদের সহিত যোগ দিয়া কুসুমের নিন্দা করে।

যে মাতার কাছে ফিরিবার জন্য আগে আগে কেষ্ট উতলা হইত এখন সেই বাড়িই তাহার কাছে অত্যন্ত হেয় বলিয়া মনে হইল, সে বাড়ি হইতে দূরে দূরে ফিরিতে লাগিল, গ্রামের নষ্ট দুষ্ট প্রকৃতির ছেলেদের সহিত মিশিয়া সে নানাপ্রকার ছোট কাজ করিতেও আর দ্বিধা বোধ করিল না। কুসুম কাঁদিয়া আকুল হইল।

কুসুম মুখ ফুটিয়া কেষ্টকে কিছু বলিতে পারে না। আজ এতকাল যে চুপ করিয়া সকল অপবাদ সহ্য করিয়া আসিয়াছে, আপনার সন্তানের সহিত সে তাহার কি বিচার করিবে? যাহাকে কোলে লইয়া এই অসহায়া নারী পৃথিবীর সমস্ত অপমান তুচ্ছ করিয়া আসিয়াছে, আজ তাহারই অপমান তাহাকে মর্ম্মান্তিক আঘাত করিল। নিরুপায় নারী ইহার কোনও প্রতিকারের উপায় কল্পনা করিতে পারিল না।

মধ্যাহ্নে আহারের সময় কেষ্ট বাড়ি আসে না, কুসুম তাহাকে খুঁজিতে বাহির হয়। কোনও রাস্তায় যদি তাহার সাক্ষাৎ মিলে বন্ধুদের সম্মুখেই কেষ্ট তাহাকে অপমানে জর্জ্জরিত করে। কখনও কখনও দুই-একদিনের

জন্য কেষ্টর খোঁজ পাওয়া যায় না। কুসুম কাঁদে, নিরাহারে বিনিদ্র রজনী যাপন করে।

কেষ্টর বয়স বাড়িতে লাগিল কিন্তু পড়াশোনায় সেই যে ভাটা পড়িয়াছিল, আর জোয়ার আসিল না। রাইচরণের শেষ ইচ্ছা অপূর্ণ রহিয়া গেল। কেষ্ট পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিল এবং একদিন কোনও সমবয়সী বন্ধুর প্ররোচনায় গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতা রওনা হইল। কুসুম চক্ষে অন্ধকার দেখিল।

অপরিণতবয়স্ক বালক কলিকাতার মত আজব শহরে কি করিয়া দুই বেলা দুই মুঠা অন্ন সংস্থান করিবে, হয় তো না খাইতে পাইয়াই মারা যাইবে, ইত্যাদি নানা সম্ভব অসম্ভব কল্পনায় কুসুম পীড়িত হইত,—গাড়ি, ঘোড়া, গুণ্ডা, পুলিস, জুয়াচোর কত রকমে লোকের সর্ব্বনাশ ঘটিয়া যায়। প্রবীণ লোকেরাই নির্ব্বিঘ্নে সেই ভয়ঙ্কর শহর হইতে ফিরিয়া আসিতে পারে না—সেই দুধের ছেলে কি করিয়া বাঁচিবে? হাতে তাহার একটিও পয়সা নাই! তাহারই পিতার উপার্জ্জিত এবং তাহারই শিক্ষা বাবদ সযত্নে রক্ষিত প্রায় ছয় শত টাকা কুসুমের নিকট রহিয়াছে, অথচ সে কলিকাতার পথে হয়তো অন্নের জন্য ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছে—এ চিন্তা কুসুমের অসহ্য হইল।

যে ছেলেটির সঙ্গে কেষ্ট কলিকাতা গিয়াছিল, কুসুম একদিন তাহাদের গৃহে উপস্থিত হইয়া কেষ্ট প্রভৃতির খবর জিজ্ঞাসা করিল। তাহারা কোনও সন্ধানই জানে না। হতাশভাবে কুসুম ঘরে ফিরিল।

কলিকাতা-প্রত্যাবৃত্ত রায়েদের বড় ছেলের মুখে একদিন কেষ্টর খবর পাওয়া গেল। কলিকাতার কোনও হোটেলে চাকরি লইয়া কেষ্ট নাকি বহুকষ্টে জীবনযাপন করিতেছে। কুসুম সকল সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া রায়েদের ছেলের সহিত একদিন দেখা করিয়া তাহাকে বলিতে বলিল, সে যেন গ্রামে ফিরিয়া তাহার ছয় শত টাকা বুঝিয়া লয় ও তাহা দ্বারা গ্রামেই

হউক যেখানেই হউক একটা দোকান খুলিয়া নিজের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করে। বাবুটি স্বীকৃত হইলেন।

হায় রে, কুসুমের কত আশাই না ছিল! কেষ্ট লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইবে, বউ ঘরে আসিবে, তারপর নাতি-নাতিনীদের লইয়া তাহার জীবন কিরূপ ভরিয়া উঠিবে—এই সব কল্পনা সে প্রায় করিত। এখন কুসুম আকাশ-কুসুম রচনা করিতেও ভরসা পায় না।

একদিন হঠাৎ কেষ্ট গ্রামে আসিয়া উপস্থিত। নিজের বাড়িতে সে উঠিল না। তাহার সেই বন্ধুর বাড়িতে আশ্রয় লইল, কুসুমের সহিত দেখা করিয়া তাহার পাওনা টাকার দাবি করিল। কুসুম কাঁদিতে কাঁদিতে জানাইল, তাহার টাকা তাহারই আছে। সে আপনার ঘর সংসার বুঝিয়া লউক, এই বৃদ্ধ বয়সে পরের বোঝা আগলাইতে আর সে পারে না। কেষ্ট সমস্ত বুঝিয়া লইলে সে সেখানে থাকিবে না, যেমন করিয়াই হউক অন্যত্র সে পোড়া পেটের ব্যবস্থা করিবে।

কেষ্ট বলিল, বেশ্যার বাড়িতে সে থাকিতে পারিবে না। কুসুম শুনিয়া স্তম্ভিত হইল, এতটা সে প্রত্যাশা করে নাই। গ্রামের সমাজপতি গৃহিণী-বউঝিয়েরাও যে কথা তাহাকে বলিতে পারে নাই, আজ কেষ্ট কি না সেই কুৎসিত কথা উচ্চারণ করিল! তাহার চক্ষে অশ্রু শুকাইয়া গেল। সে আর একটিও কথা না বলিয়া বহুদিনের সযত্নরক্ষিত কেষ্টর শিক্ষার খরচ প্রায় ছয় শত টাকা কেষ্টর হাতেই গুণিয়া দিল। কেষ্ট কথা না বলিয়া চলিয়া গেল।

কুসুম এবার কাঁদিতে বসিল, তাহার দিদিকে স্মরণ হইল, রাইচরণের কথা মনে পড়িল। হায় রে অতীত! হায় রে ভবিষ্যৎ। আমৃত্যু এই শূন্য কুটীরে সে একলা কাটাইবে কি করিয়া? স্মৃতির বৃশ্চিকদংশনে সে পাগল হইয়া যাইবে, যে কেষ্টকে এতকাল বুকের রক্ত দিয়া মানুষ করিল, সে তাহাকে চরম অপমানকর কথা বলিতেও দ্বিধা করিল না।

কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও কুসুম মনকে দৃঢ় করিতে পারিল না, কেষ্টর কথা ভাবিয়া সে আকুল হইল। গ্রামের প্রত্যেকের কাজে সে এখন যথাসাধ্য সাহায্য করে, সকলে তাহাকে কেষ্টর মা বলিয়াই খাতিরযত্ন করে। তাহার পূর্ব্ব ইতিহাস কেহ মনে রাখে নাই—শুধু নিঃসঙ্গ রাত্রির অবসরে কেষ্টর সহিত শেষ সাক্ষাতের দিনের কথাগুলি তাহার মনে আগুনের মত জ্বলিতে থাকে। তাহার দুঃখে এখন সকলেই সহানুভূতি দেখায়। পাড়ার প্রবীণা গৃহিণীরা বলেন, "আহা, ছেলেটা কি পাষাণ গা, মাগীকে এত কষ্টও দেয় !"

কেষ্ট টাকা লইয়া সেই যে গিয়াছে, আর তাহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নাই, তাহার কোন খোঁজও কেহ দিতে পারে নাই। কলিকাতায় যাহাদের যাওয়া আসা আছে, কুসুম তাহাদের কাছে ঘোরাফেরা করে, কেহ কোনও সন্ধান দিতে পারে না।

* * * *

একটি বৎসর ঘুরিয়া গেল। কেষ্টর সন্ধান পাওয়া গেল না। কুসুম দারুণ রোগে শয্যাশায়ী হইল। মৃত্যুযন্ত্রণায় ছট্‌ফট করিতে করিতে সে কেবল কেষ্টর কথা বলিতে লাগিল, তাহাকে দেখিতে চাহিল। গ্রামের ভদ্রঘরের গৃহিণীরা তাহার রোগের সময় তাহাকে দেখিতে আসেন ; প্রত্যেকেই যথাসাধ্য এই নিঃসঙ্গ নারীর সেবা করেন, কিন্তু তাহার হাহাকার কেহ ঘুচাইতে পারেন না। কেষ্টর কথা ছাড়া তাহার মুখে অন্য কথা নাই। তাহার একমাত্র কামনা যেন কেষ্ট তাহার মুখাগ্নি করে, সেই কথাই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সে সকলকে জানায়। কিন্তু রাইচরণের শেষ ইচ্ছার মত তাহারও শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। পাড়া-প্রতিবেশিনী-পরিবৃত হইয়া কুসুম একদিন প্রাণত্যাগ করিল ; কিন্তু কেষ্ট আসিয়া তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিল না ; সে কোথায় রহিল কেহ জানিতেও পারিল না।

কেষ্টর মার কথা এখন সকলে প্রায় বিস্মৃত হইয়াছে। কেষ্টও সেই হইতে আর গ্রামে দর্শন দেয় নাই। শুধু বৃদ্ধা রায়-গৃহিণী এখনও মাঝে মাঝে কেষ্টর মায়ের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, কেষ্ট ফিরিলে তাহাকে দিয়া কুসুমের নামে গয়ায় পিণ্ড দেওয়াইবেন। তাহাতেই হয়তো পরলোকে এই দুর্ভাগিনীর আত্মা পরিতৃপ্ত হইবে।

গল্প

পর পর পাঁচটি মেস ও হোটেলের রান্নাঘরের দরজায় কিংবা ম্যানেজারের নোটিস বোর্ডে মাথা ঠুকিয়া শেষে নিজে আলাদা একটা বাড়ি লওয়াই ঠিক করিলাম। দৈনিক কাগজের নিজস্ব সংবাদদাতা রূপে মাসিক ৭০।৭৫ টাকা মাত্র আয় করিতাম বটে, কিন্তু পিতার কনিষ্ঠ পুত্র হওয়ার যে সুবিধা তাহা পুরাপুরি ভোগ করিতেছিলাম। পোষ্য বলিতে আমার কেহ ছিল না। বাবা গবর্মেণ্টের দৌলতে বেশ দুইপয়সা আয় করিতেন; তাঁহাকে মাসিক কিছু সাহায্য করার কথা মনেও হইত না। দুই বৎসর হইল বিবাহ করিয়াছি, কিন্তু পত্নীটি ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত বৎসরের কিছু কাল কলিকাতায় বাগবাজারস্থিত তাহার পিতৃগৃহে এবং কিছুকাল আমার পিতৃগৃহে দোল খাইয়া ফিরিতেছিল। তাহাকে পত্নী-হিসাবে-প্রাপ্য কিছু দিতে কেমন যেন লজ্জা করিত। সুতরাং যাহা আয় করিতাম, তাহা ব্যয় করিবার অধিকারও মনে মনে অর্জ্জন করাতে ত্রিশ টাকা দিয়া বাড়ি ভাড়া লইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিলাম না। একটি চাকর রাখিলাম, সে একাধারে আমার চাকর, ঠাকুর ও মুরুব্বি ছিল। মোটের উপর ওই সামান্য টাকায় ঘরভাড়া এবং গোবিন্দের মাহিনা দিয়াও দুইজনের খাইবার উপযুক্ত টাকা থাকিত এবং উদ্বৃত্ত টাকা দিয়া বন্ধুদের চা ও সিগারেট সরবরাহ করিতে কুণ্ঠিত হইতাম না

আমারই একটি বন্ধু তাহাদের বাড়ির নীচের তলাটা আমাকে ভাড়া দিয়াছিল। বাড়িটা একটা নোংরা পল্লীর মধ্যে হইলেও আমার তেমন কিছু অসুবিধা হইত না। সকাল নয়টার সময় ভাত খাইয়া বাহির হইয়া যাইতাম এবং পাঁচটা সাড়ে পাঁচটার সময় প্রায়ই বাড়ি ফিরিতাম; মাসের মধ্যে ত্রিশ দিনই প্রায় সে সময় এক বা একাধিক বন্ধু আমার সঙ্গে জুটিত। চা ও চুরুটে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত হুল্লোড় করিয়া কাটাইয়া দিতাম। তারপর গোবিন্দের কৃপায় যাহা জুটিত, তাহা তৃপ্তির সঙ্গে আহার করিয়া ঈজিচেয়ারটা প্যাসেজে (passage) রাখিয়া তাহাতে চিত হইয়া পড়িয়া সামনে একটা মোড়ায় পা তুলিয়া দিতাম আর চুরুট টানিতে থাকিতাম। মাঝে মাঝে আমার কাংস্যবিনিন্দিত কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের গানের পোঁ ধরিতেও ছাড়িতাম না। বস্তুত এই নিঃসঙ্গ রাত্রিগুলিতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ, কালিদাসের গ্রন্থাবলী আর শেলীর 'Complete Works' আমার সঙ্গী ছিল। আমি চেয়ারের পিছনে লণ্ঠন রাখিয়া উচ্চকণ্ঠে কখনও বা মেঘদূত পড়িতাম; কখনও বা মহোল্লাসে 'বর্ষশেষ' আবৃত্তি করিতাম, এবং ইংরেজীতেও আমি কম যাই না এই গর্ব্ব ছিল বলিয়া নিঝুম নিশীথ রাত্রে শেলীর 'Spirit of Solitude' কিংবা 'Hymn to Intellectual Beauty' পাঠ করিতাম। আমার ওই বাড়িওয়ালা বন্ধু যতীন প্রায়ই ওই সময়টা আমার কাছে বসিয়া একটু সঙ্কোচ ও শ্রদ্ধা সহকারে আমার দিকে চাহিয়া থাকিত। কাব্যপাঠের অবকাশে আমাদের সংসারের অনিত্যতা ও বিবাহিত জীবনের নিদারুণ বন্ধন সম্বন্ধে আলোচনা চলিত।

যখন বাড়িভাড়া লইলাম, তখন সরমা (আমার স্ত্রী) হাজারীবাগে তাহার দাদামহাশয়ের কাছে থাকিত, সুতরাং রাত্রিতে প্রত্যহই গৃহবাস করিতে হইত। মেসে অবস্থানকালে আমার স্ত্রী কলিকাতায় থাকিলে আমি নামমাত্র 'মেসের বাবু' থাকিতাম; খাওয়া ও শোওয়া প্রায়ই শ্বশুর-গৃহে করিতে হইত। কিন্তু এখন গোবিন্দের দৌলতে স্ত্রীর অবর্ত্তমানেই

হোম-কম্‌ফর্টস পাইতেছিলাম বলিয়া চায়ের দোকান, বায়োস্কোপ বা গড়ের মাঠে কিংবা কোথাও পরচর্চ্চা বা কুৎসা করিয়া সময় কাটাইতে হইত না। অবশ্য বাড়িতে থাকার অসুবিধা যে কিছু ছিল না তাহা নয়; রাত্রি দুই প্রহরে সামনের খোলার বাড়িগুলির কোনটায় মাতালের চীৎকারে কিংবা উৎপীড়িতা কোনও নারীর আর্ত্তক্রন্দনে ঘুম ভাঙিয়া যাওয়াতে যে সব কদর্য্য গালাগালি ও আলোচনা শুনিতে হইয়াছে, তাহাতে মধ্যে মধ্যে স্থানত্যাগ করিবার বাসনা হইয়াছে, তবু মোটের উপর শান্তিতে ছিলাম বলিয়া অন্য চেষ্টা করি নাই। প্রতিবেশীদের বাড়িতে কচি ছেলেমেয়ের কাঁদুনি কিংবা পাশের হরিহরবাবুর স্ত্রীর সহিত নিত্য কলহ আমার গা-সহা হইয়া গিয়াছিল।

আমি ও পাড়ায় বাসা লওয়ার পরদিন হইতে সেখানে বেশ একটু সোরগোল পড়িয়াছিল। প্রথম যেদিন বাড়িতে উঠিয়া আসিলাম আমার সঙ্গের আসবাব, বিশেষত দুই গাড়ি বই অনেকেই বেশ উৎসুক হইয়া দেখিয়াছিল দেখিয়াছি। যতক্ষণ বাড়িতে থাকিতাম, আমার নিজস্ব পেটেণ্ট সুরে চেঁচাইয়া, গান গাহিয়া, কবিতা আওড়াইয়া পাড়া সরগরম করিয়া রাখিতাম। বিশেষত বৈকালে অফিস-ফেরত যখন ঈজিচেয়ারটা সামনের গলিতে পাতিয়া বসিয়া বসিয়া সিগারেট টানিতাম আর কুড়ি পঁচিশ মিনিট অন্তর হাঁকিতাম, 'গোবিন্দ, চা', তখন আমার প্রতিবেশীরা আমাকে এক ভিন্ন রাজ্যের জীব বলিয়া কল্পনা করিত। তাহা ছাড়া আমার বাড়িতে যে-পরিমাণ বন্ধু সমাগত হইয়া যে-পরিমাণ চা ও সিগারেট ধ্বংস করিত ও যে-পরিমাণ চীৎকার করিত, তাহাতে পাড়ার অন্তরালবর্ত্তিনীদের প্রাত্যহিক কর্ম্মবন্ধনের অবকাশে দেখিবার বা শুনিবার বিষয়াভাব ঘটিত না। বিশেষত যেদিন হৃদয়দা আসিয়া রাত্রি এগারোটা পর্য্যন্ত তাঁহার হাসি গল্প ও গানে আসর জাঁকাইয়া তুলিতেন, সেদিন এই ভয় লইয়া শুইতে যাইতাম যে, পরদিন প্রাতেই যতীনের বাবা বাড়ি ছাড়িবার নোটিস দিবেন।

এমনই করিয়া দিন মন্দ কাটিতেছিল না। যেদিন নূতন কোনও কবিতা বা গল্প লিখিতাম, বন্ধুরা দল বাঁধিয়া শুনিতে আসিত, আমি মনে মনে লেখকজনসুলভ গর্ব্ব অনুভব করিয়া বেশ শান্ত নির্ব্বিকার ভাবে বসিয়া থাকিতাম ; চা যোগাইতে যোগাইতে গোবিন্দের প্রাণান্ত হইত।

ইতিমধ্যে একদিন যতীনের স্ত্রী বাপের বাড়ি হইতে শ্বশুরবাড়ি আসিল। যতীনের একটি মেয়ে লিলি, চমৎকার ফুটফুটে পুতুলের মতন মেয়েটি। আধো-আধো কথা ফুটিয়াছে,—'না' আর 'আবার' কথা দুইটি বিরক্তির সময় এমন জোর দিয়া উচ্চারণ করিত যে, মনে হইত সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথই বা হুকুম করিতেছেন। লিলির বয়স দেড় কি দুই বৎসর। প্রথম কয়দিন লিলি আমার পারিপাট্যহীন বিশাল বপু ও গোঁফ দেখিয়া ভয়ে কাছে ঘেঁষিল না, কিন্তু কখন যে ভয়ের ও সঙ্কোচের বাঁধন কাটিয়া গিয়া মেয়েটি একেবারে আমাকে আত্মসমর্পণ করিল লক্ষ্য করি নাই। একদিন হঠাৎ দেখিলাম লিলি আমাকে পাইয়া বসিয়াছে। যতক্ষণ বাড়িতে থাকি, সে আমার কাছে কাছে 'কাকা কাকা' করিয়া ফিরিত আর আমার অবর্ত্তমানে কাঁদিয়া কাটিয়া বাড়িসুদ্ধ সকলকে জ্বালাতন করিয়া মারিত। যতীন আমার কাজের ক্ষতি হইতেছে দেখিয়া সত্য সত্যই বড় লজ্জিত হইত। যতীনের স্ত্রীরও লজ্জার অন্ত ছিল না। সে লিলিকে কিছুতেই আমার কাছে আসিতে দিতে চাহিত না—তাহাকে মারিয়া ধরিয়া একাকার করিত।

যতীনদের বাড়িতে যতীনের বাবা, মা, বড় দাদা ও তাঁহার স্ত্রী ও তাঁহাদের একটি ছেলে, যতীনের একটি ছোট ভাই, যতীনের স্ত্রী, লিলি আর যতীন—এই কয়জন মাত্র প্রাণী। লিলি যতদিন ছিল না আমি বাহিরের লোক ছিলাম, বাহিরে বাহিরে ফিরিতাম, যতীনদের বাড়ির ভিতরের সন্ধান কিছুই পাই নাই। বরঞ্চ হরিহরবাবুর বাড়ি আমার খাওয়ার ঘরের ঠিক সামনেটিতে থাকাতে তাঁহাদের জীবন-যাত্রার সঙ্গে

অনেক বেশি পরিচিত ছিলাম। যতীনদের বাড়ির সঙ্গে গোবিন্দের ঘনিষ্ঠতা কিছু বেশি ছিল—কাজে অকাজে বাড়ির ভিতর তাহার ডাক পড়িত। কিন্তু লিলি তাহার অকারণ সৌহৃদ্য আর ঘনিষ্ঠতা দিয়া তাহাদের বাড়ির সহিত আমার দূরত্বটুকু ঘুচাইয়া দিতে লাগিল।

আমি খুব ভোরে উঠিতাম। ভোরে উঠিয়াই অভ্যাসমত গান ধরিতাম। লিলি আমার সাড়া পাইয়া নীচে আসিবার জন্য কাঁদিয়া উঠিত; আমাকে দেখিতে পাইয়া দোতলার বারান্দার রেলিং ধরিয়া নীচে ঝুঁকিয়া দেখিত আর ঘন ঘন ডাকিত, কাকা! উপরে মুখ তুলিয়া চকিতে দেখিতে পাইতাম, লিলির জ্যাঠাইমা রেলিঙের ধার হইতে লিলিকে সরাইবার জন্য তাহার হাত ধরিয়া টানাটানি করিতেছেন। আমাকে দেখামাত্র অন্তরালে সরিয়া যাইতেন; অথচ লিলিকে বলিতেন, কই কাকা! লিলি আর তাহার কাকার পরিচয়ের মধ্যে এই জ্যেঠাই-মাটির কিছু হাত ছিল। মাঝে মাঝে কদাচিৎ শুনিতে পাইতাম ভুলাইয়া ভুলাইয়া লিলিকে জামা পরাইবার বা দুধ খাওয়াইবার সময় জ্যাঠাইমা তাহাকে তাহার কাকার সম্বন্ধে নানা গবেষণামূলক কথা বলিতেছেন।

লিলিকে পাইয়া আমি বাহিরের বন্ধুবান্ধবদের একে একে প্রায় ছাড়িয়া দিলাম। অফিস আর বাড়ি—এ ছাড়া অন্যত্র যাওয়ার প্রয়োজন অনুভব করিতাম না—রিপোর্ট সংগ্রহ করিতেও নয়, কারণ সে কাজটা ঘরে বসিয়াই শৃঙ্খলার সহিত করা যাইত। এর বাহিরে মনের যতটুকু খোরাক দরকার হইত, পত্নীর ঘনঘন চিঠিতে তাহার পূরণ হইত। মোটের উপর আমার মতন নামজাদা বোহেমিয়ান একজন ধীরে ধীরে ডোমেস্টিকেটেড হইয়া পড়িতেছিল!

বাহিরে যাইতাম না বলিয়া আমার বাড়িতেই আড্ডা জমিতে লাগিল, কারণ আমাকে বাদ দিলে নাকি বন্ধুদের আসরটা তেমন জমিত না।

আমি সমানে চা এবং সিগারেট সাপ্লাই করিতাম এবং বাদলার দিন হইলেই খিচুড়ি ও ডিমভাজা অর্ডার করিতে এতটুকু ইতস্তত করিতাম না।

পেয়ালার ঠনঠন যত দ্রুততর এবং সিগারেটের ধোঁয়া যত নিবিড়তর হইতে লাগিল, মাসিক সত্তর-পঁচাত্তর টাকা কোথায় ফুঁকিয়া গিয়া দেনার অঙ্ক ততই ভারী হইতে লাগিল এবং একদিন নিতান্ত অসহায় অবস্থায় বোধোদয় হইল। ভাবিলাম, এ লাটীয় চাল চলিবে না, পুনর্মূষিক হইতে হইবে, মেস ভিন্ন গত্যন্তর নাই। শ্বশুরের কাছে টাকা ধার করিতে গেলাম, তিনি খুব একচোট ধমকাইয়া লইয়া বাড়ি এবং চাকর ছাড়িয়া দিয়া বাগবাজারে তাঁহার কেয়ারে থাকিতে আদেশ করিলেন। আমি সেইটাই সুবিধা ও লাভজনক ভাবিয়া যতীনকে নোটিস দিলাম। গোবিন্দকেও অন্যত্র চাকরির চেষ্টা করিতে বলিলাম।

দেখিলাম, বাড়ির সামনে আবার বাড়িভাড়ার বিজ্ঞাপন ঝোলানো হইল; পাড়ায় আবার একটা গোল পড়িল। লোকে পথ চলিতে চলিতে একবার করিয়া নোটিস পড়িয়া জিজ্ঞাসুনেত্রে আমার দিকে চাহিয়া চলিয়া যায়—আমার চিত্ত ব্যথিত হইতে থাকে। আমি এই যে পাঁচ মাস এখানে হাসি-গান-গল্প দিয়া পাড়াটিকে সজীব করিয়া রাখিয়াছিলাম, আজিকার বিদায়ের দিনে কোথাও কি এতটুকু ব্যথা বাজিবে না? দমকা হাওয়ার মত যে আসিয়াছিলাম, কোনও চিহ্নই কি রাখিয়া যাইব না? লিলির কথা বড় বেদনার সঙ্গে বুকে বাজিতে লাগিল। কাল বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যাইব, অভ্যস্ত সময়ে 'কাকা' বলিয়া সে ডাকিবে, কিন্তু কাকাকে না পাইলে সে কি দিনের হাসি-খেলা ভুলিয়া থাকিবে? আর কোথাও এতটুকু কাঁটা কি নাই?

আমি জোর গলায় পাড়াসুদ্ধ সকলকে শুনাইয়া গোবিন্দকে বলিলাম, কাল বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যাইব—তুমি আজই জিনিসপত্র লইয়া যেখানে চাকরি পাইয়াছ সেখানে যাও। লিলি কাছে আসিল। তাহাকে

বলিলাম, আমি চলিয়া যাইতেছি। বলিয়াই চকিতে যেন কি দেখিবার প্রত্যাশায় দূরের বারান্দার পানে চাহিলাম; শুধু সদ্য-মেলা একটা ভিজা কাপড়ের উপর বসিয়া একটা কাক কা-কা করিতেছে দেখিলাম।

সেদিন স্নানের সময় কান পাতিয়া শুনিলাম, জ্যাঠাইমার সহিত লিলির কথা হইতেছে। জ্যাঠাইমা বলিতেছেন, লিলি, তোর কাকা যে চলিল। লিলি বলিল, আবার! অর্থাৎ যাও অমন মিথ্যা কথা বলিও না। জ্যাঠাইমা বলিলেন, কাকাকে বল্, কাকা যেও না। লিলি আত্মগত ভাবেই বলিল, বল্ কাকা যেও না।

চরিতার্থ হইলাম। কে বলিল বন্ধন নাই? কোথায় কোন্ অজানা মৃত্তিকায় যে মানুষ পরিচয়ের শিকড় চালায়, কোন্ অদৃশ্য আকাশ হইতে প্রেমের বাণী পরিচয়ের বাণী সে শুনিতে পায়, কে বলিবে? চারিদিকে যখন ঊষর মরু দেখিয়া ব্যথিত ও ক্লিষ্ট হইতেছিলাম, তখন এই অনির্দিষ্ট স্থানে কে শীতল সরসী রচনা করিল?

শেষবারটির মত ঈজিচেয়ারটি পাতিয়া চুরুটের টিন লইয়া বসিলাম। কত কথাই একে একে মনে আসিতে লাগিল! এই যে শৈবালের মতন ভাসিতে ভাসিতে এই জলভাগে আসিয়া পড়িয়াছিলাম, বন্যার স্রোতে আপনার সমস্ত পরিচয় বিলুপ্ত করিয়া দিয়া অন্য কোথায়ও ভাসিয়া যাইব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু তাই কি হইবে? মানুষ এমনই করিয়া কি আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ হইতে পারে? পরিচয়ের অসংখ্য বীজ নিরন্তর চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে—দৈনন্দিন জীবনযাত্রার হাসি আনন্দে ও বেদনায় সামান্য দুইটি কথা কিংবা ক্ষণিকের একটি চাহনি কখন কোথায় জীবন পাইয়া কেমন করিয়া অঙ্কুরিত, পল্লবিত ও ফলফুলশোভিত হইতেছে, মানুষের সাধারণ ন্যায়শাস্ত্রে তো এ প্রশ্নের সমাধান নাই। এই বাড়ি-ঘর-দুয়ার সবই তো যেমন ছিল তেমনই থাকিবে;—একবার চুন ফিরাইয়া লইলেই হয়তো পরিচয়ের কালিমাটুকু নিঃশেষে বিলুপ্ত হইবে,

কিন্তু শহরের একপ্রান্তে এই যে এখানে ক্ষণিকের খেলাঘর রচনা করিয়াছিলাম, তাহা কি একলা আমারই জিনিস? তাহা ভাঙিয়া চুরিয়া আজ যে চলিয়া যাইতেছি, সে ভাঙনের ব্যথা কি শুধু আমাকেই বাজিবে? আমার প্রাণ এই ক্ষণিকের খেলাঘরের স্মৃতি লইয়া যে দীর্ঘশ্বাস ফেলিবে—তাহার সঙ্গে আর কোনও উত্তপ্ত শ্বাস কি মিলিত হইবে না?

চুরুটের ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাক খাইতে খাইতে শূন্যে মিলাইতে লাগিল; আমি নির্লিপ্ত বৈরাগীর মতন তাহা দেখিতে লাগিলাম। আমার মাথায় কল্পনার প্রবাহও অমনই পাক খাইতে লাগিল। আমি ভুলিয়া গেলাম, কাল আমাকে যাইতে হইবে, ভুলিয়া গেলাম আমি শ্রীঅমুকচন্দ্র অমুক, খবরের কাগজের অফিসে রিপোর্টার। যুগে যুগে যে সকল বিরহী দেবতার শাপে ব্যথিত নিশ্বাস ফেলিয়াছে আমি তো তাহাদেরই একজন—তাহাদের সঞ্চিত অশ্রুভার যে আমারই বুকে আসিয়া জমিয়াছে।

রোজ যেমন যায়, একটি দুটি করিয়া তেমনই লোক সামনের গলিতে যাতায়াত করিতে লাগিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিল। আজ গোবিন্দ নাই—আলো জ্বালা হইল না;—চায়ের আওয়াজ আর শুনা গেল না। বন্ধুরা আজ কেহ আসিল না। পথিকেরা প্রতিদিনের অভ্যস্ত আলোটি জ্বালা হইল না দেখিয়া কি ভাবিল জানি না; আমার মন বলিতে লাগিল—এ ঠিক হইতেছে না। আলোটি জ্বালাইয়া ঠিক জায়গাটিতে রাখিলাম, তার পর আবার ধোঁয়ার খেলা আর মনের খেলা চলিতে লাগিল।

কত অপূর্ণ কামনা, কত হতাশ্বাস, কত সুতীব্র বেদনা আমার মনে জমাট বাঁধিয়া রূপ পরিগ্রহ করিতে লাগিল, আবার ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকাইয়া কোথায় মিলাইয়া গেল। আমি চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া রহিলাম।—

* * ঘন মেঘে সারাটা আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে—চারিদিক কেমন থমথম করিতেছে। মনে হইতেছে এখনই যেন বিশ্বপ্রকৃতি ফাটিয়া

পড়িয়া বজ্র বিদ্যুৎ আর জলধারে ধরণীবক্ষ প্লাবিত করিবে। অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। এই দুর্যোগে আমি একমাত্র পথিক, গৃহহারা হইয়া আশ্রয় খুঁজিতে বাহির হইয়াছি। কুটিরে কুটিরে দ্বার বন্ধ হইয়াছে, মনে হইল এ যেন আমার অভিসার। 'ঘোর তবধ সব তিমির মগন ভব'—আমি একেলা অজানার অভিসারে চলিয়াছি।

কেমন করিয়া জানি না আশ্রয় পাইলাম। ঘরে প্রবেশ করিয়া বাতায়ন খুলিয়া দিয়া দেখিলাম, আসন্ন দুর্যোগ-আশঙ্কায় সব বাড়িরই বাতায়ন বন্ধ। জনসঙ্কুল নগরীর উপর যেন জনশূন্য মরুর প্রেতাত্মা হাহাকার করিয়া ফিরিতেছে।

চকিতের মত তাহাকে দেখিলাম—আলুলায়িতকুন্তলা, নিকষকৃষ্ণ মেঘের পানে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তন্ময় হইয়া কি দেখিতেছিল—বিশ্বপ্রকৃতির এই তাণ্ডবলীলায় তাহার ক্ষুদ্র মনে কি কামনা ঘনাইতেছিল জানি না। আমাকে দেখিয়া সে লজ্জিত হইল। শরমকুণ্ঠিত নয়নে পলাইতে গিয়া লজ্জিত হইয়া মুহূর্ত্তকাল হঠাৎ-ত্রস্ত হরিণীর মত থমকিয়া দাঁড়াইল; সম্মুখের দুই-একটি কেশগুচ্ছ তাহার চক্ষুর উপর আসিয়া পড়িয়া ছিল; অঞ্চলপ্রান্তস্থিত চাবির গোছা একটিবার মাত্র ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, তারপর দ্রুত অন্তরালে চলিয়া গেল। তাহার পিঠভরা কালো চুল আমার দৃষ্টিপথের উপর দিয়া একটি কালো জ্যোতিষ্কের মত নৃত্য করিতে করিতে অন্তর্হিত হইল। সেই ক্ষণিকের দেখা, তবু মনে হইল আমারই কারণে চারু-চরণ দুইটি লজ্জিত, মৃণাল বাহু দুইটি কুণ্ঠিত, নয়ন দুইটি ত্রস্ত আর হৃদয়টি যেন ফুলের ভিতরকার লুকানো মধুটুকুর মত মধুর—শিশিরটুকুর মতন করুণ।

ভাবিলাম অভিসার সার্থক হইয়াছে, প্রার্থিতের দর্শন পাইয়াছি।

দুর্যোগ কাটিয়া গেল। দৈনন্দিন জীবনযাত্রা শুরু হইল, কিন্তু তাহাকে আর দেখিলাম না। দিনের পরে দিনের ব্যর্থ আশায় ধীরে ধীরে

তাহাকে ভুলিয়া গেলাম, এবং আবার দিবসের কর্ম্মগ্লানির অবকাশে অপরিচিতা প্রেয়সীকে খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিলাম।

এমনই করিয়া দিন যায়, বাড়ির আনাচে-কানাচে রোমান্সের গন্ধ শুঁকিয়া ফিরি ; কল্পিত নায়িকাকে কখন পিছনের বাড়ির ছাদে দেখিতে পাই, কখন সামনের বাড়ির জানালায় চকিতে তাহার আভাস পাই ; কিন্তু এই ধোঁয়াটে পরিচয় ছাড়া তাহার আর কোনও নিরেট পরিচয় মেলে না।

প্রথম কিছুদিন সামনের বাড়ির একটি মেয়েকে লইয়া কাব্য শুরু করিলাম। তাহার ঘুম হইতে জাগরণ, ছেলে ঠেঙানো, স্নান, চুল আঁচড়ানো, বাহিরে যাওয়ার পোশাক পরা, রিক্শা করিয়া বাহিরে যাওয়া, বৈকালিক ছাদ-বিহার, কালোয়াতী গান ও মার সহিত ঝগড়ার মধ্যে বেশ কয়েকদিন দোল খাইয়া ফিরিলাম ; ভাবিলাম, এই তো মিলিয়াছে, এই আমার নায়িকা ! ইহাকে লইয়াই তো আমার কাব্য ! কিন্তু মাঝে মাঝে মনটা কেমন বিগড়াইয়া যাইত—সে তাহার মায়ের বা বাবার সহিত ঝগড়া করিবার সময় বা ছেলেকে মারিবার সময় যে কথাগুলি ব্যবহার করিত, তাহা মোটেই নায়িকাদের মুখে শোভা পায় না। বিশেষত প্রাতে ও সন্ধ্যায় যখন কেহ দরজায় ঘা দিত, তখন সে যে-ভাবে "কে গা !" বলিয়া হাঁক দিয়া উঠিত, তাহাতে আমার নায়কের মন অতিশয় পীড়িত হইত। সুতরাং আমি অবিলম্বে তাহাকে নায়িকার আসন হইতে বরখাস্ত করিলাম।

বসিয়া বসিয়া ভাবিতাম, হায় রে, আজ এতকাল কলিকাতার পথে পথে কাকের অত্যাচার আর মোটরের কাদা সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া ফিরিয়াছি, কিন্তু কই চোখের সামনে একটি গাড়িও তো উলটাইল না—'গোরা'র বিনয়ের মত যে, কোনও সকন্যা বৃদ্ধকে দুইদণ্ড ঘরে বসাইয়া চিরস্থায়ী আলাপের ব্যবস্থা করিব সে সুযোগও তো মিলিল না ! সুচরিতা ললিতা না হয় নাই জুটিল, নিদেন পক্ষে একটা সাবিত্রী কি একটা চন্দ্রমুখীই কি ভগবান জুটাইয়া দিতে পারিলেন না ?

এমনই করিয়া অনিশ্চিতের পিছনে আমার মন যখন কাঁদিয়া ফিরিতেছে, তখন কে জানিত আমার শঙ্কিতা বিরহিণী আমারই অতি নিকটে তাহার হৃদয় মেলিয়া বসিয়া আছে; আমি তাহার উত্তপ্ত নিশ্বাসের স্পর্শ পাইয়াছি, কিন্তু লক্ষ্য করি নাই। আমি যখন বাহিরে ছুটিবার জন্য ব্যস্ত তখন কে জানিত একটি ব্যগ্র হৃদয় আমার প্রতীক্ষায় ব্যাকুল আগ্রহে আমারই ঘরে পথ চাহিয়া আছে! সেই দুর্য্যোগদিনে যাহাকে চকিতের মত দেখিয়াছি, আমার সেই 'অধরা স্বপন' যে আমাকে লইয়াই স্বপ্ন রচনা করিতেছিল, তাহা তো ভাবিতে পারি নাই। আমি কল্পনায় অনেক শৈবলিনী ও আয়েষার স্বপ্ন হয়তো দেখিয়াছি, কিন্তু বাস্তব জীবনে এই রূপরসহীন লোকটিকে যে কাহারও প্রয়োজন ঘটিতে পারে, তাহা তো পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নামোদিত শারদীয় নিশীথেও মুহূর্ত্তের জন্য স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। তাই আশ্চর্য্য হইলাম, ভাবিলাম, প্রাণের দেওয়া-নেওয়া ব্যাপারে মানুষ গণিত বা ন্যায়ের পথ ধরিয়া তো চলে না; অসম্ভবের পথেই তাহার অভিযান, ভুলের মধ্যেই তাহার লীলা, এবং পৃথিবীর যাবতীয় ট্র্যাজেডির মূলেও এই অঘটন-সংঘটন।

যতদিন অনিশ্চিত ছিল ততদিন নায়িকা-মিলনের কথা ভাবিয়া রসাপ্লুত হইয়াছি, কিন্তু অনিশ্চয় যখন নিশ্চয়তার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল, আমার কল্পিতা বিরহিণী যখন অতি নিকটে চকিত চাহনি বা চঞ্চল পদক্ষেপে তাহার আভাস দিতে লাগিল, তখন ভয়ে বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিলাম—ভাবিলাম এ কী হইল! এমন তো কথা ছিল না।

বেশ অলসভাবে চলিতেছিলাম, হঠাৎ বাধা পাইলাম। দিনের পর দিন যখন ঈজিচেয়ারে বসিয়া বাহিরে ও ভিতরে ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকাইয়াছি, কে জানিত একটি শঙ্কিত চিত্ত অতি মনোযোগের সহিত আমার প্রত্যেকটি অঙ্গভঙ্গী লক্ষ্য করিতেছে; যখন গান ধরিয়াছি, কে জানিত আমার সেই অসুর-সুরে একটি চঞ্চল হৃদয় আন্দোলিত হইতেছে! সন্ধ্যা হাওয়ায় আমার উতলা ঘরের কোণে বসিয়া যখন হতাশ্বাস-হৃদয়ে

বাতায়ন-পথে দূর-দিগন্তে প্রেয়সীর সন্ধান করিয়াছি, তখন কে জানিত আমার অতি নিকটে তাহারই চারু-চরণের ছায়া-মঞ্জীর বাজিতেছে। যখন তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছি—

—মনে আছে সে কি সব কাজ, সখি,
ভুলায়েছ বারে বারে—
বন্ধ দুয়ার খুলেছ আমার,
কঙ্কণ-ঝঙ্কারে।
ইশারা তোমার বাতাসে বাতাসে ভেসে
ঘুরে ঘুরে যায় মোর বাতায়নে এসে,
কখনো আমের নব মুকুলের বেশে
কভু নব মেঘ-ভারে।
চকিতে চকিতে চল চাহনিতে
ভুলায়েছ বারে বারে—

হে আমার সেই অজানা প্রেয়সী, কোথায় তুমি? তোমার বিরহে নিরবধি শূন্যতার সীমাশূন্যভাবে আমার সমস্ত ভুবন মরুসম রুক্ষ হইয়া গিয়াছে। যখন আমার গোপন অভিসারিকার উদ্দেশে পাঠ করিয়াছি—

হে অভিসারিকা, তব বহুদূর পদধ্বনি লাগি,
আপনার মনে,
বাণীহীন প্রতীক্ষায় আমি আজ একা বসে জাগি,
নির্জ্জন প্রাঙ্গণে।
দীপ চাহে তব শিখা, মৌনী বীণা ধেয়ায় তোমার
অঙ্গুলি পরশ,
তারায় তারায় খোঁজে তৃষ্ণায় আতুর অন্ধকার
সঙ্গ-সুধা-রস।

তখন তাহারই চঞ্চল অঞ্চলের মদির স্নিগ্ধ বাতাস আমাকে স্পর্শ করিয়া

বলিয়াছে, 'ওগো অন্ধ ! প্রেয়সী তোমার এত নিকটে উন্মুখ প্রতীক্ষায় অধীর, আর তুমি কোথায় ব্যর্থ হাহাকার করিয়া ফিরিতেছ ?' তখন কে সেই মূক ইঙ্গিত বুঝিয়াছে ! সরমার চিঠি যখন আসিত আমি কি জানিতাম যে, আর একটি প্রাণী অন্তরালে থাকিয়া তাহা লক্ষ্য করিল ; এবং চিঠির প্রত্যেকটি অক্ষর আমার মুখে যে ছায়াপাত করিত, তাহা আর কাহারও হৃদয়কেও মথিত করিল ! যখন কোনদিন কোনও কারণে ব্যথিত চিত্তে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতাম, একটি স্নেহকরস্পর্শ দূর হইতে যে আমার কপাল ছুঁইয়া যাইত তাহা কি কখনও বুঝিয়াছি ! গোবিন্দ কোনদিন হয়তো রান্না করিয়া আমার খাবার ঢাকা দিয়া রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে ; জানিতাম না যে একজন ব্যগ্র আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছে আর মনে মনে বলিতেছে—'ওগো, খাও, তোমার ভাত যে শুকাইয়া চাল হইয়া আসিল'। যতক্ষণ আমি না খাইতাম, সেও কিছু মুখে দিত না ! রাত্রিতে আলোটি জ্বালাইয়া লইয়া যেদিন কিছু লিখিতে বসিতাম এবং ভাবের অভাবে ও মিলের অমিলে কুঞ্চিত ললাটে চুপ করিয়া অন্ধকার আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতাম, তখন যে একটি নারী-হৃদয় বাণীর দুয়ারে কাতর প্রার্থনা করিতে থাকিত, তাহাও তো এতদিন বুঝি নাই ;—যখন বুঝিলাম তখন শঙ্কা ও সঙ্কোচে ব্যথিত হইলাম।

প্রথম প্রথম কিছুই বুঝিতে পারি নাই, হঠাৎ চমক ভাঙিল সেদিন, যেদিন দেখিলাম আমার ব্যাচিলার্স' ডেনে কোনদিক দিয়া শত্রু প্রবেশ করিয়াছে। আমার ঘরে অনভ্যস্ত পারিপাট্য লক্ষিত হইল। প্রথমে মনে হইল গোবিন্দ কি সহসা আমার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া উঠিল ! অফিস যাইবার সময় প্রত্যহ গোবিন্দের কাছে চাবি রাখিয়া যাইতাম, সে ঘর ঝাঁট দিয়া রাখিত, কিন্তু এতকাল তো কই আমার বিছানার উপর বা টেবিলের সঞ্চিতধূলির দিকে তাহার নজর পড়ে নাই ;— তা হইবেও বা, মনিব দিন দিন পুরানো হইতেছে তো ! কিন্তু ক্রমশ সে

ভুল ভাঙিল,—দেখিলাম, ময়লা চাদর পরিষ্কার হইয়াছে, মশারির ছিন্ন অংশগুলি তালিসংযুক্ত হইয়াছে, বইগুলি বাংলা ইংরেজী ক্রমে বেশ শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে; চিঠিগুলি লেটার প্যাড্ বা ফাইলে যথাস্থানে স্থান পাইয়াছে। গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিতে ভরসা হইল না পাছে অপ্রিয় কিছু শুনিতে হয়।

কিন্তু এই চকিত আভাস-ইঙ্গিতের মাঝে মাঝে কি এক অজানা সুর আমার মনের আনাচে-কানাচে গুমরিয়া ফিরিতে লাগিল; বসন্ত-বাতাস কোন্ দিক্ দিয়া যেন আমার মনে প্রবেশ-পথ পাইয়া তোলপাড় তুলিয়া দিল। যাহার আভাস আভাসে মাত্র পাইয়াছি, তাহার সম্পূর্ণ পরিচয়ের জন্য মন ব্যগ্র হইল।

পরিচয় শেষে একদিন ঘটিলও—কেমন করিয়া তাহা বলিব না। মেয়েটি কে, তাহাও নাই বলিলাম। তাহার নাম লীলা। সে এত নিকটে কিন্তু এতদিন আভাসে ইঙ্গিতেও তাহার পরিচয় পাই নাই বলিয়া নিজেকে ধিক্কার দিলাম।—বুঝিলাম কত প্রতীক্ষা, কত শঙ্কিত বিনিদ্র রজনী যাপন ওই ক্ষুদ্র প্রাণীটিকে করিতে হইয়াছে, অথচ এত নিকটে থাকিয়াও তাহার প্রতি বিমুখ ছিলাম। ধীরে ধীরে কখন কেমন করিয়া যেন আমার গৃহটিকে সে অধিকার করিয়া বসিয়াছে এবং আমার অলক্ষ্যে নিরন্তর আমারই কল্যাণ কামনা করিতেছে। অন্তরালে থাকিয়া আমার যতটুকু পরিচয় লীলা পাইয়াছে, তাহাতেই এই জন্মবিরহিণী সন্তুষ্ট; সে যে এতদিন শুধু তাহার বাঞ্ছিতের আশায় ব্যর্থ জীবন যাপন করিতেছিল—এতদিনে কি তাহার প্রিয়তম আমারই মূর্ত্তি ধরিয়া তাহাকে উপহাস করিল! তাহার অদৃষ্টদেবতা তাহাকে উপহাস করিল কি না জানি না, কিন্তু আমার দেবতা আমার সঙ্গে নিদারুণ পরিহাস করিলেন; মনের কোণে কোণে দখিনা হাওয়া বহিতে শুরু করিলেও ত্রস্ত হইয়া উঠিলাম—ভাবিলাম, এ কি!

লীলা তাহার দৈনন্দিন কাজের অবকাশে আমার ঘরটিকে পরিপাটি করিয়া সাজাইয়া রাখিত। বিছানা টেবিল ঝাড়িয়া বই গুছাইয়া কিছুতেই যেন তাহার তৃপ্তি হইত না। সে আমার আর সরমার একসঙ্গে-তোলা ফোটোখানি প্রতিদিন নামাইয়া ঝাড়িয়া রাখিত। আমার কবিতার খাতা আর লেটার প্যাডের দিকে তার লোভ ছিল বেশি। সে কবিতার খাতা হইতে কবি-জনোচিত অজানা প্রেয়সীর উদ্দেশে কবিতাগুলি নকল করিয়া লইয়া বিনিদ্র রজনীর খোরাক সংগ্রহ করিত এবং সরমার চিঠিগুলি এমন লোলুপ আগ্রহে পাঠ করিত যে, দুই-একদিন তাহার সময় সম্বন্ধে জ্ঞান লুপ্ত হইয়াছে এবং সে ধরা পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গিয়াছে।

চিরবিরহিণীর ব্যর্থ জীবন এমনই করিয়া রূপে রসে ভরিয়া উঠিতেছিল; তাহার শুষ্ক মরুময় জীবন কখন অলক্ষ্যদেবতার কৃপা-বরিষণে শস্য-শ্যামলা হইয়া উঠিল—লীলা একদিন সহসা অনুভব করিল যে, জীবন সুখের, বাঁচিয়া থাকা ভগবানের অসীম অনুগ্রহ।

বাহিরে আমার আজকাল কোনও বন্ধন নাই, বন্ধু-বান্ধব সকলকে ছাড়িয়াছি; আমার বাড়ির আসরও আর জমে না। আমি কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছিলাম। পতঙ্গভুক গুল্মেরা যেমন আগে তাহাদের শিকারকে বেশ করিয়া লালাসিক্ত করিয়া পরে ধীরে ধীরে পরিপাক করে আমার এই আবাসভূমি আমাকে তেমনই সিক্ত করিয়া আনিতেছিল—আমি আপনার রচিত জালে আপনি জড়াইয়া পড়িতেছিলাম।

অত্যন্ত ব্যথিত কাতর হৃদয়ে অফিস যাইতাম আর তিনটা বাজিবার পর হইতেই বাড়ি ফিরিবার জন্য মন কেমন করিত, চঞ্চল হইয়া উঠিতাম। মাঝে মাঝে মনে হইত, এ কি দ্বিতীয় 'ক্ষুধিত পাষাণে'র অভিনয় নাকি! এখানকার বাড়ি পাষাণ না হইয়া না হয় চুনকাম করা ইষ্টকই হইল, কিন্তু এ যে দেখি আমাকে পাইয়া বসিয়াছে! আমার অদৃশ্যবর্তিনীরা বাদশাজাদী নন—বাঙালী ঘরের একটি মাত্র দুঃখিনী মেয়ে, কিন্তু হৃদয়ের

খেলার আকর্ষণা-বিকর্ষণে বাদশাজাদীদের চেয়ে যে কম যান তাহা তো মনে হয় না।

বাড়ির বাহির হইলেই আমি অহরহ কানের কাছে একটা দীর্ঘশ্বাস শুনিতে পাইতাম, বুকের কাছে কাহার যেন উত্তপ্ত নিশ্বাস অনুভব করিতাম। কে যেন অতি কাতর করুণ সুরে নিরন্তর বলিতে থাকিত, "ওগো, সময় যে বড় অল্প, তুমি কেন দূরে দূরে ফিরিতেছ, আমি যে পথ চাহিয়া আছি।" আমি সমস্ত কাজ ফেলিয়া প্রায় উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতাম। হাঁপাইতে হাঁপাইতে বাড়িতে আসিয়া চেয়ারটি লইয়া বসিয়া আকুল আগ্রহে কাহার যেন আগমন-প্রতীক্ষা করিতাম; বসিয়া বসিয়া যতদূর সম্ভব 'দরদ' দিয়া গাহিতাম—

ওগো সুদূর, ওগো মধুর,
পথ বলে দাও পরাণবঁধুর
সব আবরণ তোল তোল।

তখন 'পরাণ-বঁধু' অতি নিকটে স্তব্ধ হইয়া মনে মনে বলিত, ওগো এই তো আমি আছি। আমার অপরিচিতাকে উদ্দেশ করিয়া যখন গাহিতাম—

পথ বাকি আর নাই তো আমার চ'লে এলেম একা,
তোমার সাথে কই হ'ল গো দেখা—

অমনই দ্বারান্তরালবর্ত্তিনী হয়তো বলিয়া উঠিত, ওগো এখনও কি তোমার দেখা শেষ হয় নাই!

এমনই করিয়া ধীরে ধীরে অলক্ষ্য যখন লক্ষ্যের মধ্যে আসিতে লাগিল, পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়া অপরিচয়ের শেষ অন্তরালটুকু যখন প্রায় সরি সরি করিতেছিল, এমন সময় সহসা চমক ভাঙিল, ভাবিলাম, এ কি করিতেছি? এই লুকাচুরি, এই অলক্ষ্য আবেদন-নিবেদনের শেষ কোথায়? শৃঙ্খলবদ্ধ আমি; লীলাকে দিবার আমার কি আছে? আর এই যে ব্যবধান, ইহার

অবকাশে হয়তো স্বপ্ন বা কাব্য রচনা করিতে পারি, কিন্তু দূরত্ব যখন দূর হইয়া প্রাণের সঙ্গে প্রাণের পরিচয় ঘটিবে, তখন কি পঙ্কিলতার ধিক্কারে জীবন ধিক্কৃত হইবে না? এই যে সামান্য ব্যবধান ইহা ঘুচাইবার অধিকার তো আমার নাই। আমি দূর হইতে অন্তরালবর্ত্তিনীকে আমার প্রাণের একান্ত অনুরাগ জ্ঞাপন করিব, কিন্তু মুখামুখি আমার কথা তো ফুটিবে না।

আমি যেন কোনও আঘাত পাইয়া মূর্চ্ছাহত হইয়া পড়িয়াছিলাম—মূর্চ্ছাভঙ্গে আঘাতের বেদনায় পীড়িত হইতে লাগিলাম। নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়া থাকিয়া আর একটি ব্যথিত অসহায়া প্রাণীর অন্তরের গোপন বারতা পাইতেছিলাম। আমার সমস্ত দেহ-মন শিহরিয়া উঠিতেছিল। আমি তাহাকে উদ্দেশ করিয়া মনে মনে বলিলাম, ওগো আমি যে নিরুপায়, আমাকে যে যাইতেই হইবে। তোমার স্নেহ-বন্ধন আমাকে দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়াছে এবং এই বন্ধন অটুট রাখিবার জন্যই আমাকে দূরে যাইতে হইবে, তুমি এই অসহায়কে ক্ষমা করিও—

পরদিন সকালে বাড়ি ছাড়িবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলাম, লীলা কি কাজে যাইতেছিল, তাহার হাত হইতে ঝনঝন করিয়া একটা বাসন পড়িয়া গেল। আমি বুঝিতে পারিলাম—সে বজ্রাহতের মত বসিয়া আছে, সকলের খাওয়া হইল কি না সে দেখিল না, দিনের কাজে আজ আর সে কাহাকেও সাহায্য করিতে ছুটিল না। সে মনে মনে বিনাইয়া বিনাইয়া বলিতে লাগিল, ওগো কৃপণ, এতটুকু দিতেও তুমি কুণ্ঠিত হইতেছ! দিনান্তে শুধু তোমাকে একবার দেখিতাম, তাহাও কি তোমার সহিল না। ভীরু, আমি কি জানি না তুমি কেন যাইতেছে, এই দুর্ব্বল নারীর কাছ হইতে পলায়ন করা ছাড়া কি তোমার কোনও পথ ছিল না! ওগো, আমি তোমার কাছ হইতে দূরে দূরে থাকিব, আমার অস্তিত্বটুকু পর্য্যন্ত তুমি কোনদিন অনুভব করিতে পারিবে না, শুধু তুমি থাকিয়া যাও। হায় অসহায়া নারী!

প্রস্তুত হইতে লাগিলাম—বই গুছাইতে গুছাইতে আমার কবিতার খাতা হইতে একটি চিঠি মাটিতে পড়িল। দেখিলাম আমাকেই লেখা চিঠি—লীলা লিখিয়াছে। ভিতরে শুধু একটি লাইন লেখা—'ওগো, তুমি যেও না'—কোনও স্বাক্ষর নাই। জিনিস গোছানো, বাঁধা ছাঁদা আমার কাছে বিষবৎ মনে হইত লাগিল, কিন্তু তবু যাইতে হইবে। শঙ্কিত হস্তের তিনটি অক্ষরে হৃদয়ের যে ভাষা ওই অসহায়া আমাকে নিবেদন করিয়াছে, তাহা আমাকে কতখানিই না বলিল! জলস্থলে, আকাশে, বাতাসে আমি ওই করুণ আর্ত্তস্বর শুনিতে লাগিলাম,—ওগো, তুমি যেও না।

ধরণী নিরন্তর ব্যগ্রবাহু মেলিয়া মানুষকে ধরিয়া রাখিতে চায়—যুগে যুগে প্রণয়িণীজন তাহাদের প্রেমাস্পদকে ধরিয়া রাখিতে চাহিয়াছে শুধু ওই তিনটি কথা বলিয়া—'ওগো, তুমি যেও না।' কিন্তু কেহ কি ধরিয়া রাখিতে পারে? সব বন্ধন পিছনে পড়িয়া থাকে, ব্যর্থ নয়ন-সলিলে ভাসিয়া প্রেমিকা শূন্য হৃদয়ে চাহিয়া থাকে, যে যাইবার সে চলিয়া যায়।

আমাকেও যাইতে হইল।

আবার সোরগোল পড়িল। গাড়িবন্দী করিয়া জিনিসপত্র লইয়া অন্যত্র উঠিয়া গেলাম; অন্তরালবর্ত্তিনী লীলার বিমর্দ্দিত বুকে আর আমার ছিন্ন হৃদয়ের কোণে কি ঘটিল, সে ইতিহাস নাই বলিলাম।

আবার নূতন ভাড়াটে আসিল, লীলা একবারমাত্র তাহার শান্ত আয়ত চোখ দুইটি মেলিয়া দেখিল। তারপর—

* * *

আমার গল্প আরও কতদূর চলিত বলিতে পারি না, হঠাৎ সামনের খোলার বাড়িতে একটা হৈ-চৈ রব উঠাতে চমকিয়া উঠিলাম। দেখিলাম, রাত্রি বারোটা বাজিয়া গিয়াছে, অতি প্রত্যূষে বাড়ি ছাড়িতে হইবে বলিয়া স্বপ্ন ও বাস্তব ভুলিয়া ঘুমের চেষ্টা দেখিতে লাগিলাম।

রিক্‌শাওয়ালা

সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হইয়াছে। সকাল হইতেই থাকিয়া থাকিয়া ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি নামিয়া জনসঙ্কুল শহরের দৈনন্দিন কাজে ব্যাঘাত জন্মাইতেছিল। পথিকেরা আকাশের খামখেয়ালিপনায় বিরক্ত হইতেছিল; পথ চলিতে চলিতে বৃষ্টি নামে; কোন বাড়ির গাড়ি-বারান্দায় আশ্রয় লইয়া তাহারা কোন রকমে একটু মাথা বাঁচাইয়া লয়; বৃষ্টি ধরিয়া আসে। ভরসা করিয়া গাড়ি-বারান্দার আশ্রয় ছাড়িয়া তাহারা যেমনই একটু অগ্রসর হয় অমনই আবার এক পশলা বৃষ্টি শুরু হয়।

সমস্ত দিন মেঘ করিয়া ছিল; একটানা না হইলেও বৃষ্টির বিরাম ছিল না; তবুও কেমন একটা গুমোট গরমের ভাপসানিতে কলিকাতার সিক্ত-সন্ধ্যা থম থম করিতেছিল। এমন দিনে সাধারণত কেহ ঘরের বাহির হয় না। নেহাৎ প্রয়োজনে ছোট ভাই বিনোদকে সঙ্গে লইয়া স্ট্র্যাণ্ড রোড ধরিয়া কুমারটুলী অভিমুখে চলিতেছিলাম। তখন বৃষ্টি একটু ধরিয়া আসিয়াছে। শীকর-ভারাক্রান্ত বায়ুস্তর ভেদ করিয়া গঙ্গার ওপারের কারখানাগুলির আলো মাতালের চোখের মত ঘোলাটে দেখাইতেছিল; ল্যাম্প-পোস্ট ও টেলিগ্রাফ-পোস্টগুলির গায়ে কিংবা টেলিগ্রাফের তারে তারে সঞ্চিত জলের উপর গ্যাসের আলো পড়িয়া চকচক করিতেছে। পথে লোকজন বা যানবাহনাদির বিশেষ বালাই ছিল না; কচিৎ কদাচিৎ একআধখানা ট্যাক্‌সি কিংবা ছ্যাক্‌রা গাড়ি উর্দ্ধশ্বাসে কাদা ছিটাইয়া ছুটিতে-ছিল;—দূরে একখানা রিক্‌শা ঠুনঠুন ঘণ্টা বাজাইয়া মন্থর গতিতে চলিয়াছে; পিছনের আলোটি চোখের সম্মুখে একটি লাল রেখা টানিয়া দিতেছে।

বৃষ্টির ভয়ে দ্রুত চলিতে লাগিলাম। নিমতলা পার হইতেই বেশ

সমারোহসহকারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল ; একটি গাছতলা আশ্রয় করিয়া কোন রকমে মাথা রক্ষা করিতেছি, দেখি, সেই রিক্‌শাওয়ালা বিশেষ শ্রান্তভাবে সেখানে উপস্থিত হইয়া হাঁপাইতে লাগিল। রিক্‌শাখানা খালি। রিক্‌শা-ওয়ালা সম্ভবত বহুদূরের সোওয়ারী লইয়া তাহাকে গন্তব্য স্থলে পৌছাইয়া ফিরিতেছে।

বৃষ্টি থামিবার গতিক দেখিলাম না। তবু ভাল ; একখানা রিক্‌শা পাওয়া গেল। এই সামান্য পথটুকু—কয় পয়সাই বা দিতে হইবে! পরিশ্রান্ত রিক্‌শাওয়ালা ততক্ষণে মুখ মাথা মুছিয়া সুস্থ হইয়াছে। কষাকষি করিয়া দুই আনা ভাড়া স্থির হইল। বিনুকে উঠাইয়া দিয়া নিজে উঠিতে যাইতেছি, রিক্‌শাওয়ালা বলিল, হুজুর, দুজনকে পারব না।

বলিলাম, সে কি রে, এই রোগা রোগা দুজন লোক, আর কতটুকুই বা রাস্তা!

আজ্ঞে না, হুজুর, পারব না।

একটু আশ্চর্য্য হইলেও চটিয়া গেলাম। বলিলাম, দুনিয়া শুদ্ধ লোক দুজন তিনজন লোক নেয়। তুই ব্যাটা নিবি না কেন? অমন ষাঁড়ের মত শরীর তোর—

শকেগা নেহি বাবু, বলিয়া সে সেই বৃষ্টির মধ্যেই বৃক্ষতল ছাড়িয়া গাড়ি লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। অমন শক্ত-সমর্থ লোকের ব্যাকুলতাপূর্ণ 'শকেগা নেহি' শুনিয়া মনটা নরম হইল। তাহার দৃষ্টিতে এমন একটা অদ্ভুত শঙ্কা ও কাতরতা মাখানো ছিল যে, আমার মন অস্বস্তিতে ভরিয়া গেল।

বৃষ্টি আর গাছের পাতার আচ্ছাদন মানিল না। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভিজিতে লাগিলাম। রিক্‌শাওয়ালা তখন কিছুদূর চলিয়া গিয়াছে। হাঁকিয়া বলিলাম, দশ পয়সা দিব। সে একবার মুখ ফিরাইয়া দেখিল এবং পরমুহূর্তেই গাড়ি লইয়া দৌড়াইতে শুরু করিল।

বহুদূর হইতে রিক্‌শাখানার ঠুনঠুন আওয়াজ কানে আসিতে লাগিল; পিছনের লাল আলোটি তখনও বর্ষাস্নাত অন্ধকার পথে একটি গতিশীল সিঁদুর টিপের মত দেখাইতেছিল।

সিক্তদেহে পথে নামিয়া পড়িলাম। সেদিন শ্রাবণ-নিশীথিনীর গাঢ় তমিস্রা ভেদ করিয়া একটি কঠোর মুখের মলিন বেদনাকাতর দৃষ্টি আমার মনে ঘুরিয়া ফিরিয়া জাগিতে লাগিল।

কিছুদিন পরের কথা। এল্‌ফিন্‌স্টোন পিক্‌চার প্যালেসে ছবি দেখিয়া একটি পরিচিত লোকের অপেক্ষায় হগ সাহেবের বাজারের কোণে দাঁড়াইয়া ছিলাম। হঠাৎ এক রিক্‌শাওয়ালার সহিত দুই বিপুলকায় মাড়োয়ারীর বিশুদ্ধ হিন্দিতে বচসা হইতেছে শুনিতে পাইলাম। মাড়োয়ারীযুগলের গলা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া ব্যাপার কি জানিবার জন্য একটু ঔৎসুক্য হইল। কাছে গিয়াই দেখি, স্ট্র্যাণ্ড রোডের সেই রিক্‌শাওয়ালা। বচসার কারণ—সে দুইজনকে লইতে পারিবে না। ওই দুইটি বিপুলকায় বস্তাকে একসঙ্গে গাড়িতে উঠিতে দিতে যে কোনও রিক্‌শাওয়ালার আপত্তি হইতে পারিত এবং তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার বিশেষ কিছু ছিল না। কিন্তু পূর্ব্বের কথা স্মরণ করিয়া আমি বিস্মিত হইলাম, সেই লোক তাহাতে সন্দেহ নাই। মাড়োয়ারী দুইজন অন্য যানের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিল। রিক্‌শাওয়ালাকে পরীক্ষা করিবার কৌতূহল হইল। তাহার সহিত ভাড়া স্থির করিয়া তাহাকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া বলিলাম, আমার আর একজন সঙ্গী আছে। করুণ ভাবে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সে আমাকে অন্য গাড়ি দেখিতে অনুরোধ করিল—দুইজনকে সে লইতে পারিবে না। আমি এতদূর বিস্মিত ও কৌতূহলাক্রান্ত হইলাম যে, বন্ধুর অপেক্ষা না করিয়াই রিক্‌শাতে চড়িয়া বসিলাম।

সেদিনও আকাশ ব্যাপিয়া মেঘ করিয়া আসিতেছিল; ঘন ঘন মেঘ-গর্জ্জন ও বিদ্যুৎচমকে কলিকাতার চঞ্চল আকাশ স্তব্ধ হইয়া আসিয়াছিল। আসন্ন দুর্য্যোগের আশঙ্কায় রাস্তায় লোক-চলাচল অনেকটা কম। রিক্‌শা-ওয়ালাকে তাড়া দিলাম, অবিলম্বে বৃষ্টি নামিবে, শীঘ্র বাড়ি পৌঁছানো চাই। জোরে টানিতে গিয়া রিক্‌শাওয়ালা গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠিল; অবাক হইলাম। আমার মত ক্ষীণকায় পুরুষকে টানিতে এতটা পরিশ্রম হইবার কথা নয়। আগের দিনের মত একটা অজানা অস্বস্তিকর অনুভূতি মনে জাগিতে লাগিল। অমন বিপুলকায় একটা লোক আমার মত একটি সামান্য বোঝাকে টানিতে পারিতেছে না, ইহার কোনও সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাইলাম না; একটা অস্পষ্ট অলৌকিক ভয় মনকে পীড়া দিতে লাগিল।

বেচারার দুরবস্থা দেখিয়া মায়া হইল; শুধু বোঝা টানার পরিশ্রম ছাড়াও অন্য কোনও যন্ত্রণা তাহার হইতেছিল, তাহারও আভাস পাইতে-ছিলাম। নানা কল্পনা করিয়া কোনও কিনারা করিতে পারিলাম না। তাহাকে যথেচ্ছ রিক্‌শা টানিতে বলিয়া একটা সিগারেট ধরাইলাম। কৌতূহল নিবৃত্তি করিবার যথেষ্ট ঔৎসুক্য হওয়া সত্ত্বেও চুপ করিয়া কি ভাবে কথাটা পাড়িব ভাবিতে লাগিলাম।

হঠাৎ চড়বড় করিয়া বৃষ্টি নামিল। রিক্‌শাওয়ালা চকিত হইয়া উঠিল। একটা বাড়ির গাড়িবারান্দার ধারে আসিয়া তাহাকে থামিতে বলিলাম। দু'জনে গাড়ীবারান্দার নীচে আসিয়া মাথা মুছিয়া বৃষ্টি থামিবার অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

রিক্‌শাওয়ালাকে একটা সিগারেট দিলাম। সে বিনীত সেলাম করিয়া সিগারেট লইয়া ফুটপাথের উপর উবু হইয়া বসিয়া সিগারেট ধরাইল। আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমার মনের অদম্য কৌতূহল আমাকে ভিতর হইতে ঠেলা দিতে লাগিল, কিন্তু পাছে বেফাঁস কিছু জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলি—এই ভয় হইতে লাগিল। তাহার নাম কি, কোথায় থাকে, তাহার

কে আছে, এগুলি বেশ সহজ ভাবেই জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম। তাহার নাম মকবুল, হাতীবাগানের বস্তীতে থাকে, এক বৃদ্ধা ফুফু ছাড়া তাহার কেহ নাই; শিশু অবস্থা হইতেই সে পিতৃমাতৃহীন—ফুফুর হাতেই সে মানুষ হইয়াছে। বিবাহ হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করাতে সে গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, বাবু, যে বোঝা তাহাকে নিরন্তর টানিয়া বেড়াইতে হইতেছে, তাহা লইয়াই সে অস্থির—ইহার উপর জরুর বোঝা বহিতে সে অক্ষম। বলিলাম, বুড়ী ফুফু ছাড়া তাহার কেহ নাই, অথচ অহরহ বোঝা বহিতে হইতেছে, ইহার অর্থ তো বুঝিলাম না। মকবুল চুপ করিয়া রহিল। আমি তাহাকে চিন্তা করিবার অবসর না দিবার জন্য বলিলাম, একটা বিষয়ে আমার ভারী কৌতূহল আছে। কিছুকাল আগে নিমতলাঘাটের কাছে তাহাকে দেখিয়াছিলাম—আজও দেখিলাম; দুই দিনই সে একজনের অধিক সোওয়ারী লইতে অস্বীকার করিয়াছে অথচ সে দুর্ব্বল নয়। ইহার নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে। যদি বিশেষ আপত্তি না থাকে তাহা হইলে—

মকবুল চমকিয়া উঠিল। তাহার মুখ অস্বাভাবিক রকম বিবর্ণ হইয়া গেল। হাত দিয়া মাথার রগ টিপিতে টিপিতে সে বলিল, বাবু সে বড় ভয়ানক কথা। যে কথা মনে হইলেই সে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে, তাহার বুকের তাজা রক্ত হিম হইয়া যায়, মুখে সে-কথা সে প্রকাশ করিবে কেমন করিয়া?

বলিতে বলিতে সে সভয়ে রিক্‌শাখানির দিকে চাহিল। কি যেন একটা ভয়াবহ কিছু দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। পরক্ষণেই সে উন্মত্তের মত ছুটিয়া গিয়া তেরপলের পরদা দিয়া রিক্‌শাখানি মুড়িয়া ফেলিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া হতাশভাবে বসিয়া পড়িল। তখনও ঝমঝম করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ-ঝলকে কি যেন একটা অনন্ত রহস্যের ক্ষণিক আভাস মাত্র পাইতেছিলাম; জলভারাক্রান্ত বাতাস কলিকাতার

পাষাণ-প্রাচীরে প্রতিহত একটা একটানা উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করিতেছিল। রাস্তায় জনমানবের চিহ্ন ছিল না।

তাহাকে আর একটা সিগারেট দিয়া আমি তাহার কাছ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইলাম। কি যেন একটা অজানা ভয়ে আমার মনও পীড়িত হইতে লাগিল। ব্যাপারটা আগাগোড়া এমন অস্বাভাবিক—মাঝে মাঝে সমস্তটা স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দিতেছিলাম; কিন্তু সম্মুখে উপবিষ্ট রিক্‌শাওয়ালার অস্বাভাবিক-দীপ্তি-সম্পন্ন চোখ দুইটি আমার মনে এক অলৌকিক ভয় জাগাইতেছিল—আমি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম।

কিন্তু এভাবে বসিয়া থাকা চলে না, বাড়ি যাইতে হইবে। এ ব্যাপারটা সম্বন্ধে বিস্তারিত না জানিয়াও যাওয়া যায় না। বলিলাম, মকবুল, এসব কথা ভাবিতে যদি তোমার বিশেষ কষ্ট হয় কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই—বৃষ্টি অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে; এখন যাওয়া যাইতে পারে।

সজোরে আমার পা দুইটি চাপিয়া ধরিয়া অধীরভাবে সে বলিয়া উঠিল, আর একটু দাঁড়ান বাবু। যে-কথা তিন বছর ধরিয়া বলিবার জন্য আমি ব্যাকুল, অথচ কাহাকেও মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিলাম না, আজ আমাকে বলিতে দিন; এ যন্ত্রণা আর সহিতে পারিতেছি না।

নিবিড় সহানুভূতিতে চিত্ত ভরিয়া গেল। ভুলিয়া গেলাম, আমি মকবুল অপেক্ষা সামাজিক হিসাবে শ্রেষ্ঠ লোক; তাহার সহিত এভাবে কলিকাতার রাস্তার ফুটপাথে দাঁড়াইয়া আলাপ করা আমার পক্ষে হীনতা-সূচক। সেই ব্যথাক্লিষ্ট মানুষটির গোপন কথা শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম।

মকবুল অতি ধীরে ধীরে থামিয়া থামিয়া হিন্দিমিশ্রিত বাঙলায় যাহা বলিল এবং যাহা বলিল না—সবটুকু মিলিয়া যাহা বুঝিলাম, তাহাই ভাষায় লিপিবদ্ধ করিতেছি। মকবুল বলিল—বাবু, আমি আপনাকে ব্যাপারটা

ঠিক বুঝাইতে পারিব কি না জানি না। ঘটনাটা এমন অসম্ভব আর এমনই ভয়াবহ যে, বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু খোদার কসম বাবু, আমি একটিও মিথ্যা বলিব না। আমি আজ তিন বৎসর ধরিয়া এই গাড়িতে এক মৃতদেহের বোঝা টানিয়া বেড়াইতেছি। একজনের অধিক লোককে গাড়িতে উঠিতে দিতে পারিব কেমন করিয়া? আর একজন যে নিরন্তর আমার গাড়িতে বসিয়া আছে! তাহার নড়িবার শক্তি নাই। আমি তাহাকে বহন করিয়া লইয়া ফিরিতেছি। ইহার হাত হইতে আমার নিস্তার নাই। মৃতদেহ পচিয়া ভারী হইয়া গিয়াছে; আমি অহরহ দুর্গন্ধে অস্থির হইতেছি। মৃতদেহের ভার টানিয়া টানিয়া আমার সবল দেহ জীর্ণ হইয়া আসিল—এই অদৃশ্য শবদেহের ভারে আমি জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছি, আমি আর বাঁচিব না বাবু।

মনে হইল, উপকথা শুনিতেছি; মনে হইল, কলিকাতার আবেষ্টনী ধোঁয়া হইয়া কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে। এক জনশূন্য মরুভূমির মাঝে আমরা দুইজনে পড়িয়া আছি। এক অদ্ভুত অনুভূতিতে আমার সমস্ত চেতনা বিলুপ্তপ্রায় হইল। আমি স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলাম—

তিন বছর আগেকার কথা। সেদিন প্রবল বর্ষণে কলিকাতা শহর ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছিল। রাত্রি নয়টা দশটার সময় আমি এই গাড়িখানা লইয়া হাওড়া স্টেশনে সোওয়ারীর প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। সেখানে দুই-চার খান মাত্র গাড়ি ছিল; লোকের ভিড় ছিল না বলিলেই হয়; অমন দিনে সাধারণত কুকুর-বিড়ালেরাও বাড়ির বাহির হয় না; কিন্তু অভাব যাহাদিগকে পীড়া দেয়; তাহারা কুকুর-বিড়ালেরও অধম। আমি বিবাহ করিবার লোভে অর্থ সঞ্চয় করিতেছিলাম। বহিঃপ্রকৃতির সহস্র বাধাও আমার সঙ্গিনীপিয়াসী মনকে দমাইতে পারে নাই। বিবাহ করিবার কি অদম্য স্পৃহা আমার ছিল বাবু, তাহা আপনাকে বুঝাইতে পারিব না—নহিলে অমন দিনে মানুষে বাহির হয় না। আজ বিবাহ করিবার বিন্দুমাত্র

প্রবৃত্তি আমার নাই ; প্রতি মুহূর্ত্তেই আমার শরীরের রক্ত জল হইয়া আসিতেছে ; আমি আর বেশিদিন বাঁচিলে পাগল হইয়া যাইব। শুধু ফুক্কুর মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছি ; সে আমার এই অবস্থার কথা জানিতে পারিলে কষ্ট পাইবে।

মকবুল আবার চুপ করিল। যাহা শুনিতেছিলাম, তাহার পরিষ্কার ধারণা করিবার মত শক্তি আমার ছিল না। জলের ঝাপটা লাগিয়া সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গেল ; অন্ধকার আকাশে তীব্র বিদ্যুৎস্ফুরণ হইতে লাগিল।—কলিকাতার ঘরবাড়ি লেপিয়া মুছিয়া গিয়াছে ; আকাশের নীচে গ্যাসের স্তিমিত আলোকে আমরা দুইটি প্রাণী এক অজানিত রহস্যলোকের দ্বার উন্মোচন করিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিতেছি।—

—সোওয়ারী জুটিল দুইজন। প্রচুর ভাড়া চাহিলাম, তাহারা তাহাতেই স্বীকৃত হইল। দুইজনের কেহই প্রকৃতিস্থ ছিল না ;—একজন নেশায় একেবারে চুর হইয়া ছিল, অন্য জনের তখনও হুঁশ ছিল। এই ঝমঝম বৃষ্টির মাঝে বাগবাজার পর্য্যন্ত যাইতে হইবে।

সোওয়ারী দুইজন ভিতরে বসিল। আমি ভাল করিয়া পরদা মুড়িয়া দিলাম।

গঙ্গার ধারে ধারে সোজা উত্তর দিকে চলিতে লাগিলাম ; দোকানপাট সব বন্ধ হইয়া গিয়াছে। একটা পানের দোকানে এক উড়িয়া বামুন স্বর করিয়া কি পড়িতেছিল, রাস্তায় এখানে-ওখানে দুই-একজন লোক চলিতেছিল ; গাড়িঘোড়া একেবারেই ছিল না। আমি নির্ব্বিঘ্নে পথের মাঝখান দিয়া রিক্শা টানিয়া লইয়া চলিলাম। কুমারটুলীর কাছাকাছি গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আর কতদূর যাইতে হইবে। উত্তর পাইলাম, সিধা চালাও।

আমার সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছিল। পরিশ্রমে আর ক্লান্তিতে ঘুমে চোখ জড়াইয়া আসিতেছিল। মনে হইতেছিল, আর টানিতে পারিব

না। এমন সময়ে পরদা ঠেলিয়া এক বাবু আমার হাতে পয়সা দিয়া এক বাক্স সিগারেট আনিতে বলিলেন। এক গাছতলায় গাড়ি রাখিয়া সিগারেট আনিতে গেলাম। কাছাকাছি দোকান ছিল না। এদিক-ওদিক ঘুরিয়া একটি বিড়ির দোকানের সন্ধান পাইলাম। সিগারেট কিনিয়া ফিরিয়া আসিয়া হাঁকিয়া বাবুদের সিগারেটের বাক্সটা লইতে বলিলাম। কেহ উত্তর দিল না। ভাবিলাম, মাতাল বাবুরা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তেরপলের পরদা তুলিয়া সিগারেট দিতে গিয়া এক ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়া মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলাম। বাবু, সেই মুহূর্ত্ত হইতে আমার জীবনের সমস্ত শান্তি অন্তর্হিত হইয়াছে; কাহার পাপের বোঝা মাথায় লইয়া আমি আজ তিন বৎসর কাল প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ফিরিতেছি জানি না; আর কতকাল এ যন্ত্রণা সহিতে হইবে খোদাতাল্লাই বলিতে পারেন!

সামান্য আলো আসিতেছিল; দূরে গ্যাস-পোস্ট। গাছের তলে বেশ একটু অন্ধকার; বৃষ্টির বিরাম ছিল না। পরদা তুলিয়া সেই অস্পষ্ট আলোকে দেখিলাম, গাড়িতে একজন মাত্র লোক—মুখ বাঁধা, বুক দিয়া দরদর ধারে রক্ত পড়িতেছে, সর্ব্বাঙ্গ রক্তে ভিজিয়া গিয়াছে। প্রাণ আছে বলিয়া মনে হইল না; কেমন করিয়া কি হইল প্রথমটা কিছু ঠাহর করিতে পারিলাম না; বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিলাম। ধীরে ধীরে চেতনা ফিরিয়া আসিল; মনে বিষম ভয় হইতে লাগিল; চোখের সম্মুখে ফাঁসিকাষ্ঠের ভয়াবহ দৃশ্য ফুটিয়া উঠিল। সমস্ত দোষটা আমার ঘাড়ে যে চাপিবে তাহাতে সন্দেহ নাই, আমার কথা কে বিশ্বাস করিবে?

বুঝিলাম, অন্য লোকটি মুখ বাঁধিয়া ছোরার আঘাতে এই লোকটিকে হত্যা করিয়া পলাইয়াছে। তাহাকে ধরিবার কোনও উপায় নাই; তাহার চেহারাটাও মনে আসিল না।

লোকটা নিশ্চয়ই মরিয়া গিয়াছে; গায়ে হাত দিয়া দেখিলাম, তখনও গরম। ভাবিলাম, কোনও হাসপাতালে লইয়া যাই, চীৎকার করিয়া

লোক জড় করি, কিন্তু সাহস হইল না। তাজা খুন দেখিয়া ভয়ে আমি তখন হিতাহিতজ্ঞানশূন্য—আত্মরক্ষা করার কথাটাই আমার প্রথমে মনে হইল, সভয়ে চারিদিকে চাহিয়া মৃত বা মরণাপন্ন দেহটি সেই বৃক্ষতলে ফেলিয়া রাখিয়া গাড়ি লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলাম।

কেমন করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম, কেমন করিয়া সেই রাত্রিতেই গাড়িখানি ধুইয়া মুছিয়া আস্তাবলে রাখিলাম, আমার কিছুই স্মরণ নাই। তারপরে সাত আট দিন ধরিয়া আমি দারুণ জ্বরে বেহুঁশ হইয়া পড়িয়াছিলাম। ফুফুর মুখে শুনিয়াছি, সে কয় দিন আমি খুন রক্ত ফাঁসি ইত্যাদি নানা ভুল বকিয়াছিলাম।

সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবার পরও গাড়ি লইয়া বাহির হইতে সাহস হইতেছিল না; গাড়িখানির দিকে নজর দিতেও ভরসা পাইতেছিলাম না। কিন্তু পেট তো চালাইতে হইবে। আবার একদিন সকালে মনের সহিত অনেক যুদ্ধ করিয়া গাড়িখানি বাহির করিতে গেলাম। গাড়িতে হাত দেওয়ামাত্র মনটা ছাঁত করিয়া উঠিল। রক্তের চিহ্নমাত্র ছিল না, তবু যেন রক্ত দেখিতে পাইলাম। মনের দুর্ব্বলতা জোর করিয়া উড়াইয়া দিয়া গাড়ি লইয়া বাহির হইলাম। সোয়ারী জুটিল। মাঝে মাঝে গা ছমছম করিতেছিল বটে, কিন্তু দিনের আলোয় লোকের ভিড়ে সে ভাব বেশিক্ষণ মনে থাকিতে পায় নাই। থাকিয়া থাকিয়া মনে হইতেছিল, অন্যায় করিয়াছি—হয়তো লোকটা বাঁচিতে পারিত। বিপদের ভয় না করিয়া যদি তৎক্ষণাৎ কোনও হাসপাতালে তাহাকে লইয়া যাইতাম হয়তো সে বাঁচিয়া উঠিত। লোকটা যদি মরিয়াই থাকে, নিজেকে তাহার মৃত্যুর কারণ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সে ভাবটাও কাটাইয়া উঠিলাম। কে জানে পরের দিকে নজর দিতে গিয়া হয়তো মহা ফ্যাসাদে পড়িয়া যাইতাম! বাঁচিবার নসীব থাকিলে সে এমনই বাঁচিবে। এইভাবে নানা মানসিক দ্বন্দ্বে প্রথম দিনটা কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার আগেই বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।

সমস্ত রাত্রি কেমন যেন একটা অশান্তিতে কাটিল ; ঘুমাইতে পারিলাম না। ভয় হইল, আবার বুঝি জ্বর হইবে। সেই রক্তাক্ত দেহ মুখ-বাঁধা লোকটিকে যেন চারিদিকে দেখিতে লাগিলাম। মাথা গরম হইয়াছে ভাবিয়া চোখে মুখে জল দিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিলাম, ঘুমও আসিল। কিন্তু ভোরবেলায় আবার তাহার স্বপ্ন দেখিয়া ভীষণ ভয়ে ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে যেন গুমরিয়া গুমরিয়া আমার কানে কানে বলিয়া গেল—তুই আমাকে খুন করিয়াছিস! আমি আল্লা নাম স্মরণ করিয়া উঠিয়া বসিলাম।

সেদিন গাড়ি লইয়া বাহির হইতে যাইব—মনে হইল কে যেন আমার পাছু লইয়াছে, পিছনের পথের উপর যেন রক্তের দাগ দেখিলাম। হায় আল্লা! এ কি হইল! কাহার পাপের বোঝা কাহার ঘাড়ে চাপাইলে তুমি! আমি যেখানে যাই, সেখানেই যেন কোনও অদৃশ্য কেহ আমার পাছু লইতে লাগিল। ভাবিলাম, আমি কি পাগল হইয়া গেলাম!

বুঝিলাম, আমাকে ভূতে পাইয়াছে। ওঝার কাছে গেলাম ; সে অনেক ঝাড়ফুঁক করিল ; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না ; সে আমার পাছু ছাড়িল না।

মকবুল চুপ করিয়া গামছা দিয়া কপালের ঘাম মুছিল। আমার কাছে একটা সিগারেট লইয়া সেটা ধরাইয়া আবার বলিতে লাগিল—

দুই-একদিন পরে সন্ধ্যার সময় হেদুয়ার মোড়ে দাঁড়াইয়া ছিলাম, এমন সময়ে বৃষ্টি নামিল। বৃষ্টি হইতে বাঁচাইবার জন্য গাড়িখানা তেরপল-মুড়ি দিতে যাইতেছি, দেখি পিছনে পিছনে কে যেন আসিতেছে! ফিরিয়া তাকাইলাম, কেহ নাই। তাড়াতাড়ি গাড়িখানা ঢাকিয়া বাড়ি ফিরিবার ইচ্ছা হইল। গাড়ির ছপ্পর হইতে পরদাখানা ফেলিতে যাইব, দেখি গাড়ির ভিতরে সে বসিয়া—মুখ বাঁধা, বুক দিয়া রক্ত গড়াইতেছে! ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়া পরদা ফেলিয়া দিয়া মূর্চ্ছিতের মত সেখানে বসিয়া পড়িলাম।

আমার এই অদ্ভুত যন্ত্রণার কথা আপনাকে কেমন করিয়া জানাইব বাবু? আপনি কি বুঝিতে পারিবেন? গাড়ির ভিতর রক্তাক্তকলেবরে সে নিশ্চয়ই বসিয়া আছে। সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত সে ওই গাড়িতে বসিয়া আছে; আমার পিছনে আর তাহাকে দেখি না—সে নিশ্চিন্ত হইয়া গাড়িতে বসিয়া থাকে, আমি তাহাকে টানিয়া লইয়া বেড়াই।

মকবুল চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া রহিল। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিতে লাগিল—

বাবু, সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত ওই মড়ার বোঝা আমি টানিয়া ফিরিতেছি। একজনের অধিক সোয়ারী তাই আর টানিতে পারি না। মড়া পচিয়া দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে; আমাকে তাহাই সঙ্গে করিয়া ফিরিতে হইতেছে; অথচ আল্লার দোহাই বাবু, ওই লোকটার মৃত্যুতে জ্ঞানত আমার কোনও অপরাধ নাই।

আমি ওই নিরক্ষর লোকটিকে কি সান্ত্বনা দিব! চুপ করিয়া রহিলাম।

—বাবু, বোঝা সব সময়েই বহিতে হয়, কিন্তু বর্ষারাত্রি ছাড়া অন্য সময়ে ওই মৃতদেহ আমি দেখিতে পাই না। দেখিয়া দেখিয়া বোঝা টানিয়া টানিয়া অনেকটা সহিয়া গিয়াছে, কিন্তু আজিও মাঝে মাঝে ভয় পাইয়া উঠি। ভিতরে ভিতরে আমার শরীর জীর্ণ হইয়া আসিয়াছে; এই দুর্বিষহ যন্ত্রণা আমি আর বেশিদিন সহ্য করিতে পারিব না।

এই গাড়িখানি ছাড়িয়া দিবার সামর্থ্য আমার নাই, বাবু—এক অদৃশ্য-শক্তি আমাকে ইহার সহিত জুড়িয়া দিয়াছে; আমি তাহার কাছে সম্পূর্ণ শক্তিহীন। আজ তিন বৎসর ধরিয়া আমার এই ভীষণ কর্ত্তব্য আরম্ভ হইয়াছে; কবে শেষ হইবে এক খোদাতালাই বলিতে পারেন!

মকবুল উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, বৃষ্টি ধরিয়া আসিয়াছে বাবু, আপনি গাড়িতে বসুন। আমি পরদিন তাহাকে আমার সহিত দেখা করিতে বলিব কি না ভাবিতে ভাবিতে গাড়ির নিকট গেলাম। মকবুল মুখ

ফিরাইয়া কম্পিত হস্তে পরদাখানি তুলিয়া ধরিল। আমি ভিতরে বসিতেই সে পরদাখানি ফেলিয়া দিয়া গাড়ি টানিতে শুরু করিল।

পরদা-ফেলা অন্ধকার রিক্‌শাখানির ভিতর বসিতেই আমার গা ছমছম করিতে লাগিল; আমিও যেন আমার অত্যন্ত গা ঘেঁষিয়া এক অদৃশ্য রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখিতে পাইলাম; একটা পচা দুর্গন্ধও নাকে আসিতে লাগিল। সভয়ে পরদা তুলিয়া ফেলিয়া মকবুলকে রিক্‌শা থামাইতে বলিয়া বলিলাম, আমার বাড়ি বেশি দূর নয়, আমি হাঁটিয়াই যাইতে পারিব। রিক্‌শাখানির ভিতরে চাহিবার আর সাহস হইল না।

মকবুল বুঝিল। একটু শীর্ণ হাসি হাসিয়া গাড়িখানি তুলিয়া ধরিয়া মন্থর গতিতে চলিতে লাগিল। আমি সেখানে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। রিক্‌শাখানির দিকে চাহিবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত আমার হইল না। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত রিক্‌শাখানির ঠুনঠুন আওয়াজ কানে আসিতে লাগিল। সে-রাত্রে ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারিলাম না।

ভবিতব্য

শহরটির ঠিক নাম করিব না। ধরা যাক, ময়নাপুর—কলিকাতা হইতে দূরে মফস্বলের একটি শহর। ময়নাপুর-বালিকা-বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষয়িত্রীর পদ যখন খালি হয়, তখন বিদ্যালয়ের সেক্রেটারি হরিপদবাবু শিক্ষয়িত্রীর সন্ধানে কলিকাতা আসিয়া মহা ফাঁপরে পড়িলেন। তিনি আজীবন মফস্বলবাসী, বয়োবৃদ্ধ, ওকালতিতে মফস্বলের পক্ষে যথেষ্ট পসার জমাইয়াছিলেন, এবং কোর্ট ও বাড়ি ছাড়া বাহিরের জগতের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল না। স্থানীয় লোকেরা তাঁহার প্রতি নিছক শ্রদ্ধাবশত তাঁহার যোগ্যতা-অযোগ্যতা বিচার না করিয়াই তাঁহাকে ধরিয়া বাঁধিয়া সেক্রেটারি করিয়া দেয়। তিনি এতদিন যাবৎ এই পদ লইয়া কোন বিপদে পড়েন নাই, তাঁহার পুত্রোপম বন্ধু জুনিয়ার উকিল গৌরাঙ্গবাবুই এতকাল তাঁহার হইয়া সেক্রেটারিশিপের ঝক্কি পোহাইয়া আসিতেছিলেন। তিনি নামে মাত্র সেক্রেটারি ছিলেন। তাঁহার দুর্ভাগ্যক্রমে গৌরাঙ্গবাবু এই বৎসরের গোড়াতেই মারা গিয়াছেন। বৃদ্ধ হরিপদবাবু প্রায় পুত্রশোক পাইয়াছেন। তিনি অন্য কাহাকেও তাঁহার জুনিয়ার করিবার উপযুক্ত মনে করেন নাই। কলিকাতার প্রায় সকল সংবাদপত্রেই পক্ষাধিককাল বিজ্ঞাপন দেওয়া সত্ত্বেও, কি জানি কেন, এখন পর্য্যন্ত একটিও দরখাস্ত পত্র দাখিল হয় নাই। সম্ভবত বিজ্ঞাপন কাহারও নজরে পড়ে নাই কিংবা অজ-মফস্বল বলিয়া কেহ সেখানে যাইতে হয়ত রাজী নয়। কিন্তু এ ভাবে একজন শিক্ষয়িত্রীর অভাব লইয়া স্কুল চালানো দুরূহ। সুতরাং বৃদ্ধ হরিপদবাবু দুর্গা নাম স্মরণ করিয়া মাতৃহারা একমাত্র কন্যা হৈমবতীকে সঙ্গে লইয়া শিক্ষয়িত্রীর খোঁজে কলিকাতা আসিলেন। হৈমর দূরসম্পর্কের মাতুল প্রাণধনবাবুর বাসাতেই আশ্রয় লইলেন।

হৈম যখন পাঁচ বৎসরের শিশু, তখনই হরিপদবাবুর স্ত্রীবিয়োগ ঘটে। জীবনে চার-পাঁচটি পুত্রকন্যা হারাইয়া হরিপদবাবু অনেকখানি ঘাতসহ হইয়াছিলেন, তবুও প্রৌঢ়বয়সে অনুগত জীবনসঙ্গিনীকে হারাইয়া তিনি কল্পনাতীত দুঃখ পাইলেন। নিজের ওকালতির যথেষ্ট পসার সত্ত্বেও, তিনি সযত্নে মাতৃহারা কন্যাকে মানুষ করিয়া এত বড়টি করিয়া তুলিয়াছেন। মাতৃবিয়োগের দুঃখ হৈমবতীকে বেশি সহিতে হয় নাই। হরিপদবাবু একাধারে তাহার মা ও বাবা দুইই ছিলেন। হৈমর বয়স এখন ষোলো হইবে। হৈম স্থানীয় বালিকা-বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করিয়াছে। হরিপদ-বাবুর ইচ্ছা ছিল, সে কলিকাতা গিয়া কলেজে পড়িবে; কিন্তু বৃদ্ধ পিতাকে অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া যাইতে হৈম রাজী হয় নাই। হরিপদবাবু তাই ভাবিয়াছিলেন—আর দুই-এক বৎসরের মধ্যে হীন ওকালতি-বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া যে প্রভূত অর্থ এতদিন ধরিয়া জমাইয়াছেন, তাহা লইয়া কলিকাতায় একটি বাড়ি খরিদ করিয়া কলিকাতায় বসবাস করিবেন; হৈমর তখন কলেজে শিক্ষার কোন বাধা থাকিবে না, তাহা ছাড়া কলিকাতায় থাকিলে মনোমত পাত্রে তাহাকে সম্প্রদান করিবার সুবিধাও হইবে।

কলিকাতায় আসিয়া বৃদ্ধ প্রথমটা কিছুই সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। এদিক ওদিক নিজে চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য না হইয়া তিনি শ্যালক প্রাণধনবাবুর শরণাপন্ন হইলেন। প্রাণধনবাবুকে এ সম্বন্ধে কিছু করিতে তিনি প্রথমত অনুরোধ করেন নাই। আজীবন-কলিকাতাপ্রবাসী প্রাণধনবাবু হয়তো সহজেই তাঁহাকে একটি শিক্ষয়িত্রী যোগাড় করিয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু হরিপদবাবু বহুবার নানা লোকমুখে প্রাণধন-বাবুর বিরুদ্ধে নানা ধরনের নিন্দা শুনিয়াছেন। তিনি বিবাহ করেন নাই। অথচ তাঁহার গৃহে লোকে নানা ধরনের স্ত্রীলোকের গতায়াত হইতে দেখিয়াছে, তিনি নাকি মদ্যপও ছিলেন। এরূপ ক্ষেত্রে জনরবকে অংশত বিশ্বাস করিয়াই তিনি প্রথমটা প্রাণধনবাবুর গৃহে আশ্রয় লইতে চাহেন

নাই। কিন্তু গত্যন্তর না দেখিয়া তিনি শেষটায় এখানেই উঠিয়াছেন। শিক্ষয়িত্রীর সন্ধান সম্বন্ধেও শেষ পর্য্যন্ত প্রাণধনবাবুর সাহায্য লইতে হইল।

হরিপদবাবু ও হৈমবতী যে কয়দিন কলিকাতায় ছিলেন, সে কয়দিন প্রাণধনবাবুর কিছু মাত্র বেচাল লক্ষিত হয় নাই। ধর্ম্মনিষ্ঠ হরিপদবাবু ভাবিয়া লইলেন যে, প্রাণধন অবিবাহিত বলিয়াই লোকে মিথ্যা কুৎসা রটনা করে, আসলে তাহার চরিত্র কলুষিত নহে।

এদিকে শিক্ষয়িত্রী খুঁজিয়া দিবার অনুরোধ পাইয়া প্রাণধনবাবু একটা মহাসঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইলেন। কিছুকাল যাবৎ তাঁহার একটি প্রণয়িনী অর্থ ও ভরণ-পোষণের জন্য তাঁহাকে উত্যক্ত করিয়া মারিতেছিল। সে একজন ধাত্রীর কন্যা ও বি.এ. অবধি পড়িয়াছিল; মাতার কলুষিত জীবনের প্রভাব সেও অতিক্রম করিতে পারে নাই। কুমারী-জীবনে সে তাহার মাতার বন্ধু এক অল্পবয়স্ক ডাক্তারের প্রেমে পড়িয়া তাহার নিকট আত্মদান করে, সেই ধূর্ত্ত ডাক্তার তাহাকে বিবাহের লোভ দেখাইয়াছিল। সংসারের নিকট হইতে সে যখন এই কঠিন আঘাত পাইল, তখন সে মরিয়া হইয়া উঠিল। সকল সঙ্কোচের বাঁধন তাহার কাটিয়া গেল; সে ভাসমান কাষ্ঠের মত প্রাণধনবাবুর সহিত যুক্ত হইয়াছিল ও নিয়ত তাহার অভাব-অভিযোগের কথা তাঁহাকে জানাইয়া তাঁহার জীবন বিষময় করিয়া তুলিতেছিল।

এমন সময় হরিপদবাবুর প্রস্তাবে প্রাণধনবাবু একটা পথ খুঁজিয়া পাইলেন। প্রাণধন বাবু সুমতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকেই এই শিক্ষয়িত্রীর পদ লইতে অনুরোধ করিলেন। সুমতি শিক্ষিতা নারী, কলিকাতার কদর্য্যতার ঘাত-প্রতিঘাতে সে ইতিমধ্যে জীবনে বীতস্পৃহ হইয়াছিল, এখন কলিকাতার বাহিরে জীবন অতিবাহিত করিবার এই সুযোগ সে প্রত্যাখ্যান করিল না। সে হরিপদবাবুর সহিত দেখা করিল।

সেই সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ ও তাহার সরলা কন্যাকে দেখিয়া সুমতির মনে

হইল, হয়তো কলিকাতা হইতে দূরে ইঁহাদের মধ্যে থাকিতে পাইলে তাহার জীবনের কলুষ কিছু কাটিয়া যাইতে পারে! সে ময়নাপুরে যাইতে রাজী হইল। কথা হইল, সে হরিপদবাবুর বাড়িতে থাকিয়া হৈমকে পড়াইবে ও স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিবে।

ময়নাপুরে আসিয়া সুমতি এরূপ পবিত্র জীবন যাপন করিতে লাগিল যে, স্থানীয় বালিকা ও নারীমহলে তাহার সুখ্যাতির সীমা রহিল না। সে হরিপদবাবুর পরিবারেরই একজন হইয়া পড়িল। হৈমকে সে অত্যন্ত যত্নের সহিত পড়াইতে লাগিল। ময়নাপুরের নারী-উন্নতিমূলক নানা সৎ প্রতিষ্ঠানের সহিত সে যুক্ত হইয়া পড়িল। স্থানীয় ভদ্রলোকেরাও হরিপদ-বাবুকে এই শিক্ষয়িত্রী-নির্ব্বাচনের জন্য প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হরিপদ বাবু সুমতিকে কন্যার মত ভালবাসিতেন, সুমতির প্রশংসায় তিনি গর্ব্ব অনুভব করিতেন।

কিন্তু ভবিতব্য কে খণ্ডাইবে? এক গ্রীষ্মের বন্ধে সুমতি কলিকাতায় আসিয়া মাতার কলুষসংস্পর্শে পুনরায় আত্মবিস্মৃত হইল। তাহার দেহ ও মন বহুদিন যাবৎ ক্ষুধাতুর ছিল। কলিকাতায় মাসখানেক থাকিতে থাকিতে অক্ষয় নামক একটি সুদর্শন যুবকের সহিত তাহার মাতার গৃহে তাহার পরিচয় হইল। অক্ষয় একজন তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত যুবক, সাহিত্যচর্চ্চা করিয়া দিন কাটাইত। মাসিকে সাপ্তাহিকে তাহার লেখার দাম ছিল। সে খুব ভাল অভিনয়ও করিতে পারিত। কিন্তু তাহার বাহিরের চেহারা যেমন সুদৃশ্য ছিল, অন্তরটি তেমন ছিল না। নিজের পাপ-লালসা চরিতার্থ করিবার জন্য সে করিতে পারিত না; এমন কাজ ছিল না। সে আপনার মায়াজাল বিস্তার করিয়া সুমতিকে ভুলাইয়া ফেলিল। সুমতির অতীত জীবন আবার যেন মাথা তুলিয়া উঠিল, সে অক্ষয়ের প্রেমে আত্মবিস্মৃত হইয়া তাহার প্রতি একান্ত নির্ভরশীল হইয়া পড়িল।

এদিকে ছুটির দিন ফুরাইয়া আসিল, আবার তাহাকে ময়নাপুর ফিরিতে

হইবে। অক্ষয় তাহাকে ছাড়িতে চায় না, সেও অক্ষয়কে ছাড়িয়া যাইবার মত মনের জোর পাইল না। প্রথমটা ভাবিল, সে চাকরি ছাড়িয়া দিবে-কিন্তু অক্ষয় তাহাকে ইহাতে বাধা দিল; বলিল, তাহার রোজগার এমন কিছু নহে, যাহাতে দুইজনে কলিকাতায় থাকিয়া সংসার চালাইতে পারে। ময়নাপুরে সেও যাহাতে যাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিলেই হইবে। সুমতির মাতার নিকট পরামর্শ লওয়া হইল। পরামর্শমত এই পাপিয়সী বৃদ্ধা হরিপদবাবুর নিকট এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিল যে, অমুক দিন তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র অক্ষয় সুমতিকে লইয়া ময়নাপুর পৌঁছিবে, স্টেসনে যেন গাড়ির বন্দোবস্ত থাকে।

সুমতির ভাই বলিয়া অক্ষয়ও হরিপদবাবুর গৃহে আশ্রয় পাইল। সংসারের শঠতা ও ক্রূরতার সহিত যদি হরিপদবাবু ও হৈমর কিছুমাত্র পরিচয় থাকিত, তাহা হইলে হয়তো ইঁহারা কিছু সন্দেহ করিবার কারণ খুঁজিয়া পাইতেন। কিন্তু তাঁহারা সরল প্রকৃতির লোক, সহজভাবেই সমস্ত ব্যাপারটা গ্রহণ করিলেন। সুমতি ও অক্ষয় রীতিমত সংযত হইয়া চলিতে লাগিল এবং সপ্তাহান্তে অক্ষয় কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল।

কিন্তু হৈমকে দেখিয়া ও তাহার সহিত পরিচয় হওয়া অবধি অক্ষয়ের মনে শান্তি ছিল না। হৈম সম্বন্ধে তাহার পাপ-লালসা বাড়িয়া চলিল। সুমতির নামে কলিকাতা হইতে যে সমস্ত চিঠিপত্র আসিত, যদি হরিপদবাবু ও হৈম তাহা কখনও খুলিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে হয়তো সুমতিকে দূর করিয়া দিয়া তাঁহারা গোড়াতেই সাবধান হইতে পারিতেন। হৈমর জীবনে এই ব্যথিত অঙ্কের অভিনয়ও হইত না।

লোকের মন ভুলাইবার এক অদ্ভুত ক্ষমতা অক্ষয়ের ছিল। শুধু হরিপদবাবু ও হৈম নহে, ময়নাপুরের ভদ্রলোক মাত্রেই শিক্ষয়িত্রী সুমতির এই ভ্রাতাটিকে প্রীতির চক্ষে দেখিলেন। সে সকলের সহিত আলাপ করিয়া তাহার স্বভাবসুলভ সৌজন্যে সকলকে মুগ্ধ করিল। স্থানীয়

ইন্‌স্টিটিউটে একদিন শহরের ভদ্র জনমণ্ডলীর সাক্ষাতে ম্যাজিক ও অভিনয়ের অংশবিশেষ দেখাইয়া সে সকলের সৌহার্দ্দ্য লাভ করিল। স্থানীয় যুবকেরা তাহাকে পূজা উপলক্ষ্যে একটি অভিনয়ে পার্ট লইতে অনুরোধ করিল। সে পূজার পূর্ব্বে আসিয়া তাহা লইতে চেষ্টা করিবে, এই আশ্বাস দিয়া গেল।

ইহার পর মাঝে মাঝে সে ভগিনীর নিকট আসিতে লাগিল। সুমতি ইহাতে ভয় পাইত ও তাহাকে আসিতে বারণ করিত। কিন্তু অক্ষয় ছিল "মরিয়া" শ্রেণীর লোক। হৈমর প্রতি তাহার কুদৃষ্টি পড়িয়াছিল। যতক্ষণ না আপনার লালসা চরিতার্থ হইতেছে ততক্ষণ সে কিছু করিতে পশ্চাৎপদ নহে। হৈমর প্রতি অক্ষয়ের এই কু-মনোভাবের পরিচয় পাইয়া সুমতি শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু তখন সে আপনার জালে এমনই জড়াইয়া পড়িয়াছে যে কিছু করিবার উপায় ছিল না। সুমতি সত্যসত্যই হরিপদবাবু ও হৈমকে ভালবাসিত। তাহা ছাড়া অক্ষয়ের প্রেমেও তাহার বিশ্বাস ছিল, এখন সে চারিদিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিল।

এদিকে অক্ষয় ঘন ঘন যাতায়াতে শহরের সকলকেই একপ্রকার আত্মীয় করিয়া লইতেছিল। তাহার সম্বন্ধে সন্দেহ করা বা অনুসন্ধান করার প্রয়োজন কেহ অনুভব করে নাই। সে শহরের সকলের প্রিয় সুমতি দেবীর ভাই, ইহাই তাহার সব চাইতে বড় প্রশংসাপত্র। তাহা ছাড়া তাহার নিজের গুণ ও অমায়িক ব্যবহারে প্রত্যেকেই তাহার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। হরিপদবাবুও অক্ষয়কে পুত্রের মত স্নেহ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু যাহার জন্য অক্ষয়ের ময়নাপুরে যাতায়াত এবং যাহার মন সহজ সরল ও পৃথিবীর সকলের প্রতি একান্ত প্রীতিতে পূর্ণ ছিল, সেই হৈমর জীবন ঠিক সহজভাবে চলিতেছিল না। কৈশোর অতিক্রম করিয়া সে যৌবনে উত্তীর্ণ হইয়াছে। এমন অবস্থায় নিঃসঙ্কোচে এই সুদর্শন কৃতী যুবকের সহিত পরিচয় সে প্রথমটা যেমন ভাবেই গ্রহণ করুক, তাহার

মনের কোণে একটু একটু করিয়া বিপর্য্যয় ঘটিতেছিল। পরিচয় যত ঘনিষ্ঠ হইতে লাগিল, অক্ষয় তাহার মায়াজাল বিস্তারের ততই সুবিধা পাইতে লাগিল। বৃদ্ধ হরিপদবাবু সুমতির ভ্রাতা অক্ষয়ের সহিত হৈমর অবাধ মেলামেশায় কোন আপত্তি করিতেন না। নিজের কন্যার প্রতি তাঁহার অসীম বিশ্বাস ছিল। পৃথিবীর কাহাকেও সন্দেহের চক্ষে দেখাটাও তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। সুমতি ভয় পাইয়া যতটা সম্ভব হৈমর কাছে কাছে থাকিত ও নানা সদ্‌বিষয়ের আলোচনায় ও সদ্‌গ্রন্থ পাঠে হৈমর মন পূর্ণ করিয়া রাখিতে চাহিত। অক্ষয় যখনই ময়নাপুর আসিত, সে দুই-এক দিনের বেশি তাহাকে কিছুতেই সেখানে থাকিতে দিত না, ইহাতে অক্ষয় রাগ করিত, কিন্তু কিছু করিয়া উঠিতে পারিত না।

পূজার আগে অভিনয় করিতে সে যখন আসিল, তখন একসঙ্গে অনেক দিন ময়নাপুরে থাকিবার সুবিধা পাইল। সুবিধা পাইয়া তাহার অপব্যবহার করা অক্ষয়ের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। সে কলিকাতা হইতে এবার বাছিয়া বাছিয়া নগ্ন প্রেমের চিত্রসম্বলিত কয়েকটি উপন্যাস ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল এবং গোপনে হৈমকে সেগুলি পড়িতে দিত। সুমতি হৈমকে এবিষয়ে একদিন সাবধান করিয়া দিল। কিন্তু হৈমর সংযম ও সারল্য এখন ভাঙিতে শুরু করিয়াছে। অক্ষয়ের সান্নিধ্য তাহার কাছে এমনই বাঞ্ছনীয় হইয়া পড়িয়াছিল যে, সে উৎসুকচিত্তে নিরন্তর অক্ষয়ের সঙ্গ-কামনা করিত। অক্ষয়ের বিরুদ্ধে কোন কথা বিশ্বাস করিবার মত ক্ষমতা তাহার ছিল না। সে নিজের অন্তরের দ্বন্দ্বে মুহ্যমানের মত থাকিত। সুমতির কথায় সে রাগ করিতে আরম্ভ করিল। মনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেহেও বিকার উপস্থিত হইল। সেই কুসুমপেলব সৌন্দর্য্য অকস্মাৎ কেমন যেন রূঢ়কঠিন হইয়া উঠিল। বৃদ্ধ হরিপদবাবু কন্যার চিত্তের এই ঘাত-প্রতিঘাতের কোন সন্ধান পাইলেন না। সুমতি বুঝিয়া শুনিয়া ছটফট করিতে লাগিল।

সুমতি নিজেকে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল, অক্ষয়ও সুতরাং ব্রাহ্ম। তাহার সহিত বিবাহ দিতে হরিপদবাবুর যে ভয়ঙ্কর আপত্তি হইবে—হৈমর এ কথা অবিদিত ছিল না। অথচ সে নিজের মনের গতি রোধ করিতে পারিতেছিল না। অন্তরে অন্তরে তাহার নিরন্তর দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। কিন্তু যে সমস্যার সমাধানের জন্য সে মাথা খুঁড়িতেছিল সে সমস্যা সমাধানের অপেক্ষা তাহার মন রাখিল না। সে একদা অক্ষয়কে মনে মনে বরণ করিয়া লইয়া নিশ্চিন্ত হইল।

অন্তরে সে যত জোরই পাক, পিতাকে এ বিষয়ে কিছু বলিবার মত মনের জোর তাহার ছিল না। অক্ষয় হৈমকে জয় করিবার জন্য তখনও প্রাণপণ করিতেছিল, সেও হৈমর মনের খবর জানিল না। একটি মানবীর মন জয় করিবার জন্য সে ইতিপূর্ব্বে কখনও এমন চেষ্টা করে নাই; তাহার দেহের ও মনের যতগুলি অস্ত্র ছিল, সে সবগুলিকে শানাইয়া শানাইয়া প্রয়োগ করিতে লাগিল, হৈম ছটফট করিতে লাগিল। কখনও সে দূরে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিত। নিজের শয়ন-ঘরে বালিশে মুখ গুঁজিয়া একাকী পড়িয়া থাকিত। আগে মাথা ধরা কাহাকে বলে, সে জানিত না। এখন প্রায়ই তাহার মাথা ধরিত। সুমতি সব বুঝিত, তাহাকে শেলীর কবিতা, কীট্‌সের কবিতা পড়াইয়া শোনাইত। শুনিতে শুনিতে হৈমর চোখ ছলছল করিয়া উঠিত; বলিত, দিদি থামো, ওসব আমার ভাল লাগে না। সে ছুটিয়া অক্ষয়ের ঘরে গিয়া বলিত, আমি আজ আপনাদের রিহার্সেল শুনতে যাব। নিয়ে যাবেন? অক্ষয় যেন হাতে স্বর্গ পাইত, কিন্তু সাত পাঁচ ভাবিয়া ছেলেদের আড্ডায় তাহাকে লইয়া যাইতে ভরসা পাইত না। সে অনুভবে এইটুকু মাত্র বুঝিতেছিল যে, তাহাদের উভয়ের মন অদৃশ্য বিদ্যুতে এমন পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে যে, অকস্মাৎ যে কোন মুহূর্ত্তে একটা বিপর্য্যয় ঘটিতে পারে, অন্তত পাঁচজনের সামনে সেটা কিছুতেই ঘটিতে দেওয়া হইবে না।

অক্ষয় ও হৈমকে লইয়া এই যে ভয়াবহ অভিনয়, তাহার সাক্ষী ছিল একমাত্র সুমতি। ইহার ভবিষ্যৎ ফলাফলের আগুন ইতিমধ্যেই সে অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতেছিল, তাহার মনের পাপ এই অনুতাপের আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। সে সাবধানী মাতার মত হৈমকে বাঁচাইতে চায়, কিন্তু হৈম তখন তাহার হাতের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। সে নিজের জন্য বা অক্ষয়ের জন্য কিছুমাত্র ভীত ছিল না। যদি প্রয়োজন হয়, সে নিঃসঙ্কোচে সমস্ত প্রকাশ করিয়া দিবে; কিন্তু সেই শেষ অস্ত্র ব্যবহারের পূর্ব্বে অন্য কোন উপায়ে হৈমর মনের গতি ফেরে কি না সে তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিল। যেমন করিয়াই হউক হরিপদবাবুকে এই চরম লাঞ্ছনা হইতে বাঁচাইতে হইবে। সুমতি সত্যসত্যই এই বৃদ্ধকে পিতার মত ভক্তি করিত।

সুমতি এতদিনে অক্ষয়কে ভাল করিয়াই চিনিয়াছে। তাহার নিজের মন দৃঢ় হইয়াছে, তাহার এই পঁচিশ বৎসরের জীবনে সে বহু আঘাত পাইয়াছে, অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে। জীবনে সে কখনও লোকের শ্রদ্ধার মূল্য বোঝে নাই। নিন্দাগ্লানিকে সে ডরাইত না। কিন্তু আজ হরিপদবাবুর সংসারে আশ্রয় লইয়া ময়নাপুরের ভদ্র-সমাজের একজন হইয়া নামের প্রতি তাহার মায়া জন্মিয়াছে, অবশ্য হৈমকে বাঁচাইবার জন্য এ নামের মোহ সে ত্যাগ করিবে, কিন্তু তবু যদি দুই কুল রক্ষা হয়!

অক্ষয়ের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না। সে অক্ষয়ের মুখে যেটুকু শুনিয়াছিল তাহাতে জানিত, অক্ষয় পিতৃমাতৃহীন হইয়া মাতুলালয়ে মানুষ হইয়াছে ও মামার বাড়ির সম্পর্কে কিছু সম্পত্তি পাইয়াছে; কিন্তু তাহার মত বিলাসীর পক্ষে সে সম্পত্তি কিছুই নহে, তাহার নিজের উপার্জ্জনের কোন স্থিরতা ছিল না। দুই-চারিখানি বইয়ের আয় ও মাসিক পত্রিকাদিতে লেখার মূল্য, এইটুকু তাহার স্বোপার্জ্জিত। এই আয়ের কোন বাঁধাবাঁধি ছিল না। কোন মাসে পাইত, কোন মাসে পাইত

না। কিছুদিন পূর্ব্বে কোন থিয়েটারে চাকরি লইতে মনস্থ করিয়াছিল। এই চাকরি জোটানো তাহার পক্ষে সহজ, আজিও সে চেষ্টা করিলে থিয়েটারে বা সিনেমায় চাকরি পাইবে, কিন্তু অক্ষয়ের যে দিকটার সহিত তাহার পরিচয়, তাহার চরিত্রের যে নীচতা সে লক্ষ্য করিয়াছে, তাহাতে হৈমর স্বামী হইতে দেওয়া তাহাকে কিছুতেই যায় না; তাহার উপর হরিপদবাবু ব্রাহ্মণ, অক্ষয় কায়স্থ। সমাজ ত্যাগ না করিয়া হৈম অক্ষয়কে বিবাহ করিতে পারে না। কিন্তু অক্ষয়ের সহিত হৈমর বিবাহের চিন্তাতেই সুমতি শিহরিয়া উঠিল। অসম্ভব, এ কিছুতেই হইতে পারে না।

তবে উপায়! নামের মোহ তাহাকে ত্যাগ করিতেই হইবে কিন্তু তাহার পূর্ব্বে হৈমকে এবং প্রয়োজন হইলে অক্ষয়কে লইয়া একটা শেষ বোঝাপড়া করিতে হইবে।

তাঁহারই পরিবারের মধ্যে তিনটি প্রাণীর মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলিতেছিল, হরিপদবাবুর পক্ষে তাহার সামান্য আভাস পাওয়ারও সম্ভাবনা ছিল না। তিনি আসন্ন দুর্গাপূজা ও তদুপলক্ষ্যে অভিনয় লইয়া মাতিয়াছিলেন। অক্ষয়ের অভিনয়ের কৃতিত্ব শুনিয়া মুগ্ধ হইতেছিলেন। বাড়িতে ফিরিয়া প্রতিদিন হৈমর সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করিতেন; হৈম "হুঁ, হাঁ" দিয়া কাজ সারিত।

হরিপদবাবু এই বৎসরের শেষে কলিকাতায় বাসা উঠাইয়া লইয়া যাইতে চাহিতেছিলেন। ভিতরে ভিতরে তাহারও বন্দোবস্ত চলিতেছিল। ইহাতে হৈমর সুখ-দুঃখ দুইই ছিল। তবে সুমতি সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইবে, বৃদ্ধ তাহা স্থির করিতে পারেন নাই। স্কুল চালাইতে হইলে সুমতির এখানে থাকা একান্ত আবশ্যক। অন্যান্য শিক্ষয়িত্রীর চাইতে তাহার প্রভাব এখানে বেশি। তাহার মত যত্ন লইয়া কেহ স্কুলের কাজ করে না। অথচ কলিকাতায় হৈমর একজন সঙ্গী আবশ্যক। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সুমতির জায়গায় অন্য শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ করিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া

কলিকাতায় যাওয়াই স্থির করিলেন। কিন্তু এসব কথা তাঁহার মনেই ছিল, বাহিরে প্রকাশ পায় নাই।

কিন্তু ঘটনাচক্রের বাহিরেও অলক্ষ্যে আর একটি চক্রান্ত চলিতেছিল। ময়নাপুর বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষয়িত্রী সুরবালা দেবী সুমতির আকস্মিক আবির্ভাব ও ময়নাপুরের আপামরসাধারণের হৃদয় জয় করা, সেক্রেটারির গৃহে কন্যার যত্নে থাকা, ইত্যাদিকে সহজভাবে গ্রহণ করেন নাই। তিনি ক্রূরপ্রকৃতির নারী, সহসা কি করিয়া অনুভব করিলেন সুমতির বহিঃপরিচয়ের অন্তরালে আরও কোন পরিচয় আছে, সেটি অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিয়া ময়নাপুরে তাহাকে লাঞ্ছিত করিতে হইবে। চরবৃত্তি করিবার ভার তাঁহার এক পরিচিত বন্ধুর উপর দিয়া তিনি অনুসন্ধানের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

সুমতি সুযোগ বুঝিয়া একদিন অক্ষয়কে ধরিয়া বসিল। তাহার সহিত সেইদিন শেষ বোঝাপড়া হইবে। অক্ষয় বাগ না মানিলে হৈমর সহিত শেষ বোঝাপড়া এবং তাহার পর—সুমতি আর ভাবিতে পারে না। অভি-নয় হইতে আর দুই দিন মাত্র বাকি ছিল। অক্ষয়কে সমস্ত বুঝিতে দিয়া তাহাকে চিরকালের জন্য হৈমর দিক মাড়াইতে বারণ করাই—এই সমস্যা সমাধানের সহজ উপায়।

সমস্ত কথা শুনিয়া অক্ষয় ক্ষেপিয়া গেল। বলিল, সে হৈম সম্বন্ধে কোন নীচ মতলব পোষণ করে না, সে তাহাকে বিবাহ করিবে। সুমতি বলিল, কিন্তু সে হৈমকে ছোট বোনের মত ভালবাসে। অক্ষয়ের মত লোকের সহিত হৈমর বিবাহ ঘটিতে দিতে সে পারে না। তাহার উপর হরিপদবাবুকে বৃদ্ধ বয়সে সমাজ ত্যাগের দুঃখ দেওয়াও উচিত নহে। অক্ষয় বলিল, এখন ফিরিয়া যাওয়া তাহার পক্ষে সহজ নহে। কথা কাটাকাটির ফলে অক্ষয় চটিয়া গিয়া বলিল, নিজের মতলব হাসিল করিবার জন্য সে সব কিছু করিতে প্রস্তুত আছে।

আর এক ভরসা হৈম। কিন্তু নিয়তির এমনই পরিহাস যে, সুমতি যখন হৈমর মন অক্ষয়ের প্রতি বিরূপ করিবার চেষ্টা করিতেছে ঠিক সেই সময়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর গৃহে সেক্রেটারি হরিপদবাবু সুমতির প্রকৃত পরিচয় পাইতেছিলেন। সুরবালা দেবীর অনুসন্ধানের ফল আসিয়া পৌঁছিয়াছে। হরিপদবাবু সুরবালা দেবীর নিকট হইতে যখন বাড়ি ফিরিলেন, তখন রাত্রি অনেক। তিনি সরাসরি নিজের ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। সমস্ত সংসারের বিরুদ্ধে তাঁহার অভিমান হইতেছিল। কিন্তু এখনও হয়তো তাঁহার ভুল ভাঙিতে পারে, সুরবালার কথা হয়তো সত্য নহে, তাহাই হউক। তিনি কাল নিজে কলিকাতায় গিয়া সন্ধান করিবেন। তাহার পূর্ব্বে কিছুই করিবার নাই।

এদিকে সুমতি হৈমকে নিজের ও অক্ষয়ের সঠিক পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইল না। হৈমর বয়স একরাত্রে দশ বৎসর বাড়িয়া গেল। সুমতি যখন অক্ষয়ের লেখা চিঠিগুলি তাহাকে দেখাইতেছিল, তখন হৈম শুধু মনে মনে কামনা করিতেছিল, ধরণী দ্বিধা হউক। সব শুনিয়া হৈম শুধু 'মা' বলিয়া শয্যা লইল, চোখের জলে বালিশ ভিজিয়া গেল, কিন্তু মনের কোণে সে কোনও সান্ত্বনা খুঁজিয়া পাইল না। সংসার যে এত ভয়ানক এই প্রথম সে তাহার পরিচয় পাইল।

সুমতি মনস্থির করিয়াছে। সে ময়নাপুর পরিত্যাগ করিবে, কিন্তু তৎপূর্ব্বে বৃদ্ধ হরিপদবাবুকে সব খুলিয়া বলিতে হইবে! অভিনয় শেষ হওয়া পর্য্যন্ত সে অপেক্ষা করিবে।

অভিনয়ের দিন সকালবেলায় হরিপদবাবু কাহাকেও কিছু না বলিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। সুমতিও চাকরি ত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। হৈম সেই যে শয্যা লইয়াছিল, পরদিন সমস্ত দিন-রাত্রির মধ্যে একবারও উঠিল না। শুধু ময়নাপুরের ভদ্র-সমাজ অক্ষয়ের অভিনয় দেখিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন।

অভিনয় করিতে করিতে যখনই অবকাশ পাইতেছিল, অক্ষয় তখনই হৈমর কথা ভাবিতেছিল। কিছুদিন হইতে তাহার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইতেছিল যে, হৈমকে না হইলে তাহার চলিবে না—সে এমন করিয়া আর কাহাকেও ভালবাসে নাই। হৈমর সহিত পরিচয় হওয়া অবধি হৈমর সমস্ত আচরণ সে স্মরণ করিতে লাগিল। মানব-চরিত্রের যতটুকু জ্ঞান তাহার আছে তাহাতে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে, হৈম তাহার প্রতি বিরূপ নহে, সম্ভবত তাহাকে সেও ভালবাসিয়াছে। কিন্তু তবুও তাহাকে পাওয়া সহজ হইবে না। হরিপদবাবু যতই নিরীহ হউন, অক্ষয়ের সঠিক পরিচয় পাইলে হৈমর সহিত তাহার বিবাহ দিবেন না—সমাজ ত্যাগ করিয়া হৈমকে তাহার হাতে সমর্পণ করিতে তাঁহার আপত্তি হয়তো নাও হইতে পারে।

কিন্তু তাহার সব চাইতে ভয় হইতেছিল সুমতিকে। এখানে এবারে আসিয়া সে সুমতির যে রূপ দেখিয়াছে, সে রূপ সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। সে সুমতিকে তাহারই অনুগ্রহভিখারী এক অসহায়া নারীরূপেই দেখিয়াছিল, কিন্তু আজ সেই সুমতির সুপ্ত মাতৃত্ব যেন জাগরিত হইয়াছে। হৈমকে বাঁচাইবার জন্য সে আত্মলাঞ্ছনা ও চরমতম অপমান সহিতেও প্রস্তুত। এই ব্যাঘ্রী-জননীর হাত হইতে হৈমকে লইয়া যাওয়া সহজ হইবে না—কিন্তু তবুও সে হাল ছাড়িল না।

অভিনয় শেষ হইবামাত্র অক্ষয় হরিপদবাবুর গৃহে ফিরিয়া তাহার নির্দ্দিষ্ট শয়নকক্ষে কিছুক্ষণ বসিয়া আকাশপাতাল ভাবিতে লাগিল। তাহার ভয় হইল, হয়তো কাল প্রাতেই সুমতি সব কিছু প্রকাশ করিয়া দিবে। ভাবিতে ভাবিতে তাহার চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া গেল। দিক্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া সে সন্তর্পণে চোরের মতন হৈমর শয়নকক্ষের দ্বারে গিয়া মৃদু আঘাত করিয়া অনুচ্চস্বরে ডাকিল, হৈম!

সে রাত্রে সুমতিও ঘুমাইতে পারে নাই। সেও আকাশপাতাল চিন্তা

করিতেছিল। কাল সেই সরল বৃদ্ধের নিকট আত্মপ্রকাশ করিলে তিনি কতটা আঘাত পাইবেন কে জানে, তাহা ছাড়া ময়নাপুরের জনসমাজের নিকট তাহার কলঙ্কের অবধি রহিবে না। কলিকাতায় ফিরিয়া আবার তো সেই পিশাচী মায়ের কবলে পড়িতে হইবে, সেই অক্ষয়, সেই প্রাণধনবাবু, সেই কুৎসিত কলঙ্কিত জীবনযাত্রা। না। তাহার চাইতে মৃত্যু ভাল। হায়! তাহার ভাগ্য-দেবতা যদি তাহার প্রতি বিরূপ না হইতেন! তাহা হইলে এই বৃদ্ধের নিকটেই সে তাঁহার কন্যার মত আজীবন কাটাইতে পারিত।

সহসা হৈমর শয়নকক্ষের দ্বারে করাঘাত ও মৃদু 'হৈম' ডাক শুনিয়া সুমতি লাফাইয়া উঠিল। বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া সে অক্ষয়ের পৃষ্ঠদেশে হস্তার্পণ করিয়া বলিল, চুপ, হৈমকে ফের ডাকবে তো আমি চীৎকার ক'রে সকলকে জাগিয়ে দেব, আমি নিজের জন্যে আর ভয় করি না।

অক্ষয়ের মৃদু ডাক হৈম শুনিয়াছিল। সে ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়া দুই হাতে কর্ণ রোধ করিয়া বিছানায় মড়ার মত পড়িয়া রহিল। না না, কিছুতেই হইতে পারে না। সহসা সুমতিরও কণ্ঠস্বর সে শুনিতে পাইল এবং সন্তর্পণে দরজার পাশে আসিয়া কান পাতিয়া রহিল।

এই ভাবে বাধা পাইয়া অক্ষয় আত্মবিস্মৃত হইয়া বলিয়া উঠিল, শয়তানী, চুপ কর্, নইলে তোকে টুঁটি টিপে মেরে ফেলব। সুমতি একটু হাসিল মাত্র। সে নিজে হৈমর দরজায় আঘাত করিয়া ডাকিল, হৈম!

অক্ষয় সত্য সত্যই সবলে সুমতির গলা চাপিয়া ধরিল, সুমতি একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। হৈম সভয়ে দরজা খুলিয়া অক্ষয়ের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অক্ষয় হৈমকে দেখিয়া একটা ঝাঁকানি দিয়া সুমতিকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া দ্রুতপদে নিজের ঘরে গিয়া সামান্য দুই-চারিখানি অতি প্রয়োজনীয় জিনিস লইয়া ভোরের অন্ধকারে বাহির হইয়া গেল।

হৈম সুমতিকে তুলিয়া তাহার হাত ধরিয়া নিজের ঘরে লইয়া আসিল এবং সুমতির গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। সুমতি নিজে একটু

সামলাইয়া লইয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। হেম বলিল, দিদি, এ কি হইল! সুমতি মৃদু হাসিয়া বলিল, আমার নতুন জন্মলাভ হ'ল বোন; ভগবান মঙ্গলময়।

সেদিন দ্বিপ্রহরে হরিপদবাবু ফিরিয়া আসিলেন। রাগে ও দুঃখে তিনি ছটফট করিতেছিলেন। সুরবালার কথাই ঠিক। প্রাণধন নিজে বলিয়াছে। হরিপদবাবু যখন ফিরিলেন, সুমতি তখন স্কুলে গিয়াছে। হরিপদবাবু তখনই স্কুলে যাইতে চাহিতেছিলেন। হেম বাধা দিয়া বলিল, বাবা, তোমার কি হয়েছে? এখনই আবার স্কুলে যাবে কেন?

হরিপদবাবু সুমতির পাপের কথা, প্রতারণার কথা হেমকে বলিলেন। হেম হাসিয়া বলিল, ও তো আমি জানি বাবা, সুমতিদিদি আমায় বলেছেন। বোধ হয় তোমাকেও আজ নিজে বলবেন।

হরিপদবাবু আকাশ হইতে পড়িলেন। বলিলেন, তুই জানিস? আমাকে তবে বলিস নি কেন? ও রকম মেয়েকে স্কুলে রাখা আর ঘরে থাকতে দেওয়া যে ভারি খারাপ হয়েছে।

হেম বলিল, ছি বাবা, সুমতিদিদির মত মানুষ হয় না। আগে ভুল করেছেন ব'লে কি তাঁকে চিরটা কাল লাঞ্ছনা সইতে হবে? তুমি জান না বাবা, তিনি আমাদের কতটা হিতাকাঙ্ক্ষী। আর এতদিনের অনুতাপের কি কোন দাম নেই? আমি তো আজও তাঁকে খারাপ ভাবতে পারি না।

হরিপদবাবু বলিলেন, কিন্তু তাকে তো আর স্কুলে কিংবা বাড়িতে রাখতে পারি না—

হেম একটু রাগত হইয়া বলিল, বাবা, আমি যদি ওই রকম করতুম তুমি কি আমাকেও তাড়িয়ে দিতে? জীবনে যে অন্যায় ক'রে আজও তার প্রায়শ্চিত্ত করছে তাকে কি আবার তুমি পাপের পথে ঠেলে দেবে? না বাবা, তা আমি হতে দেব না।

হরিপদবাবু একটু বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, অক্ষয়বাবু কোথায়?

অক্ষয়ের নামে হৈম লজ্জিত হইল, কিন্তু বৃদ্ধ তাহা বুঝিতে পারিলেন না। হৈম বলিল, তিনি চ'লে গেছেন।

অক্ষয় চলিয়া গিয়াছে শুনিয়া হরিপদবাবু একটু নিশ্চিন্ত হইলেন। তিনি সুমতির জন্য বাড়িতে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

সুমতির কাছ হইতে বৃদ্ধ আদ্যোপান্ত তাহার জীবনের ইতিহাস শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। অক্ষয়ের কথা শুনিয়া তিনি ব্যথিত হইলেন। কিন্তু সুমতিকে ত্যাগ করিতে তাঁহার মন সরিল না।

বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা হইল না। তিনি অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া স্কুলের সেক্রেটারিশিপ ও ওকালতি ত্যাগ করিয়া সুমতি ও হৈমকে লইয়া কলিকাতায় ফিরিলেন। সুমতি তাঁহার গৃহেই রহিয়া গেল, কলিকাতায় মাতার সহিত সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করিল না।

সুমতির মত যাহারা গ্রহের ফেরে পড়িয়া অসৎ জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয়, তাহাদের জন্য বৃদ্ধের মনে এক নিদারুণ ব্যথা ও সহানুভূতি জাগিয়াছিল। তিনি তাঁহার জীবনের সমস্ত সঞ্চয় তাহাদের জন্য ব্যয় করিতে মনস্থ করিলেন। নারী-শিক্ষা-সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি অসহায়া মেয়েদের জন্য এক আশ্রম করা স্থির করিলেন।

বালিগঞ্জে একটি সুবৃহৎ বাড়ি ক্রয় করা হইল। আশ্রমের ট্রাস্টডীড তৈয়ারি হইল। বৃদ্ধ হরিপদবাবু সুমতি ও হৈমকে লইয়া আশ্রমের এক অংশেই থাকিতে লাগিলেন। সুমতি ও হৈম আশ্রমের কাজে আত্ম-নিয়োগ করিল। হরিপদবাবু ময়নাপুরের কথা ভুলিতে পারেন নাই। তিনি যে আজীবন সেখানকার লোকের অর্থই শোষণ করিয়াছেন তাহা কখনও ভোলেন নাই। তাঁহার আশ্রমের নাম রাখিলেন, "ময়নাপুর অনাথা-আশ্রম।"

স্ত্রীচরিত্র

শ্রীমতী লীলা মুখুজ্জে আমাদের "তরুণ সঙ্ঘের" আইডিয়াল নারী।

আমরা সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতাম ও সভয় ভক্তিতে তাঁহার সহিত কথাবার্তা বলিতাম। তিনি কিন্তু অত্যন্ত সহজভাবে আমাদের সঙ্গে আন্তরিক মেলামেশা করিতেন ও আমাদের 'কম্‌রেড' বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

নানা কুসংস্কার ও আচারের চাপে আমাদের এই দুর্ভাগা দেশ আজ বহু শতাব্দী ধরিয়া পীড়িত। আমাদের যেন দাবি করিবার কিছু নাই; সামান্য কিছু একটু আমাদের তুলিয়া ধরিয়া দিলেই আমরা সন্তুষ্ট। ঘরে আমাদের গৃহিণীরা মূর্ত্তিমতী অন্ধকার,—বাহিরে সমাজপতি হইতে আরম্ভ করিয়া হাড়ি চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলেই 'গোব্রাহ্মণ হিতায়' নিরন্তর প্রচেষ্ট। বিধিবন্ধনের একচুল এদিক ওদিক হইবার জো কি? স্ত্রী জাতির প্রতি আমাদের ব্যবহার রসনাতৃপ্তিকর খাদ্য বা স্বর্ণমুষ্টির প্রতি আমাদের লোলুপতারই সহিত তুলনীয়। 'পঞ্চমকারে'র মধ্যেও আমরা নারী-জাতিকে ফেলিয়াছি; আমাদের পঞ্জিকার পাতায় পাতায় সম্ভোগ-নিষেধের স্থানে মদ্য-মাংস-অলাবু ইত্যাদির সহিত এক শ্রেণীতে স্ত্রীজাতির সমাবেশ! এত গুরুতর নৈতিক অত্যাচার ও অপমান আমাদের নারীজাতিও নির্ব্বিবাদে সহিয়া আসিয়াছেন এবং হাতের নোয়া ও মাথার সিঁদুর চওড়া করিয়া পরিয়া স্বামী-জাতির অপরিসীম কল্যাণ নিরন্তর সাধন করিয়া আসিতেছেন এবং আমরাও বুক ফুলাইয়া বলিয়া আসিতেছি—ইহাই তো সতীত্বের আদর্শ, সীতা-সাবিত্রীর দেশ—হবে না? এবং অন্দরে ঢুকিয়া পদ-সেবার জন্য নির্লজ্জের মত অন্তঃপুরাবদ্ধা পত্নীর মাথার উপর পা তুলিয়া

দিয়া তাহার উপর তর্জ্জন গর্জ্জন ও প্রয়োজনমত মুষ্টিবর্ষণ করিয়া এই সতীত্বের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছি। আমাদের বিবাহকে ধর্ম্মবিবাহ বলিয়া অন্য জাতির প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিতেছি—ও বিবাহিতা অর্দ্ধাঙ্গিনীর প্রতি ক্রীতদাসীর মত আচরণ করিয়া 'যদিদং হৃদয়ং মম তদিদং হৃদয়ং তব' ইত্যাদি মন্ত্রকে সার্থক করিতেছি। বিদেশের নারী মাত্রই আমাদের আড্ডা-বৈঠকে বহুচারিণী এবং বিবাহবন্ধনচ্ছেদ-প্রথা বর্ব্বরতারই পরিচয় মাত্র। বালিকা-বিদ্যালয়গুলি আমাদের কলেজের ছাত্রদের যেন ফিশিং পণ্ড্! অন্তঃপুরের বাহিরে আমাদের অন্তঃপুরিকারা চলাফেরা করিলেই আমরা তাহাদের কুৎসা গাহিয়া অসভ্যভাবে তাহাদের পাছু লই।

এই গেল ব্যবহারিক জীবনে। সাহিত্যেও আমরা আরও এক ধাপ অগ্রসর হইয়াছি। আমাদের দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক কাগজে, গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ এমন কি কবিতাতেও আমরা 'লক্ষহীরা'র আদর্শ খাড়া করিয়া অঙ্কিত করিতেছি। মনু-পরাশরের নির্দ্দিষ্ট পথের বাহিরে যে নারী একবার পা দিয়াছে, আমাদের কলমের মুখে তাহার আর লাঞ্ছনার অন্ত নাই। মোটের উপর আমরা সনাতন হিন্দুধর্ম্মের পৌরোহিত্য বেশ ভাল করিয়াই সম্পন্ন করিতেছি।

গণেশবাবুর বাড়িতে আমাদের কয়জনের একটা সান্ধ্য বৈঠক বসিত। আমরা সেখানে আমাদের এই নারী-নির্য্যাতনের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিতাম। আমরা বলিতাম—নারী যদি পুরুষের সম্ভোগের বস্তু হয়, তবে পুরুষও নারীর তাই। সুতরাং শুধু এই কারণেই স্ত্রী পুরুষের অধীন নয়। শতাব্দীব্যাপী অশিক্ষার ফলে আজ নারীরা নিজেদের আসল সত্তা ভুলিয়াছে, আজ তাই কি সমাজে কি রাষ্ট্রে কোথাও তাহার স্থান নাই, এমন কি পারিবারিক জীবনযাত্রাতেও পুরুষের ইঙ্গিতে সে চলিতেছে ফিরিতেছে। নারীর যে পুরুষের সহিত সমান অধিকার—এ কথা নারীই ভুলিয়াছে।

আমরা নারীকে এই অধিকার দিবার জন্য সকলেই বদ্ধপরিকর হইলাম। গণেশবাবুর বাড়ির ক্ষুদ্র বৈঠকটি রীতিমত সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া 'তরুণসঙ্ঘে'র সৃষ্টি হইল। চাঁদা উঠিল, ঘর ভাড়া লওয়া হইল; সভ্যসংখ্যাও স্ত্রী-পুরুষে মিলিয়া বেশ কিছু ভারী হইয়া উঠিল। গণেশবাবু হইলেন আমাদের সম্পাদক। 'তরুণ' নাম দিয়া একটি মাসিক কাগজও আমরা চালাইতে লাগিলাম, তাহাতে আমাদের 'সঙ্ঘে'র প্রত্যেকেই কিছু না কিছু লিখিত। আমাদের মূলমন্ত্র ছিল—প্রচলিত কুসংস্কারগুলির উচ্ছেদ করা—মনু পরাশর হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সমাজপতিদের প্রত্যেকটি আদেশ অমান্য করা এবং পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার স্থাপন করা।

'তরুণসঙ্ঘ' স্থাপিত ও 'তরুণ' পত্রিকাটি বাহির হইবার পর হইতেই আমাদিগকে লইয়া কলিকাতার শিক্ষিত সমাজ ও সাহিত্যিক মহলে বেশ একটু আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। আমরা নানাদিক হইতে উপহাস ও বিদ্রূপলাভ করিতে লাগিলাম। বাবরী-কাটা চুল, ঢেউ-খেলানো টেড়ি, বঙ্কিমঠাটে চলন কিংবা কাব্যগন্ধী নাম দেখিলেই লোকে বলিত—কি হে উনিও তরুণ নাকি? আমরা যেন হইলাম চরম ন্যাকামির ও মেয়েলিপনার আদর্শ। এমন কি সেদিনও একজন আশু-বিখ্যাত ব্যঙ্গরসিক একটি বিখ্যাত কাগজে আমাদিগকে 'কচি' আখ্যা দিয়া এক গল্প ফাঁদিয়াছেন দেখিলাম। তাহাতে আমাদের দলের লোকের যে কল্পিত নামগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে, আমাদের আসল নাম তাহার কাছ ঘেঁসিয়াও যায় না—দৃষ্টান্ত যথা—আমাদের সম্পাদকের অতি বিশ্রী 'গণেশ' নাম, যাহা স্মরণ মাত্রেই কবিত্ব ও মোলায়েমত্ব দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করে, আর আমার নিজের 'বিরিঞ্চিবিলাস' নাম তো আধুনিক সভ্যতার হাল আইনে একেবারে নাকচ! আমাদের মুখ দিয়া যে সব হা-হুতাশ ছড়ানো হইয়াছে তাহা সর্ব্বৈব কল্পিত। আমরা কস্মিনকালেও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলি না—এমন কি তিন মাসের মধ্যে আমাদের সঙ্ঘের সান্ধ্যবৈঠকে তিনখানা টেবিল

আমাদের আবেগ-তাড়নে বদলাইতে হইয়াছে। একজন নামজাদা চিত্রকর তাঁহার সেই গল্পটিকে বি-চিত্রিতও করিয়াছেন। তাহাতে যে আকৃতি, মুখাবয়ব, ঢেউ-খেলানো চুল ইত্যাদি অঙ্কিত দেখিলাম, তাহা পথে-ঘাটে অনেক পাওয়া যাইতে পারে কিন্তু তরুণ-সঙ্ঘের একজনেরও অমন মার্কা-মারা চেহারা নয়। আমাদের সম্পাদক গণেশবাবুর রীতিমত ভুঁড়ি আছে এবং বিরাট-আয়তন টাকের প্রভাবে তাঁহার মস্তকের অবশিষ্ট চুল কয়টিও ক্রমশ নির্ম্মূল হইয়া আসিতেছে।

যাহা হউক, শত্রুপক্ষের হাস্য-পরিহাস সত্ত্বেও আমাদের সঙ্ঘটি দিনে দিনে বিস্তৃত হইতে লাগিল এবং আমাদের কাগজটিও নিয়মিতভাবে নানা সম্ভার ও চিন্তার খোরাক লইয়া বাহির হইতে লাগিল। গোঁড়া হিন্দুর গোপনে মুর্গী খাওয়ার মত প্রত্যেক 'অ-তরুণ' আমাদের কাগজটি আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া বাহিরে বলিতেন—ও নোংরা জিনিস আমরা স্পর্শ করি না। কিন্তু স্পর্শ যে করিতেন তাহা আমাদের গ্রাহক-সংখ্যার ও নগদ-বিক্রির হিসাবে ধরা পড়িত।

আমাদের অনেকগুলি মহিলা-সভ্য ছিলেন, তাঁহারাও প্রায়ই আমাদের কাগজের অঙ্গপুষ্টি করিতেন। তবে আমাদের সান্ধ্য মজলিশে কিংবা চা ও চুরুটের আড্ডায় মাত্র দুই-চারিজন ছাড়া বড় একটা কেহ আসিতেন না।

শ্রীমতী লীলা দেবী ছিলেন আমাদের নিয়মিত সভ্য এবং হাজিরাতে তাঁহাকে কোনদিন অনুপস্থিত লিখিতে হয় নাই। মধ্যে মধ্যে প্রায়ই তাঁহার নিজ বাড়িতে আমাদের সঙ্ঘের বৈঠক বসিত। সেখানে স্ত্রী-সভ্যেরা প্রায় সকলেই উপস্থিত থাকিতেন।

লীলা দেবীই ছিলেন আমাদের আদর্শ নারী। তাঁহার নিজের অধিকার-টুকু তিনি নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করিতেন। আমাদের সঙ্গে মিশিতে তাঁহাকে কখন ইতস্তত করিতে দেখি নাই। তিনি সমানে আমাদের সহিত

চা খাইয়াছেন, চুরুট ফুঁকিয়াছেন, টেবিলের উপর পা তুলিয়া দিয়া চেয়ার ঢুলাইয়াছেন।

মাঝে মাঝে আমরা সকলে মিলিয়া সেক্স-প্রবলেম-ঘটিত কন্টিনেন্টাল উপন্যাসাদি ও সেক্সলজি সম্বন্ধে আধুনিক বইগুলি পাঠ করিতাম। তিনি অবাধে আমাদের সহিত যোগ দিয়া স্বাভাবিকভাবে তর্ক করিয়াছেন। হ্যাভেলক এলিসের সাইকলজি অব সেক্সের পরিশিষ্টের ইতিহাসগুলি আমরা একত্রে পাঠ করিয়া তাহার বৈজ্ঞানিক বিচার করিতে গিয়া তাঁহার সম্মুখে 'রাঙা' হইয়া উঠিয়াছি, তিনি সহজভাবে কথা বলিয়া আমাদিগকে লজ্জার হাত হইতে বাঁচাইয়াছেন।

কিন্তু যে সমস্ত পুস্তকে নারীজাতিকে খর্ব্ব করিয়া পুরুষের প্রাধান্য দেখানো হইয়াছে তিনি সেগুলি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেন, একবার সেগুলির দিকে দৃকপাতও করিতেন না। নৌকাডুবির কমলা আর শরৎবাবুর বিরাজ-বউয়ের চরিত্র তিনি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেন না; "জ্যাঠা মশায়ে"র ননীবালাকে রবিবাবু নমস্কার নিবেদন করিয়াছেন বলিয়া তিনি প্রায়ই বলিতেন, রবিবাবু আধুনিক সমাজের অকল্যাণ করিতেছেন। আরও কতকগুলি স্বাধীন মত তাঁহার ছিল ও তিনি অদ্ভুতভাবে তাহা প্রকাশ করিতেন। পুরুষের অত্যাচার বা প্রলোভনে বিপথগামিনী কোন নারীর ইতিহাস শুনিলেই তিনি বলিয়া উঠিতেন, চিত্রগুপ্তের পাপের খাতায় মনুর নামে একটা এন্ট্রি বাড়ল। রাস্তায় বিবাহের শোভাযাত্রা দেখিলেই বলিতেন, দাসী ক্রয় করিবার সময় এত আড়ম্বর কেন? স্বামীর কল্যাণের জন্য স্ত্রী ব্রত-উপবাসাদি করিতেছে শুনিলে তিনি বিষম চটিয়া যাইতেন ও বলিতেন, কি আত্মবিস্মৃতি ও আত্মবিলোপ! তর্ক জুড়িয়া দিতেন, যদি স্বামীর কল্যাণের জন্য স্ত্রী উপবাস করিলে ফল পাওয়া যায়, স্ত্রীর কল্যাণের জন্য স্বামীদের উপবাস করার ব্যবস্থা দেওয়া হয় নাই কেন? বিধবাদের বেশভূষা পরিত্যাগ করিবার কথা শুনিলে

নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিতেন, বিপত্নীক পুরুষ পত্নীবিয়োগের পর বেশভূষাদি পরিত্যাগ করে কি ? তর্কের সময় তাঁহার মুষ্টিপ্রহারে পেয়ালা সমেত টেবিল থরথর করিয়া কাঁপিয়াছে, আমরা তাঁহার কথার বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছি, তাঁহার সহিত তর্কে প্রত্যেকটি বিষয়ে আমরা হারিয়াছি, কিন্তু হারিয়া দুঃখ হয় নাই। আমরা ভাবিতাম, এই ত আমাদের শাস্ত্র-ব্যাখ্যাত 'শক্তি'। তিনি কাছে থাকাতে আমাদের প্রত্যেক আরগুমেণ্টে জোর বাড়িত, কলমে হুড়হুড় করিয়া লেখা আসিত এবং বিরুদ্ধ পক্ষের সমস্ত টিটকারি আমরা অম্লানমুখে সহ্য করিতাম। তিনি নিজেও চমৎকার গুছাইয়া লিখিতে পারিতেন।

আমাদের মধ্যে যাঁহারা বিবাহিত, তাঁহারা লীলা দেবীর আদর্শের নিত্য পরিচয় ও সঙ্গ লাভ করিয়া তাঁহাদের স্ত্রীদের 'প্রাচীনত্বে' ক্ষুণ্ণ হইতেন দেখিয়াছি। যাঁহারা অবিবাহিত, তাঁহারা লীলা দেবীর সমতুল্যা স্বাধীনা পত্নী না পাইলে বিবাহ করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। মোট কথা, আমরা কিছুদিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিলাম, আমাদের 'তরুণ-সঙ্ঘের' যত কিছু তরুণত্ব তাহা এই লীলা দেবীকে ঘিরিয়াই এবং তাঁহার সাহচর্য্য লইয়া ভবিষ্যতে আমাদের মধ্যেই যে ঈর্ষার মহামারী দেখা দিবে, তাহারও আঁচ পাওয়া যাইতেছিল।

লীলা দেবী বালিগঞ্জে তাঁহার পৈতৃক বাড়িতে বাস করিতেন। বৎসর কয়েক পূর্ব্বে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু স্বামীর সহিত মতের অমিল হওয়াতে তাঁহার সহিত বোঝাপড়া হইয়া গিয়াছে এবং এখন উভয়ে সর্ব্বভাবে স্বতন্ত্র, দেখাসাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করেন না। তিনি বলিতেন, বিবাহ একটা এক্সপেরিমেণ্ট মাত্র, তিনি তাঁহার পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হন নাই, কিন্তু তাহাতে দুঃখ করিবার কিছু নাই। তিনি ওই বিবাহের বন্ধন অস্বীকার করেন এবং প্রয়োজন হইলেই যথারীতি বিবাহচ্ছেদ করিতেও দ্বিধা করিবেন না।

মোটের উপর, তাঁহার মত আন্‌কন্‌ভেন্‌শ্যনাল প্রচলিত-সংস্কার-বিদ্রোহী রিভ্রনেবল নারী আমরা দেখি নাই। এমন কি আধুনিক পাশ্চাত্য উপন্যাসগুলির মধ্যেও তাঁহার মত অদ্ভুত চরিত্রের নারীর বর্ণনা পড়ি নাই।

এমন যে লীলা দেবী, যাঁহাকে লইয়া আমাদের কবিতা, যাঁহাকে ঘিরিয়া আমাদের আশা-আনন্দ নিত্য নব নব রূপ ধারণ করিত, যাঁহাকে আমরা ইটারর্নাল শি বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতাম, তিনিই যখন নির্ম্মমভাবে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রচলিত সংস্কারগুলি আঁকড়াইয়া ধরিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বড় সাধের সঙ্ঘটির ভিত্তি টলাইয়া দিয়া তাহাকে ভাঙিয়া চুরিয়া নিজের স্বামীর ঘরে অচলা হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন, তখন প্রাচীন শাস্ত্রকারগণের কথায় আমাদিগকে বলিতে হইল, স্ত্রীচরিত্র প্রণিধান করা স্বয়ং ব্রহ্মারও অসাধ্য।

লীলা দেবীর এই পরিবর্ত্তন সবচেয়ে বাজিল আমারই বুকে। জানি না আমার সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য কিন্তু তিনি আমাকে শুধু কম্‌রেডশিপ ছাড়া আরও কোন নিবিড় সম্পর্কের ভাবে দেখিতেন এবং ইহা লইয়া লীলাদেবীর অবর্ত্তমানে আমাদের তরুণদের মধ্যে অনেক হাস্যপরিহাসের সৃষ্টি হইয়াছে। আমি হাসিমুখেই সব স্বীকার করিয়াছি—কথাটার মধ্যে কিছু সত্য ছিল বলিয়াই। সকলে পরিহাস করিয়া আমাকে লীলাময় নামে ডাকিত। লীলা দেবীও এই হাস্যপরিহাসের কথা অবগত ছিলেন ও তাহাতে তাঁহার উজ্জ্বল চোখের কোণে একটু কৌতুকের হাসিও ফুটিয়া উঠিত। অচিরভবিষ্যতে আমাদের সম্পর্ক যে নিবিড়তর হইবে, ইহাতে আমার কিংবা আমাদের সঙ্ঘস্থ আর কাহারও সন্দেহমাত্র ছিল না। তাই লীলা দেবীর এই আকস্মিক ব্যবহারে সবচেয়ে ব্যথিত হইলাম আমি। আজ আমি আমার পরাজয়ের ইতিহাস নিজেই লিপিবদ্ধ করিতেছি। আমার জ্বালা এখন নাই কিন্তু বেদনায় আমার মন পীড়িত হইতেছে—আমি

এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিতে পারিতেছি না যে, এই ইতিহাস আমারই পরাজয়ের ইতিহাস।

এই গেল ভূমিকা। আসল ঘটনাটি এই—

আমাদের সঙ্ঘ দিনে দিনে নানাভাবে বর্দ্ধিতায়তন হইয়া বেশ একটুখানি প্রতিপত্তি লাভ করিল। কাগজের আয়ও নেহাৎ মন্দ হইতেছিল না। আমাদের নিত্যনিয়মিত সভা চায়ের পেয়ালার ঠনঠনানিতে আর ওজস্বিনী বক্তৃতার তোড়ে মুখরিত থাকিত। বস্তুত আমরা নানাভাবে 'অতরুণ'দের ঘুমের ব্যাঘাত জন্মাইতেছিলাম।

মাঝে মাঝে প্রায়ই কলিকাতার কাছাকাছি গঙ্গার ধারে কোনস্থানে আমরা আউটিঙে যাইতাম। কখন ব্যারাকপুর, কখন উত্তরপাড়া, কখনও বা চন্দননগর। একাদিক্রমে তিন-চারিদিন আমরা সঙ্ঘের 'তরুণ' কয়জন একত্র থাকিতাম; একসঙ্গে শোয়া ওঠা বসা গল্পকরা সবই চলিত। আমাদের মন হইত বাস্তব জগতের হিসাবনিকাশ লাভালাভ সম্পূর্ণ মুছিয়া যাইত। আমরা সেখানে 'নিরালম্ব'ভাবে বাস করিয়া নিশ্চিন্তমনে পরস্পরের সাহচর্য্য ও সাহিত্য-রস গ্রহণ করিতাম। তরুণীরাও দুই-একজন শ্রীমতী লীলা দেবীর নায়কত্বে আমাদের উৎসাহের খোরাক যোগাইতেন। আমাদের কেহ না কেহ প্রত্যহই কিছু লিখিয়া সেই বৈঠকে পাঠ করিত; সমালোচনায় তর্কে ও কৌতুকহাস্যে অর্দ্ধ-প্রবাস দিনগুলি সরস হইয়া উঠিত। এ সবেরও খরচ প্রায় লীলা দেবীই যোগাইতেন।

সেবার ফাল্গুন মাসে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির পাশের বাগানে আমাদের 'ক্যাম্প' পড়িল। বাগান-বাড়িটি আমাদের বন্ধু সুরেশ রায় সম্প্রতি কিনিয়াছে। আমরাই প্রথম তাহার উপস্বত্ব ভোগ করিতে গেলাম। তরুণেরা সকলেই ছিলাম। তরুণীদের মধ্যে—লীলা দেবী ও মাধুরী দেবী।

মাধুরী দেবী ব্যবহারে অতীব লজ্জাশীলা হইলেও কালিকলমে তিনি লীলা দেবীকেও ছাড়াইয়া যাইতেন। আমাদের পাঁচ-ইয়ারী উপন্যাসের

তিনিও একজন উৎসাহবতী লেখিকা। মোটের উপর আমাদের এবারকার পার্টিটি সর্ব্বপ্রকারে পূর্ব্বপূর্ব্বকার অপেক্ষা সরগরমতর হইয়া উঠিল—বুঝি বা প্রদীপের মতন নিবিবার পূর্ব্বে একটু অধিক উজ্জ্বল দেখাইল!

আমরা যখন দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিলাম, তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। দেবদারু আর ঝাউগাছের চূড়ায় চূড়ায় একটা একটানা ঝিরঝির শব্দ উঠিয়াছে। আমরা বোঁচকা-বুঁচকি বাগান-বাড়িতে চাকর উপেনের হেপাজতে রাখিয়া সকলে মিলিয়া বাহিরে গঙ্গার ধারে আসিয়া দাঁড়াইলাম। কলিকাতার কবিতা নির্ব্বাচন আর প্রূফসংশোধনের গ্লানি কাহার যেন পদ্মহস্ত-প্রলেপে ভুলিয়া গেলাম। মন সরস ও চঞ্চল হইয়া উঠিল। আমরা অনির্দ্দিষ্ট পথে গঙ্গার ধারে ধারে চলিতে শুরু করিলাম। মাধুরী দেবী ছাড়া প্রত্যেকের মুখেই গুনগুন গান ও বর্ম্মা চুরুট!

আমি ও লীলা একটু পিছাইয়া পড়িয়াছিলাম। লীলা বলিল, দেখ, আজ একটা ভারি সুখবর আছে। আমি বলিলাম, আবার কে কাকে চড় মারলে?

লীলা বলিল, দূর, তা কেন? কর্ত্তার সঙ্গীন অসুখ। আমি বলিলাম সুখবরটা কোথায়?

ন্যাকারাম সুখবর তোমার, বলিয়া লীলা হঠাৎ—'অনেকদিনের অনেক কথা ব্যাকুলতা বাঁধা বেদন-ডোরে—···মনের মাঝে উঠেছে আজ ভরে' গাহিতে গাহিতে পা চালাইয়া বড় দলের সঙ্গ ধরিল। আমি একটু শিহরিয়া উঠিয়া তাহার সঙ্গ লইলাম।

গণেশবাবু মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যথা কিসের লীলা দেবী?

লীলা দেবী কৌতুকহাস্তের সঙ্গে বলিয়া উঠিল, অনাহারের। আপনাদের কি হাওয়া খেয়েই আজ পেট ভরবে নাকি? সেই ভোর-বেলায় খেয়ে বেরিয়েছি, এখন কাব্য করলে তো চলবে না—খেতে হবে। আয় মাধুরী। বলিয়া সে মাধুরীর হাত ধরিয়া গট গট করিয়া বাগান-

বাড়ির দিকে রওনা হইল। আমরাও তাহাদের অনুসরণ করিলাম। উপেন ততক্ষণে 'ধুনি' জ্বালিয়াছে এবং চায়ের জল প্রায় ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে।

খাওয়াদাওয়ার যখন ডাক পড়িল, রাত্রি তখন এগারোটা। লীলা ও মাধুরী দেবী এতক্ষণ রান্নাঘরে উপেনের মাথা খাইতেছিলেন। চা-পানান্তে আমরাও এতক্ষণ জতুগৃহদাহনান্তে পাণ্ডবদের মত গাছতলায় এ উহার কোলে মাথা দিয়া শুইয়া শুইয়া আকাশের তারা গনিতেছিলাম। চমক ভাঙিল লীলা দেবীর ডাকে— কি গো মশাইরা, আপনাদের কোথা ডাকতে পাঠাব? এখন ভেনিসে, না স্থইজারল্যাণ্ডে? আমরা চটপট উঠিয়া পড়িয়া কোরাসে একখানি নারীবন্দনার গান ধরিলাম। লীলা দেবী দুহাত বাড়াইয়া বাধা দিয়া, ঢের হয়েছে, আর বন্দনা গাইতে হবে না, বরং রন্ধনের গুণগান করার চেষ্টা দেখুন, বলিয়া নাগেশ্বরগাছের বেদীর উপর কলাপাতা বিছাইতে লাগিলেন।

খাওয়াদাওয়ার পর সকলে মিলিয়া বাগানবাড়ির হলঘরে বিছানো শতরঞ্চির উপর আড্ডা গাড়িলাম। এইবার সাহিত্যচর্চ্চার পালা।

লীলা তাহার এটাচিকেস হইতে লাল রেশমী ফিতায় বাঁধা একখানি খাতা বাহির করিয়া পড়িতে শুরু করিল। এবারকার প্রবন্ধ ইংরেজীতে। বিষয়—"The marriage connection & need for divorce" অর্থাৎ বিবাহ-সংস্কার ও বিবাহচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা।

লীলা তাহার স্বাভাবিক তেজের সঙ্গে পড়িতে লাগিল। অন্যে কে কি বুঝিল জানি না কিন্তু লীলা কি বলিতেছে, আমি পরিষ্কার ঠাহর করিতে পারিলাম না।

আমার বুকের রক্ত নাচিতে লাগিল, মাথার মধ্যে ঝড় বহিতে লাগিল, আমি কেবল লীলার মুখ দেখিতে লাগিলাম, কথা শুনিতে পাইলাম না। সম্ভবত প্রচলিত বিবাহ-সংস্কারকে সে নাস্তানাবুদ করিয়া থাকিবে,

কারণ, মধ্যে মধ্যে তরুণেরা বাহবা দিতেছিল এবং প্রবন্ধপাঠান্তে সকলে সবেগে গিয়া সজোরে লীলার হাত ধরিয়া ঝাঁকানি দিতে লাগিল। আমি গুম হইয়া বসিয়া রহিলাম।

পরদিন যখন ঘুম ভাঙিল, আশেপাশে তাকাইয়া দেখিলাম—আর সকলেই উঠিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। আমিও চটপট উঠিয়া লীলার খোঁজে বাহির হইলাম। কিন্তু তন্ন তন্ন করিয়া বাগান বাড়ি অনুসন্ধান করিয়া ও গঙ্গার ধারে ঘুরিয়া ফিরিয়াও তাহার খোঁজ পাইলাম না। সকলেরই মুখে এক প্রশ্ন, লীলা দেবী কোথায় অন্তর্দ্ধান করিলেন?

সুরেশ একটু পরিহাস করিয়া বলিল, কালকের বক্তৃতা হয়তো কাজে খাটাবার জন্য কলকাতা গেছেন। বলিয়াই আমার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া হাসিয়া উঠিল। কিন্তু প্রত্যুত্তরে হাসিবার অবস্থা আমার তখন নয়।

মাধুরী নিশ্চিন্ত মনে বালজাকের 'ড্রোল স্টোরিজ' পড়িতেছিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সেও লীলার খোঁজ জানে না।

বেলা এগারোটা পর্য্যন্ত লীলার কোন খোঁজই পাওয়া গেল না। কালিকার সেই বক্তৃতার পর আমার মতামতের জন্য অপেক্ষা না করিয়া সে ডুব মারিল ভাবিয়া অভিমানে আমি ব্যথিত হইয়া উঠিলাম।

এগারোটার পর সে ফিরিয়া আসিল। তখন মাধুরী পড়া সাঙ্গ করিয়া ঘুমাইতেছিল এবং বাকি সকলে ঝিমাইতেছিল। সে আসিয়াই ঘুম হইতে মাধুরীকে টানিয়া তুলিয়া গামছা কাঁধে লইয়া আমাদের সকলকে শুনাইয়া বলিল, উপেন, আমার ভাত বেড়ে রাখ, আমি ততক্ষণ একটা ডুব দিয়ে আসি। বলিয়াই সে যাইতে উদ্যত হইল। তাহার দিকে চাহিয়া আমার চক্ষু জ্বালা করিয়া আসিল, আমি মুখ ফিরাইয়া লইয়া নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলাম। গণেশবাবু ছুটিয়া আসিয়া লীলার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা

করিলেন, ব্যাপার কি বলুন তো? গিয়েছিলেন কোথায়? লীলা বলিল, রোগী ঘেঁটে এসেছি, চান ক'রে এসে বলছি।

হায় নারী, তোমরা লোভ দেখাইয়া সুখের সপ্তম স্বর্গে চড়াইয়া দিয়া কখন যে অলক্ষ্যে মই কাড়িয়া লও, তোমরাই জান, কিন্তু যাহারা শূন্যে ঝুলিতে থাকে তাহাদের দুরবস্থার কথা তো ভাব না! আমি আজ হাড়ে হাড়ে তাহা উপলব্ধি করিতেছি। কিন্তু এমন করিবার তো কোনও প্রয়োজন ছিল না!

আমরা সকলেই দৃঢ়নিশ্চয় হইলাম যে, সে যেমন করিয়াই হউক ভোরে উঠিয়া কলিকাতায় গিয়া স্বামীর সেবা করিয়া আসিল। কিন্তু ঘটনাটা এমনই অসম্ভব যে, আমরা মনে মনে সকলেই এই সত্যটা স্বীকার করিয়া লইলেও প্রকাশ্যে কেহ কিছু বলিতে সাহস করিলাম না।

লীলা স্নান করিয়া এলোচুলে লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া রোদের দিকে পিঠ করিয়া খাইতে বসিল। মাধুরীকে আমাদের সঙ্গে খাইতে বলিল। তারপর আমাদের সকলকে কাছে ডাকিয়া বলিল, আপনাদের মধ্যে একটা গুমট দেখা যাচ্ছে। আপনারা যা আঁচ করেছেন তা কিন্তু সত্যি নয়—আমি আপনাদের একশো হাতের মধ্যেই ছিলাম। ভোরে গঙ্গার ধারে বেড়াতে বেড়াতে আপনাদের একটি 'সাবিত্রী'র সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল, সে তার পতি-দেবতাকে নিয়ে বড়ই বিব্রত হয়ে পড়েছে—তার সঙ্গে গিয়ে তার পীড়িত স্বামীর সেবা করছিলাম এতক্ষণ। আবার এক্ষুনি যেতে হবে।

আমি তাহার কথা শুনিতে পাইতেছিলাম বটে, কিন্তু তাহার কাছে যাই নাই। সে আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আপনি কি যোগসাধনে রত আছেন? এখানে এলে আপনার তপোভঙ্গ হবে না বোধ হয়। অন্যের উপস্থিতিতে লীলা আমাকে 'আপনি' বলিত।

তারপর সে সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আপনারা আশ্চর্য্য হচ্ছেন,

যে নিজের স্বামীকে এমন ক'রে ছেড়ে চ'লে এল, সেই আবার পরের স্বামীকে সেবা করবার জন্যে এত ছুটোছুটি করে কেন ? এ 'কেন'র উত্তর আমি সন্ধ্যেবেলায় এসে দেব এবং আরও এমন সব খবর দেব যাতে সংস্কারের চাপে মানুষকে কতখানা বঞ্চিত ও অসহায় ক'রে তোলা যায়, তা ভাল ক'রেই বুঝতে পারবেন। রাধারাণীর ইতিহাস বড় প্যাথেটিক—আমি যাই, আমি না গেলে হয়তো বেচারার আজ খাওয়াই হবে না।

লীলা যাইবার সময় আমার কাছে সরিয়া আসিয়া আস্তে আস্তে বলিয়া গেল, ভয় পেও না—সন্ধ্যেবেলায় সব খবর দেব। ছোঁয়াচে রোগ নয়।

আমার জ্বালা তখন অনেকটা কমিয়াছে। রাধারাণীর গল্প শুনিবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিলাম। এক লীলার খেয়ালে এবারকার পরিপূর্ণ সম্ভারের মধ্যেও তরুণ-সঙ্ঘ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। যে যাহার সুবিধা করিয়া লইয়া সময় কাটাইতে লাগিলাম। আড্ডা মোটে জমিল না।

সন্ধ্যার অনেক পরে লীলা ফিরিয়া আসিল। মুখ হাত পা ধুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া হলঘরে একটা তাকিয়া টানিয়া লইয়া উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল এবং গণেশবাবুকে কহিল, সকলকে ডাকুন, আমি আমার এই অদ্ভুত ব্যবহারের কৈফিয়ৎ দেব।

গণেশবাবু একটু ক্ষুণ্ণস্বরে বলিলেন, তার কি কিছু প্রয়োজন ছিল ? তার চাইতে আসুন বিমানের লেখাটা শোনা যাক—সে বেচারী শোনাবার জন্যে ছটফট করছে।

লীলা খানিকক্ষণ কি যেন ভাবিল, তারপর বলিল বেশ, তাই হোক।

গণেশবাবু যাহাই বলুন, আমরা কিন্তু লীলার কথা শুনিবার জন্যই উদ্‌গ্রীব ছিলাম। অন্য সকলে তারস্বরে প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া উঠিল, আগে রাধারাণী সম্বন্ধে গল্পটা শোনা যাক। লীলা মানিল না, কিন্তু প্রতিশ্রুত হইল, বিমানবাবুর প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইলে সে রাধারাণীর ইতিহাস সকলকে শুনাইবে।

বিমানবাবু উৎসাহের সহিত তাঁহার প্রবন্ধপাঠ করিলেন, কিন্তু সভা জমিল না। সকলের হাই উঠিতে লাগিল। দুই-একজনের মৃদু নাসিকাধ্বনিও শ্রুত হইল।

অনেক রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর কিছুক্ষণ বেদীর উপর সকলে মিলিয়া বসা গেল। তারপর যে যাহার সুবিধামত ঠাঁই খুঁজিয়া লইয়া শয়নের চেষ্টা করিল।

বিক্ষিপ্ত মন লইয়া ঘুমাইতে পারিলাম না। আস্তে আস্তে দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার বান ডাকিয়াছে—দূরে গঙ্গার বুকে জ্যোৎস্নাধারা কেমন একটা মোহময় স্বপ্নের সৃষ্টি করিতেছিল। আমি নদীর কিনারায় আসিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিলাম।

ঠাণ্ডা হাওয়া লাগাতে কেমন যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। কাহার পায়ের শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল। দেখিলাম, একটী নারীমূর্তি—বাগান-বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গঙ্গার ধারে ধারে উত্তরমুখে চলিয়াছে।

মনে হইল যেন লীলা। 'লীলা' বলিয়া ডাকিলাম। লীলাই বটে। একটু চমকাইয়া সে কাছে আসিল। বলিল, তুমি! ঘুমোও নি কেন?

আমি বলিলাম, অভিসারিকার অভিসার দেখবার জন্যে। এই রাত্রি একটার সময় চোরের মত কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি। তোমার মাথার ঠিক আছে তো?

লীলা বলিল, চোরের মতই বটে! আমার লজ্জা করছে। তুমি শুনলে হাসবে, কিন্তু আমি সেই মেয়েটির স্বামীর সেবা করতে চলেছি। মেয়েটি বড় দুর্ভাগা।

কিন্তু অমন সহস্র সহস্র দুর্ভাগা স্ত্রীপুরুষ পথে ঘাটে কেঁদে ফিরছে, এতদিন তো এ অনুকম্পা দেখি নি লীলা, আজ হঠাৎ কি হ'ল?

লীলা আগ্রহভরে আমার হাত ধরিয়া বলিল, শুনবে তবে, ব'স।

আমিও তোমাকে বলবার জন্যে ছটফট করছি। আমাকে কিন্তু এখনই যেতে হবে, রাত দুটো থেকে আমার ডিউটি।

আমার হাসি পাইল। কোথাকার কে তাহার ঠিক নাই, ইহারই মধ্যে ডিউটিও ভাগ করা হইয়াছে, আর "তরুণ-সঙ্ঘের" লীলা, সসঙ্কোচে সকলকে লুকাইয়া সেই ডিউটি করিতে যাইতেছে! লীলাবৈচিত্র্য আর কাহাকে বলে!

রাস্তা ছাড়িয়া বাগানের মধ্যে বেদীতে আসিয়া বসিলাম। লীলা প্রথমটা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিতে লাগিল, আমি হয়তো সমস্ত ব্যাপারটা তোমাকে বোঝাতে পারব না, কারণ ঘটনার মধ্যে অসম্ভব এমন কিছু নেই, যা আমার এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে পারে। আমি মনের মধ্যে কেমন একটা অসোয়াস্তি অনুভব করছি। আমার সময় অল্প, খুব সংক্ষেপেই বলছি।

আজ খুব ভোরে উঠে বাইরে বেড়াতে বেড়াতে গঙ্গার ধারে গিয়ে পড়লাম। মনে কেমন একটা এক্স্ট্যাসির (উল্লাসের) ভাব ছিল—তোমাকে সঙ্গে নেবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তোমরা সবাই তখন ঘুমুচ্ছ। বেড়াতে বেড়াতে খানিকটে গিয়ে দেখি রাস্তার উপর একটি ছোট্ট ছেলে কাঁদছে। অবাক হয়ে কাছে যেতেই দেখি, গঙ্গার ঘাটে একটি মেয়ে চান করে উঠে কাপড় ছাড়ছে ও সেখান থেকেই ছেলেটিকে ভুলোবার চেষ্টা করছে। আমি ছেলেটিকে কোলে তুলে নিতেই সে চুপ করল। মেয়েটি তাড়াতাড়ি এসে হাত বাড়িয়ে ছেলেটিকে নিয়ে বললে, দিদি, তোমার কাছে গিয়ে তো ও বেশ চুপ করল! আমি বললাম, এত ভোরে ছেলেকে নদীর ধারে এমন ক'রে বসিয়ে রেখে চান করাটা তার ভাল হয় নি। সে বললে, কি করব দিদি, একলা মানুষ—ওর বাবার খুব অসুখ, আমি এখানে কালী-বাড়িতে পূজো দিতে এসেছি। আজকে মাকালীর কাছে ধন্না দেব, তাই সকাল সকাল চান সেরে নিলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম,

তাঁর কি অসুখ? সে বললে, একজ্বরী,—কালাজ্বর না কি ডাক্তারে বলেছে। আমার বুড়ী শাশুড়ী আর ওঁকে নিয়েই এখানে এসেছি। দেখি মা-কালী দয়া করেন কি না! আমি বললাম, আজকাল মা-কালীরা অমনই অমনই দয়া করেন না, পয়সা খরচ ক'রে ডাক্তার দেখালে তবে তাঁদের কৃপা হয়।

সে বললে, তার কি কসুর করেছি দিদি, একচল্লিশ দিন ওঁকে নিয়ে কি ভোগটাই না ভুগলাম! পোড়া ডাক্তারদের আর আমার বিশ্বাস হয় না। ঠাকুর-দেবতাতে ভক্তি হারিয়েছি, নইলে কোন্ কালে মায়ের কাছে ধন্না দিয়ে যেতাম।—ব'লে সে কালী-বাড়ির দিকে চেয়ে একটা প্রণাম ক'রে আস্তে আস্তে চলতে লাগল।

আমি তখন ভাবছিলাম—অন্ধ সংস্কারের বশে মানুষ কতদূর যেতে পারে! আর আশ্চর্য্য হচ্ছিলাম ওই ছোট্ট মেয়েটির অপূর্ব্ব নিষ্ঠা দেখে। অম্লান মুখে পরিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে সে চলেছে—এতটুকু দ্বিধা নেই, সঙ্কোচ নেই!—মা-কালীর কাছে ধন্না দিয়ে স্বামীকে তার সে ভাল করবে।

তার সঙ্গে গল্প করতে করতে তাদের বাড়ি পর্য্যন্ত পৌঁছলাম। একখানি জীর্ণ ঘর—চালা বললেই হয়, সামনে কঞ্চি দিয়ে ঘেরা একটু বাগানের মত, তাতে কতকগুলো শুকনো বেগুনগাছ।

রাধারাণী তাড়াতাড়ি দাওয়ায় একটা মাদুর বিছিয়ে বললে, ব'স দিদি, আমি মাকে ডেকে আনছি, আমাকে এখুনি কালী-বাড়ি যেতে হবে কিনা।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, রোগীর ঘরে যেতে কোন বাধা আছে কি! সে উত্তর করলে, বাধা আর কি থাকবে দিদি, বেহ্মজ্ঞানী যে খ্রীশ্চান নয়।

আমি যে 'বেহ্মজ্ঞানী' তা এরই মধ্যে সে স্থির ক'রে নি-

নেবারই কথা! এত বড় মেয়ে, মাথায় সিঁদুরের লেশ

চওড়া পেড়ে দামী শাড়ি প'রে আছি, হাতে চুড়ি, গলায় নেকলেশও আছে—একি আর 'বেহ্মজ্ঞানী' না হয়ে যায়!

ঘরের ভিতর গিয়ে যা দৃশ্য দেখলাম! একটি জীর্ণ তক্তপোশের উপর ধবধবে একটি বিছানা পাতা—তার উপর রোগী একেবারে বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে গেছে, আর তারই শিয়রে একটি মরণাপন্না বুড়ী তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। রোগী তন্দ্রাচ্ছন্ন, বুড়ীও প্রায় তাই।

পায়ের শব্দে চমকে উঠে বুড়ী ব'লে উঠল, এলে মা! এখন বুঝি সেই ওষুধটা খাওয়াবার সময় হ'ল। আমার দিকে নজর পড়তেই খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে, তুমি কে মা? আমি বললাম, এই পাশের বাড়িতে আমরা দিন কয়েকের জন্যে এসেছি—রাধারাণীর সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে আলাপ হতেই আপনাদের দেখতে এলাম।

আমার কেমন যেন লজ্জা করতে লাগল, বুক ফুলিয়ে বলতে পারলাম না যে, আমি 'তরুণ-সঙ্ঘে'র লীলা দেবী, আউটিঙে বেরিয়েছি।

রাধারাণী ততক্ষণে ভিজে কাপড় মেলে দিয়ে স্বামীর কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে তার কপালে হাত দিয়ে দেখে আমাকে চুপি চুপি বললে, বাইরে চল দিদি, ছেলেটাকে একটু ধরবে, আমি ততক্ষণে একটা গরদের কাপড় প'রে নি,—মা কালী যখন তোমায় জুটিয়ে দিয়েছেন তখন আর তোমাকে ছাড়ছি না—আমি কালী-বাড়ি থেকে ফিরে না আসা পর্য্যন্ত তোমাকে খোকাকে নিয়ে থাকতে হবে আর এঁদের দেখতে হবে।

আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম, এত সহজে মেয়েটি মাত্র আধ ঘণ্টায় পরিচিত লোককে এমন ভার দেয় কি ক'রে! আমার কিন্তু চ্ছিল না—অবাক হচ্ছিলাম মাত্র।

খোকাকে নিয়ে বাইরে বসলাম। রাধারাণী যাবার সময় ব'লে ...ব এসে ভাতে ভাত রাঁধবে, আমাকেও সেখানে চাট্টি খেতে ...ভা হয় না, আমার সঙ্গে লোক আছে, আমি না

গেলে তাঁরা ভাববেন। রাধারাণী লজ্জিত হয়ে ফিরে বলে উঠল, ওই যা, আমি এমনই স্বার্থপর দিদি, তোমার সঙ্গে দেখা হওয়া ইস্তক নিজের কথাই খালি বলছি। তোমার কথা কিছু শোনা হয় নি, এসে শুনব। বলে সে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল।

ছ ঘণ্টা একটানা রাধারাণীর সংসারের নানা কাজের ভিতর দিয়ে কাটিয়ে দিলাম—অনভ্যাসের দরুন এতটুকুও কষ্ট পেতে হ'ল না। তার শাশুড়ীর সঙ্গে কথা ক'য়ে রাধারাণীর কথা যা শুনলাম তা এই—আজ পাঁচ বছর হ'ল রাধারাণীর বিয়ে হয়েছে, বিয়ের সময় ও বারো বছরের ছোট্ট মেয়েটি ছিল; কিন্তু এ সংসারে এসে অবধি সে যে খাটুনি আরম্ভ করেছে আজ পর্য্যন্ত একটি দিনের জন্যেও রেহাই পায় নি। অবস্থা খুব খারাপ—নিজেকেই রান্নাবান্না থেকে সংসারের সব কিছু করতে হয়—যায় সংসারখরচের পয়সা-কড়ির কথাও এই সংসারে ঢোকা অবধি ওকেই ভাবতে হয়েছে। এত খাটুনির মধ্যেও যে ওর মনের সুখ ছিল তা নয়, স্বামীর ভালবাসা ও একটি দিনও পায় নি—স্বামী ওকে দুচক্ষে দেখতে পারত না। কি সম্পত্তি যে ওর স্বামী পেয়েছে, এই অসুখটার আগে পর্য্যন্ত হতভাগা কখন টের পায় নি। ওর পেটে এই ছেলেটা হওয়ার পর অত্যাচারের মাত্রা যেন আরও বেড়ে উঠেছিল। ধন্যি মেয়ে কিন্তু রাধারাণী, সব হাসিমুখে সহ্য ক'রে এসেছে। বুড়ী শাশুড়ীকে ফেলে একটি দিনের জন্যেও বাপের বাড়ি যেতে চায়নি অথচ বাপ তার বড়লোক এবং নিতেও এসেছে অনেকবার। চরিত্রহীন স্বামী মদ ধরলে যা হয় অবশেষে তাও হ'ল—রাধারাণীর উপর মারধোর পর্য্যন্ত চলতে লাগল, স্ত্রী গায়ের গহনা কেড়ে নিয়ে মদের আর মেয়ে-মানুষের খরচ যোগাতে লাগল। শাশুড়ীরও মনের জ্বালা কম ছিল না—রাধারাণীর দুঃখ দেখে সেও নীরবে কাঁদত, কান্না ছাড়া বুড়ীর করবার আর কিছু ছিল না। রাধারাণীকে বাপের বাড়ি যাবার জন্যে সেও নিজে অনেক-বার অনুরোধ করেছে, কিন্তু রাধারাণী বারে বারে একই উত্তর দিয়েছে—

নিজের সংসারের দুরবস্থার কথা পরকে বলতে যাব কেন মা? স্বামীর কল্যাণের জন্যে ব্রত-উপবাসও যে সে কত করেছে তার ঠিক নেই। স্বামী এক পয়সাও ঘরে দিত না, কিন্তু রাধারাণী যে কি কষ্টে এই সংসারের খরচ যোগাত তা পরমেশ্বরই জানেন, অথচ বাপের কাছে সে একটি দিনের জন্যেও হাত পাতে নি। ঘরের উঠোনে দুটোচারটে শাক-পাতাড়ির গাছ—আর রাধারাণীর হাতের সেলাই করা দু-চারটে কাজ—এই ছিল জীবিকা অর্জ্জনের একমাত্র উপায়। এমনই সময় তার স্বামী কি একটা মামলায় প'ড়ে ফেরার হয়ে যায়—সে সময় রাধারাণী নিজে পেটে না খেয়ে শাশুড়ীকে খাইয়েছে, ছেলে মানুষ করেছে। খাওয়ার কথা বললে ব্রত উপবাসের ওজর দেখিয়েছে, কিন্তু এততেও সে ধৈর্য্যহীনা হয় নি কোনদিনই—ভগবানের উপর বিশ্বাস হারায় নি একটি দিনও।

মাত্র মাস দেড়েক হ'ল স্বামী তার ফিরে এসেছে এই রোগাক্রান্ত দেহ নিয়ে। রাধারাণীরও খাটুনির অন্ত নেই—যমের সঙ্গে সে অনিদ্রায় অনাহারে লড়াই ক'রে আসছে সেদিন থেকে।

আমি এই ছোট্ট ইতিহাসটুকু শুনে স্তম্ভিত হলাম। এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন কচি মেয়েটির উদ্দেশে সভক্তি প্রণাম জানিয়ে ওকে গুরু ব'লে মেনে নিলাম। দেখলাম এই অত্যাচারী অপদার্থ স্বামীই ওর দেবতা, স্বামীর ঘরই ওর তীর্থস্থান, স্বামী-সেবাই তার ইহকাল পরকাল। এইজন্যেই ও শান্তি পেয়েছে, স্বাধীনতার কথা ভাবে নি।

মনে মনে ঠিক ক'রে নিলাম যতটা পারি এই সৌভাগ্যবতীর সাহায্য করব। আমরা মুখে যতই বাহাদুরি করি, কিন্তু মনে যে সব্বাই ওই রাধারাণীর ধাতুতেই তৈরি! আমার স্বামীর কথাও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কতবার কত রকম করে জিজ্ঞেসা করেছে, তোমায় সত্যি বলছি, আমার লজ্জা হয়েছে, রাগ হয় নি। হয়তো মনে মনে একটু সুখও হয়েছে! আপাতত তোমরা আমার জন্যে ব্যস্ত হয়ো না। তোমাদের আসর পুরোমাত্রায়

জমিয়ে রেখে তোমরা কলকাতায় ফিরে যাও, আমি এদের একটা ব্যবস্থা না করে যেতে পারব না।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই লীলা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং উত্তরমুখে চলিতে আরম্ভ করিল। আমি নিঃশব্দে তাহার সঙ্গে গিয়া রাধারাণীদের বাড়ি পর্য্যন্ত তাহাকে আগাইয়া দিয়া আসিলাম, পথে একটিও কথা হইল না।

তারপর সব গোলমাল হইয়া গেল। 'তরুণ-সঙ্ঘ' ক্ষুণ্নমনে পরদিন সকালে কলিকাতা ফিরিল। লীলার এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনের কারণ আমি ছাড়া আর কেহ জানিল না। কেহ বলিল, খেয়াল, কেহ বলিল, বাড়াবাড়ি। আমি কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

মাস খানেক লীলার বিশেষ কোন খবর পাইলাম না। শুনিলাম, সে তাহার রুগ্ন স্বামীকে লইয়া দার্জ্জিলিং গিয়াছে। শুনিয়া সুখী হইলাম, কিন্তু মনের খোঁচা মরিল না।

একদিন হঠাৎ লীলার কাছ হইতে নিমন্ত্রণ-পত্র পাইলাম। 'তরুণ-সঙ্ঘে'র তরফ হইতে সে নিমন্ত্রণ করিয়াছে, তাহার স্বামীর গৃহে সে 'তরুণ-সঙ্ঘ'কে একটি ভোজ দিতেছে।

যাইব, না, যাইব না—করিয়া সকলেই গেলাম। লীলার স্বামীর সঙ্গে পরিচয় হইল। সেখানে রাধারাণীকেও দেখিলাম—ঘোমটা টানা ছোট্ট মেয়েটি। সে নিজেই হয়তো জানে না কি অঘটন সে ঘটাইয়াছে! সেদিন সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়া ফিরিলাম।

'তরুণ' কাগজটি চলিতেছে, কিন্তু 'তরুণ-সঙ্ঘ' ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। লীলা দেবী অন্তঃপুরে ডুব মারিয়াছেন—তাঁহার কথা আর শোনা যায় না। 'তরুণ সঙ্ঘে'র সদস্যদের অবস্থা এমন হইয়াছে যে, শীঘ্রই সঙ্ঘটি প্রত্নতত্ত্বের বিষয় হইয়া দাঁড়াইবে বলিয়া মনে হয়।

ভাই-বোন

রাস্তায় ভারি একটা গোলোযোগ শোনা গেল। রাস্তার দুই ধারে পথিক ও দোকানদারেরা সমবেত কণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—'গেল গেল'—'সর্ব্বনাশ হ'ল।' ব্যাপার কি? একটি বছর ছয়-সাতের ছেলে রাস্তায় ছুটাছুটি করিতে করিতে চলন্ত ট্রামের সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। আর এক মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার কচি দেহ ট্রামের চাকার নীচে ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইত; কিন্তু ট্রামের চালক খুব হুঁসিয়ার। বিদ্যুৎগতিতে প্রাণপণ বলে সে ব্রেক কষিল। গাড়িসুদ্ধ লোককে একটা ঝাঁকানি দিয়া সেই ছেলেটিকে গ্রাস করিবার পূর্ব্বেই ট্রাম থামিয়া গেল। রাস্তার লোকেরা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। বিমূঢ় বালককে ঘিরিয়া তখন উল্লাস, বকুনি ও হা-হুতাশের ঘটা পড়িয়া গেল। বালক তাহার চতুর্দ্দিকের জনতা দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। এমন সময় আলুথালু ভাবে ভিড় ঠেলিয়া একটি নয়-দশ বৎসরের বালিকা বালকটির কাছে আসিয়া তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কাপড়ের খুঁটে তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিতে লাগিল। ভিড়ের মধ্য হইতে কে একজন প্রশ্ন করিল, ও কে খুকী, অমন ক'রে কি রাস্তায় ওকে ছেড়ে দেয়, আর একটু হইলেই ও যে যেত! বালকটিকে এ ভাবে অপদস্থ হইতে দেখিয়া খুকী তখন ক্ষেপিয়া গিয়াছে, রোষকষায়িত দৃষ্টি তুলিয়া সে তীব্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, তোমরা ওকে অমন করছ কেন? রাস্তা ছেড়ে দাও, আমরা বাড়ি যাই। বালিকা ছেলেটির দিদি। জনতা দিদিমণির এই হাস্যকর দাবিতে হাসিয়া উঠিয়া ভিড় ছাড়িয়া দিল। ভাইয়ের হাত ধরিয়া দিদি সগর্ব্বে চলিয়া গেল। বাড়ির সামনে আসিয়াই ভাইয়ের অতিক্রান্ত ফাঁড়াটার কথা স্মরণ করিয়া সে শিহরিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ভাইকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, দুষ্টু ছেলে! অমন ক'রে কি রাস্তায় যেতে আছে! ভাই-বোনে কান্নার পালা শেষ করিয়া বাড়ি ঢুকিল।

অনেক বছর পরের কথা। রাস্তার সেই বালক এখন বিলাত-ফেরত ডাক্তার, মেডিকেল কলেজের হাউস-সার্জন! চিকিৎসা-বিভাগে তাহার প্রতিষ্ঠা শুরু হইয়াছে, সমাজেও তাহার যথেষ্ট খাতির। মেডিকেল কলেজের মধ্যেই সে কোয়ার্টার্স পাইয়াছে। সদ্যবিবাহিত পত্নী লইয়া সে সেখানে বাস করে। বিশেষ করিয়া এই বিবাহ সম্পর্কে অপূর্ব্বকুমারের প্রতিষ্ঠা সমাজে অনেকখানি বৃদ্ধি পাইয়াছে। অপূর্ব্বকুমারের স্ত্রী লতিকার পিতা ব্রাহ্ম সমাজের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি—ধনে মানে শিক্ষায় ব্যবহারে।

ছেলেটির সেই বালিকা দিদি মাধুরী দরিদ্র স্বামীকে বিবাহ করিয়া কলিকাতার এক দরিদ্র পল্লীতে আপনার ক্ষুদ্র সংসার লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। সংসার বলিতে স্বামী বীরেন্দ্রনাথ ও একটি শিশুকন্যা। ভ্রাতার বিদেশে অবস্থানকালে বীরেন্দ্রনাথের সহিত মাধুরীর সবিশেষ পরিচয় হয় এবং একদিন পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন সকলের অমতে সম্পূর্ণ নিজের প্রবল ইচ্ছার জোরে সে বীরেন্দ্রকে বিবাহ করে। বীরেন্দ্র ধনে মানে মাধুরীদের পরিবারের সমকক্ষ না হইলেও লোকটি চমৎকার। মাধুরী ও অপূর্ব্বর বড়দিদি অনুপমা কেবলমাত্র এই বিবাহের পক্ষে ছিল। অনুপমার নিজের বিবাহ কোন বড় ঘরে হইলেও ছোট বোনের এই প্রেমকে সে স্নেহের চক্ষেই দেখিয়াছিল, এবং পিতামাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও ঘটা করিয়া বোনের বিবাহ দেওয়াইয়াছিল। পিতামাতার এই অপ্রীতি ও তাচ্ছিল্য মাধুরীকে বড় পীড়া দিতেছিল। তাই বিবাহের পরে সে পিতৃ-গৃহে বড় একটা আসিত না। স্বামী স্বভাবসুলভ ভালমানুষিতে মাঝে মাঝে শ্বশুরালয়ে দেখা দিলেও, শেষে মাধুরীর পীড়াপীড়িতে সেও আসা-যাওয়া ত্যাগ করিয়াছিল। সত্যই তো! যাঁহারা আজিও তাহাকে উপেক্ষা

করিতে ছাড়েন না, তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ রাখাটা নিজের দিক দিয়া যাহাই হউক, স্ত্রীর পক্ষে তাহা যথেষ্টই ক্লেশকর, সন্দেহ নাই। পিতামাতার ও কন্যার মাঝে অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই অভিমানের এক পরদা পড়িয়াছিল।

বীরেন্দ্র স্কুলে মাস্টারি করিয়া যৎসামান্য রোজগার করিত, তাহাতে বাসা ভাড়া দিয়া কলিকাতায় বাস করা তাহার পক্ষে দুরূহ ছিল। সুতরাং তাহাকে সকালে বিকালে টিউশনি করিতে হইত। মাধুরীও পিতৃ-গৃহবাসের সকল স্মৃতি বিসর্জ্জন দিয়া দারিদ্র্য-দুঃখ বরণ করিতে দ্বিধা করে নাই। নিজেই সংসারের সকল কাজ করিত। পিতামাতার উপর অভিমান-বশে সে গোপনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াই ক্ষান্ত হইত, স্বামীর নিকট কখনও পিতৃগৃহের উল্লেখ করিয়া সে কোনও কথা বলিত না।

মাধুরীর বিশ্বাস ছিল, অপূর্ব্ব ফিরিয়া আসিয়া দিদিকে উপেক্ষা করিতে পারিবে না, দুই বোনের একটি মাত্র ছোট ভাই, অত্যন্ত স্নেহের সামগ্রী। কিন্তু সেই ভাই দেশে ফিরিয়া বোনের দারিদ্র্য ও স্বামী-নির্ব্বাচনের ভুলটা ভুলিতে পারিল না। দেশে ফিরিয়া সেই যে সে ঘণ্টা খানেকের জন্য তাহার সংসারে পদার্পণ করিয়াছিল, আজ পর্য্যন্ত আর সে দিদির খোঁজ লওয়ার প্রয়োজন অনুভব করে নাই। দিদি অনুপমা তবু মাঝে মাঝে আসিয়া তাহার বড় আদরের ভগিনী ও তাহার কন্যাকে এক-আধটু আদর দেখাইয়া যাইত।

এরূপ সম্বন্ধটা অস্বাভাবিক সন্দেহ নাই, কিন্তু এরূপ ব্যাপারই ঘটিয়াছিল। পিতামাতার উপেক্ষা মাধুরী সহিয়াছিল; কিন্তু ভ্রাতার এই তাচ্ছিল্য তাহাকে বড় বাজিল। তাহার অশ্রুজল বারণ মানে নাই। মাধুরীর মন ক্রমশ কঠিন হইয়া আসিতেছিল। সে দিনে দিনে আপনার স্বামী-সন্তানকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আপনার সংসারেই ডুবিয়া রহিল।

অপূর্ব্ব বিদেশে থাকিতে দিদির মতিচ্ছন্নতার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য ও বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার দিদি! এ কি করিয়া বসিল!

বীরেনকে সে যে চিরদিন 'ন্যাকা' 'কাপুরুষ' ইত্যাদি আখ্যা দিয়া অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছে—আর তাহাকেই কিনা বিবাহ করিল তাহার ছোটদি—যাহার রুচির উপর তাহার একটা গভীর আস্থা ছিল! দেশে ফিরিয়া সে সর্ব্বপ্রথমেই বড়দিকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করিল—এ কি ক'রে সম্ভব হ'ল দিদি? অনুপমা শান্তভাবে বলিল, ওরে, বীরেনকে মাধু বড্ড ভালবাসে! বাস, এক কথায় সমস্যার মীমাংসা হইয়া গেল। কিন্তু অপূর্ব্বের মনের গ্লানি কাটিল না। এই হীন সম্বন্ধের লজ্জা মাধুরী অনুভব না করিলেও অপূর্ব্বর সর্ব্বাঙ্গ যেন এই লজ্জায় সঙ্কুচিত হইল। লোকের কাছে সে এই ভগ্নীপতিকে স্বীকার করিবে কি করিয়া!

অপূর্ব্ব এক দিন মাধুরীর বাসায় গিয়া তাহার কর্ত্তব্য শেষ করিয়া আসিল। দীর্ঘ চার বৎসর পরে ভাই-বোনে দেখা; কিন্তু কি যেন একটা ব্যবধান উভয়ে অনুভব করিল; ভাই-বোনের মিলনালাপ তেমন জমিল না। তারপর অপূর্ব্ব তাহার বাক্‌দত্তা পত্নীর পিছনে ছুটাছুটি করিয়া এক দিন শুভলগ্নে তাহাকে বিবাহ করিয়া নবোঢ়া পত্নীকে লইয়া মশ্‌গুল হইয়া গেল। বিবাহে আর পাঁচজনে যেমন আসে, মাধুরীও তেমনই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছিল; কিন্তু বাড়ি ফিরিয়া পিতা-মাতা ভাইয়ের উপর অভিমানে সে যে কি কান্নাটাই কাঁদিয়াছিল, তাহার ইতিহাস অন্তর্য্যামী ছাড়া কেহ জানে নাই।

ইহার কিছুদিন পরেই অপূর্ব্ব মেডিকেল কলেজে চাকরি পাইল, এবং তারপর একদিন সে পত্নী লতিকাকে লইয়া তাহার কোয়ার্টার্সে উঠিয়া গেল।

মানুষ নিজের ভাগ্যকে অতিক্রম করিয়া চলিতে পারে না। মাধুরী, অপূর্ব্ব ও অনুপমা আপন আপন ভাগ্য বহন করিয়া সংসারে চলিতে লাগিল। দরিদ্র মাধুরীর কষ্টে দিন কাটে। অপূর্ব্ব আপনার শ্বশুরকুল ও বন্ধুবান্ধবের মধ্যে সগৌরবে চলে ফেরে, পার্টি—নিমন্ত্রণ, স্টীমার ট্রিপ ইত্যাদি লাগিয়াই আছে। ফূর্ত্তি ও আনন্দের অন্ত নাই। আপনাকে ও আপনার

অর্দ্ধাঙ্গিনীকে কেন্দ্র করিয়া এই যে সুখবিলাস, তাহার মাঝে ভগিনীর স্থান কোথায়? অপূর্ব্ব কতকটা ইচ্ছা করিয়া, কতকটা ঘনিষ্ঠতার অভাবে মাধুরীর কথা প্রায় বিস্মৃত হইয়াছে। স্ত্রী লতিকা তো মাধুকে চেনেই না। বহুসন্তানপরিবৃতা অনুপমা আপন সংসার লইয়াই ব্যস্ত থাকে, বাহিরের বিশ্বে কি ঘটিতেছে, তাহা দেখিবার অবসর তাহার হয় না। পিতামাতা পঞ্চাশোর্দ্ধে গিরিডিতে নির্জ্জনে বাস করিতেছেন।

তবু অপূর্ব্বর বাড়ির পার্টি ইত্যাদিতে বড়দিদি ও বড় ভগ্নীপতির স্থান ছিল, মাধুরী ও বীরেনের কোন স্থানই ছিল না। ইহা লইয়া অনুপমা এক দিন লতিকার কাছে অনুযোগ করিয়াছিল। লতিকা অন্য কথা পাড়িয়া সে কথা চাপা দিয়াছিল। ভাইয়ের ব্যবহারে অনুপমা বিরক্ত হইয়া ক্রমশ ভাইয়ের বাড়ীতে যাতায়াত ত্যাগ করিল।

মাধুরীর এখনও কিছু সম্বন্ধ ছিল এই দিদিটির সহিত। সুখে দুঃখে তাহার সহিত সহানুভূতি দেখাইতে দিদিই এখন আসে। তবে তাহার অবসর কম—বৃহৎ সংসার। মাধুরী এইটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকে। স্বামীর কাছে তবু দিদি তাহার মুখ রক্ষা করিতেছে!

বীরেন্দ্রের সঙ্গে মাধুরী কখনও বাপের বাড়ির কথা লইয়া আলাপ-আলোচনা করিত না, সেদিকে তাহার এখনও প্রচুর দুর্ব্বলতা ছিল। সে বাল্যকাল হইতে অভিমানী। তাহার বুক ফাটিয়া গেলেও মুখ ফুটিয়া সে কিছু প্রকাশ করিত না, পাছে স্বামী অপমানকর কিছু বলিয়া বসেন! বীরেন্দ্র স্ত্রীর এই দুর্ব্বলতাটুকুকে সম্মান করিয়া চলিত। কিন্তু অপূর্ব্বর সম্বন্ধে সে মাঝে মাঝে তীব্র কথা বলিতে ছাড়িত না। মাধুরী চুপ করিয়া শুনিত, কিছু জবাব দিত না,—জবাব দিবারই বা কি আছে!

কোনদিন সন্ধ্যায় পড়াইয়া ফিরিয়া সে খবর দিত, আজকে তোমার ভাইয়ের বাড়িতে বিরাট ব্যাপার মাধু, অপূর্ব্ববাবুর শ্যালী না কি বিলেত যাচ্ছেন, তাই তাঁকে একটা ফেয়ারওয়েল পার্টি দেওয়া হচ্ছে। হায় রে,

ঐই গরিবকে একদিন ভুল ক'রেও নেমন্তন্ন করে না, তবু দু-একটা মুখ-রোচক খাওয়া জুটত! মাধুরী চুপ করিয়া শুনিত।

কয়েক বৎসর পরের কথা বলিতেছি। মাধুরীর বাবা মা উভয়েই গত হইয়াছেন। অনুপমাও পাঁচটি সন্তান রাখিয়া মারা গিয়াছে। এখন অপূর্ব্ব আর মাধুরী দুই ভাই বোন,—সংসারে আপন আপন ভাগ্যচক্রের সঙ্গে সঙ্গে আবর্ত্তন করিয়া চলিতেছিল। পিতার মৃত্যু অকস্মাৎ ঘটিয়াছে,—কলিকাতা হইতে তিন সন্তানের কেহই পিতার সহিত শেষ-সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করিয়া আসিতে পারে নাই। মাতাও ইহার পর অধিক কাল জীবিত ছিলেন না। অনুপমা তখন অসুখে ভুগিতেছিল, সে যাইতে পারে নাই। মাধুরী আপনার কন্যাকে বীরেন্দ্রের নিকট রাখিয়া ক্রোড়স্থ পুত্রকে লইয়া গিরিডিতে মায়ের সেবা করিতে গিয়াছিল। অপূর্ব্বর স্ত্রী কখনও গিরিডি যায় নাই। মায়ের অসুখের সময় সে আবার অন্তঃসত্ত্বা ছিল, সুতরাং সে পিতার গৃহেই আশ্রয় লইয়াছিল। অপূর্ব্ব মাঝে মাঝে গিয়া মাকে দেখিয়া আসিত; কিন্তু কাজের অজুহাতে এক-আধদিনের বেশি থাকিত না। মাস খানেক ভুগিয়া মা মারা গেলেন। এই সময়টাতে ভাই-বোনে দেখাসাক্ষাৎ হইত; কিন্তু নিতান্ত প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া অন্য কোনও কথা হইত না। দুঃখ-দারিদ্র্যে নিপীড়িত নারী তাহার বড় আদরের ভাইয়ের কাছে তাহার হৃদয়খানি উন্মুক্ত করিয়া দিবার জন্য ব্যগ্র হইত, কিন্তু কথা বলিতে গিয়া বলা হইত না, কোথায় যেন কি একটা বিষম বাধা ছিল। বোনের মনস্তত্ত্ব আলোচনার অবসর অপূর্ব্বর ছিল না,—আসন্ন-প্রসবা পত্নীর বিপদ কল্পনা করিয়া সে তখন ভিতরে ভিতরে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে।

মায়ের মৃত্যুর পর অপূর্ব্বই মাধুরীকে তাহার স্বামীগৃহে পৌঁছাইয়া দিল,—বহু বর্ষ পরে আবার অল্প কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য মাধুরীর গৃহে তাহার ভ্রাতার পদধূলি পড়িল। তারপর ধীরে ধীরে আবার নিদারুণ বিস্মৃতি

মাধুরী দিদির সহিত দেখা করিয়া এবার আর কান্না রোধ করিতে পারিল না, বলিল, দিদি মেয়েমানুষ তো ভুলিতে পারে না, বুকের রক্ত যে তোলপাড় করিয়া উঠে, রক্তের সম্বন্ধ—সে কি ইচ্ছা করিলেই ভোলা যায়! কিন্তু ভগবান পুরুষকে কি ধাতে যে নির্ম্মাণ করেন, নির্ম্মমভাবে দলিয়া পিষিয়া বর্ত্তমানের তাড়ায় তাহারা ছুটিয়া চলে—সমস্ত রক্তের সম্বন্ধ শিথিল করিয়া। আমরা কেন পারি না, দিদি?

রোগকাতর শীর্ণ মুখখানি তুলিয়া দিদি ভগ্নীর মুখখানি বুকে টানিয়া লইল, কিছু বলিল না।

আপনার বলিতে একমাত্র দিদিই ছিল, সেও আর রহিল না। একদিন সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া সেও চলিয়া গেল।

মাধুরী একদিন যৌবনের জোরে আপনার চারিদিকে যে নিবিড় আবরণ রচনা করিয়াছিল,—দিনের কাজের অবসরে, স্বামী-সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্য সমাপন করিয়া, গুটিপোকার মত সেই আবরণ ভেদ করিয়া সে বাহিরে আসিত, তখন তাহার নিজেকে নিতান্ত নিঃসঙ্গ বলিয়া বোধ হইত। ছেলেকে আদরযত্ন করিয়া মানুষ করিয়া তুলিতে তাহার বড় ভয় করিত। এও তো ওই অপূর্ব্বর জাত! কে জানে একদিন হয়তো এও মায়ের নাড়ীর টান উপেক্ষা করিয়া আপনার অদম্য বলে আপন সংসারচক্র নির্ম্মাণ করিতে শুরু করিবে—মা থাকিবে না, ভগ্নী থাকিবে না, কোন সম্বন্ধের প্রয়োজন এ অনুভব করিবে না। মাধুরী শিহরিয়া উঠিত,—বাপ রে, ভাইয়ের উপেক্ষাই যে তাহার বুকে শেল সম বিঁধিয়া আছে, ছেলের উপেক্ষা সে কি সহিতে পারিবে?

অপূর্ব্বদের পরিবারে যে অবিশ্রান্ত বিয়োগান্ত পর্ব্বের শুরু হইয়াছিল, অপূর্ব্বর স্ত্রী লতিকার মৃত্যুর পর তাহা সমাপ্ত হইল। একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াই সে ইহলীলা সংবরণ করিল। অপূর্ব্ব চক্ষে অন্ধকার দেখিল। মানুষ এত বড় আঘাতের জন্য প্রস্তুত থাকে না। এক

মুহূর্ত্তেই তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎ কেমন অন্ধকার হইতে পারে, অপূর্ব্ব তাহা কখন ভাবে নাই।

ভবিষ্যৎ যখন অন্ধকার হইয়া আসিল, তখন সে পিছনে একবার ফিরিয়া চাহিল,—মা, বাবা, বড়দিদি কেহ নাই, এক মাধুরী—সেই বা কেমন আছে কে জানে! মাধুরীর কথা আজ তাহার মনে জাগিল।

সদ্যোজাত শিশুটিকে লইয়া অপূর্ব্ব বড় বিব্রত হইল। শাশুড়ী সেটিকে কোলে তুলিয়া লইলেন বটে, কিন্তু অপূর্ব্ব বিশেষ ভরসা পাইল না। এই কয়েক বৎসরের ব্যবহারেই সে ইঁহাদের ধাত বিলক্ষণ বুঝিয়াছিল। পরের সন্তানের ঝক্কি সহিবার মত মনোভাব ইঁহাদের নহে,—বিশেষ করিয়া অপূর্ব্ব এবং অপূর্ব্বের এই শিশুটিই তাঁহাদের আদরের কন্যার মৃত্যুর কারণ। তাঁহারা যে অপূর্ব্বকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিবেন, অপূর্ব্ব তাহা মনে করিতে পারিল না।

মাধুরী সব শুনিল। এক মুহূর্ত্তে সকল অভিমান তাহার ভাসিয়া গেল। আজ আর তাহার অশ্রু বাধা মানিল না। স্বামী অভুক্ত অবস্থায় স্কুলে গেলেন, ছেলেটা ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদিতে লাগিল, মেয়ে হাঁ করিয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল,—মাধুরীর আজ কোন খেয়াল নাই। তাহার বড় সাধের ভাই আজ সঙ্গীহীন হইয়া ছটফট করিতেছে, সে কি বসিয়া থাকিতে পারে?

বৈকাল পর্য্যন্ত সে অপেক্ষা করিতে পারিল না। গাড়ি ডাকিয়া একেবারে অনিমন্ত্রিত অযাচিত ভাবে ভায়ের শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইল। একবার ভাবিল না—হয়তো অপূর্ব্ব ইহাতে রাগ করিবে, বিরক্ত হইবে। শৈশবের একটা ঘটনার কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল,—সেই যে দিন চলন্ত ট্রামের মুখ হইতে উদ্ধার পাইয়া তাহার ভাই কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, সে তখন সব বাধা ঠেলিয়া ভাইকে বুকে তুলিয়া লইয়াছিল। আজও যে

তাহার বড় সাধের ভাই বিপন্ন হইয়াছে,—লজ্জা অভিমান তাহার আজ কি থাকিতে পারে !

মাধুরী ঠিক সন্ধ্যার প্রাক্কালে অপূর্ব্বর শ্বশুরালয়ে পৌছিল। বাহিরের ঘরে অপূর্ব্ব একা বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতেছিল ; কখন একটা গাড়ি আসিয়া বাড়ির সামনে থামিয়াছে, সে তাহা লক্ষ্য করে নাই। হঠাৎ 'ভাই অপু' বলিয়া কে তাহাকে ডাকিল ! বড় পরিচিত সেই স্বর ! অপূর্ব্ব চমকিয়া চাহিয়া দেখিল—তাহার পরিত্য তাহারই অনাদৃত বড় সাধের ছোটদি মাধুরী। মাধুরী ছুটিয়া আসিয়া অপূর্ব্বর হাত ধরিয়া তাহাকে একেবারে কোলে টানিয়া লইল। দিদির চোখের জলে ভায়ের রুক্ষ কেশ সিক্ত হইতে লাগিল। অপূর্ব্ব 'দিদি' বলিয়া বহুদিন পরে ডাকিল,—তাহার বুকের সমস্ত বোঝা নামিয়া গেল।

বঞ্চিতা

এক

বিমলকে জামাই করা লইয়া তুই জায়ে ভিতরে ভিতরে বেশ রেষারেষি চলিতেছিল। বাহিরে এতদিন কথাটা কেহ খোলাখুলি ভাবে বলেন নাই; সেদিন দত্তগিন্নী আসিয়া যত গোল বাধাইলেন। দত্তগিন্নী সমস্ত গাঁখানার মুরুব্বী ছিলেন; তাঁহাকে দেখিলে ছেলেরা রাস্তায় মার্বেল ফেলিয়া ছুটিত, মেয়েরা ডুব-সাঁতার দিতে শুরু করিত, বাড়ির নূতন বউয়েরা দত্তগিন্নীর 'সুখ্যাতি' কুড়াইবার জন্য পানটা-দোক্তাটা সর্ব্বদা প্রস্তুত রাখিত, কারণ দত্তগিন্নীর সুখ্যাতি মানেই অনেকখানি; তিনিই ছিলেন গাঁয়ের অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস।

দত্তগিন্নী বলিলেন, সুশীলা, তোর মেয়ে যে মস্ত ধিঙ্গী হয়ে উঠল— একটা ভাল দিন-খ্যান দেখে তুহাত একহাত ক'রে দে বাপু। বিম্‌লেটাও তো বেশ ডাগর-ডোগর হয়েছে—শুনছি নেখাপড়াতেও বেশ।

যাহার বিবাহ লইয়া দত্তগৃহিণী এতখানি চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই সুশীলা দেবীর কন্যা শ্রীমতী কনকলতা ওরফে কানি নাচিতে নাচিতে একেবারে হুড়মুড় করিয়া দত্তগৃহিণীর ঘাড়ে আসিয়া পড়িল। বিপুলকায়া দত্তগৃহিণী একটু বিচলিত হইলেন। তবে নেহাৎ সেদিন তাঁহার মনটা খুব ভাল ছিল, তাই একটু রহস্য করিয়া বলিলেন, কি লা জানি, এত ফুর্ত্তি কিসের? কনকলতা ধাক্কাটা খাইয়া একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিল; ধাক্কার চোটে উচ্ছ্বাস অনেকখানি কমিয়া গিয়াছিল। সে একটু শান্তভাবে বলিল, মা, শুনেছ, এই বিমলদা বলছিল কি—

মা হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, বিমলদা কি রে? মেয়ে যেন দিনে দিনে

কি হচ্ছে—বেহায়া কোথাকার! তুই বুঝি বিমলের সামনে এখনও বের হোস?"

কনক একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, কেন, বের হব না কেন?

মা এবার সত্যসত্য চটিয়া গেলেন, বলিলেন, কেন আবার—ও যে তোর বর—

কনক লজ্জিত হইয়া 'ধ্যেৎ' বলিয়া সে-স্থান হইতে প্রস্থান করিল। দত্তগৃহিণী একটু হাস্য করিয়া বলিলেন, হাজার হোক, ছেলেমানুষ, এই সবে দশে পা দিয়েছে বইত না—ওবয়সে আমরা বরের সঙ্গে ঝালঝাপ্‌টাং খেলেছি। তা একটু হুটোপুটি করবে বই কি বোন, একবার শ্বশুর-ঘরে ঢুকলে কি আর রসকস কিছু থাকবে?

পাশে সুশীলা দেবীর বিধবা জা হরসুন্দরী এতক্ষণ চুপ করিয়া সুপারি কাটিতেছিলেন, তিনি বলিয়া উঠিলেন, দশ কি দিদি, কনু যে বারোয় পা দিয়েছে—সরীর বয়স তো এই মাঘে তেরো পেরল—সরীর চাইতে কনু দু বছরের ছোট বই তো নয়। সরী হরসুন্দরীর কন্যা—কনকলতার জ্যেষ্ঠতাত কন্যা।

কথাটা কনকের মার পছন্দ হইল না। তিনি বলিলেন, মেয়ে যে সোমত্ত বয়স পেরিয়ে গিয়েছে এটা নিয়ে গাঁ-গোল করা কি ভাল দিদি—এমনই তো বর জোটে না!

কথাটায় সরীর সম্বন্ধে একটু ঠেস ছিল। হরসুন্দরী দেবী সরসীবালার জন্য একটি পাত্র অনুসন্ধান করিতে একজন বিধবার পক্ষে যতটা করা সম্ভব তাহার অধিক চেষ্টাই করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। বোসেদের বাড়ির ছেলে বিমলকৃষ্ণকে তাঁহার খুব মনে ধরিয়াছিল এবং এসম্বন্ধে তিনি তাঁহার দেবরকে কিছু আভাসও দিয়াছিলেন, কিন্তু দেবরপত্নী সুশীলার বিমল সম্বন্ধে লোভ থাকাতে দেবর ওইদিকে বিশেষ কিছু নজর দেন নাই। হরসুন্দরী এজন্য মনে মনে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ ছিলেন।

দত্তগৃহিণী হঠাৎ হরসুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি গো, সরীর কোনও গতি ঠিক করতে পারলে?

হরসুন্দরী ভিতরে ভিতরে অনেক দিন ধরিয়া গুমরাইতেছিলেন—বিশেষত আজকে তাঁহার মনটা ভাল ছিল না। তিনি বলিলেন, আমি তো বিমলের ভরসাতেই ছিলুম দিদি, তবে শুনছি ছোট গিন্নী নাকি তার সঙ্গে কনকের সম্বন্ধ ঠিক করছে।

দত্তগৃহিণী এতক্ষণে একটু কোন্দলের আভাস পাইলেন—মজা দেখিবার জন্য বলিলেন, সে তো সত্যি সুশীলা, কানিকে এখনও বছর দুই রাখা চলবে। সরীর সঙ্গে বিমলের বিয়ে হয়ে গেলে মন্দ কি! পেটের না হোক ও তো তোমাদেরই মেয়ে!

সুশীলা দেবী মনে মনে বিরক্ত হইলেন, একটু উষ্ণভাবেই বলিলেন, আমাদের ঠিক করা-করিতে কি কিছু এসে যায় দিদি, বোস-গিন্নীর ইচ্ছামতই ত সব হ'বে। সরীকে যদি তাঁর পছন্দ হয় তিনি তাকেই ঘরে ঠাঁই দেবেন। তবে কিনা তিনি ছোট ক'নে চান।

দত্তগৃহিণীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল, তিনি তাঁহার বিপুল বপুখানিকে উত্তোলন করিবার প্রয়াস করিতে করিতে বলিলেন, উঠি বোন, যার সঙ্গেই হোক মেয়ে দুটোকে পার ক'রে দাও, অত বড় আইবুড়ো মেয়ে ঘরে রাখা ঠিক হচ্ছে না। শত্রুর তো আর অভাব নেই!

শত্রুর এতকাল অভাব থাকিলেও আর যে অভাব হইবে না দুই জায়েই তাহা বুঝিলেন। হরসুন্দরী একটু ভীত হইয়া বলিলেন, এস দিদি, মাঝে মাঝে তোমরা একটু পায়ের ধূলো দাও ব'লে এই পোড়া দেহ নিয়ে বেঁচে আছি। কন্যার উদ্দেশে বলিলেন, ওরে সরী, তোর জ্যেঠিমাকে দুটো পান দিয়ে যা তো—একটু দোক্তাও আনিস।

দত্তগিন্নী হাসিয়া বলিলেন, দোক্তার কথা কি আবার সরীকে ব'লে দিতে হয় বোন, ও আমার ভারী লক্ষ্মী মেয়ে—জ্যেঠিমাকে বেশ চেনে।

সুশীলাসুন্দরী কথাটায় প্রীত হইলেন না। তিনি ইহার অর্থটা করিলেন—অর্থাৎ কনকের সহিত তুলনায় সরী লক্ষ্মী। তিনি বারান্দা ছাড়িয়া ঘরের ভিতরে গেলেন।

সরী অর্থাৎ শ্রীমতী সরসীবালা শান্তপদক্ষেপে ধীরে ধীরে আসিয়া জ্যেঠিমার হাতে পান ও দোক্তা দিল। আপনাকে মায়ের অনেক কষ্টের কারণ জানিয়া সে মনে মনে যথেষ্ট সঙ্কুচিত থাকিত ও বাহিরেও আপনাকে যতটা পারিত গোপন করিয়া রাখিত। তাহার বয়স সবে চতুর্দ্দশ হইলেও সে বয়সের অনেক অধিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিল ও বয়সের চাইতে অনেক বেশি গম্ভীর হইয়া থাকিত। সে শ্যামাঙ্গিনী, কিন্তু তাহার চারিদিকে একটি মনোরম মাধুর্য্যের প্রলেপ ছিল; ক্ষীণ দেহবল্লরী লইয়া সে যেখানে উপস্থিত থাকিত সেখানেই কেমন একটা শান্ত সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিত। বিমলকে লইয়া মা ও কাকীমার ভিতর যে মনান্তর ঘনাইয়া উঠিতেছিল, তাহার কথঞ্চিৎ আভাস সে পাইয়াছিল; সেইজন্য সে আর বিমলের সম্মুখে বাহির হইত না।

কিন্তু বিমলকে তাহার ভাল লাগিত। বিমল আসিয়া যখন নানা হাস্যপরিহাসে তাহার স্বভাবগাম্ভীর্য্যকে ক্ষত-বিক্ষত করিত, তখন সে এমন একটি অপরিচিত জগতের আংশিক পরিচয় পাইত যেখানে যাইবার আকাঙ্ক্ষা তাহার গোপন থাকিলেও তাহার আবেষ্টনী তাহাকে নিরন্তর দূরে রাখিত। সে বহুবার কল্পনা করিয়াছে—বিমলের সংসারে সে সর্ব্বময়ী হইয়া কল্যাণে, প্রেমে ও সেবায় তাহার ক্ষুদ্র সংসারটি ভরিয়া তুলিয়াছে;—শাশুড়ীকে সংসারের জন্য খড়কুটাটি পর্য্যন্ত সে নাড়িতে দিবে না, বিমলকে সে সর্ব্বভাবে সুখী করিবে, ইত্যাদি নানা চিন্তা তাহার মনকে আবিষ্ট করিয়াছে; তাই সেও যখন কনকের সহিত বিমলের বিবাহের প্রস্তাব শুনিল, তখন মনে মন প্রসন্ন হইল না। তবু সে-কনকের মন বুঝিবার জন্য একটু রহস্য করিয়া একবার কথাটা তাহার কাছে

পারিল ; কনক হাসিয়া লুটোপুটি হইল। সরসী ঠিক কারণ বুঝিতে না পারিলেও ইহাতে একটু খুশি ছিল।

দত্তগিন্নীর হাতে পানদোক্তা দিয়া সরসী দাঁড়াইয়া রহিল। দত্তগিন্নী আদর করিয়া তাহার থুতনি নাড়িয়া একটা চুমা খাইয়া বলিলেন, মা আমার ভারী লক্ষ্মী, এ-মেয়ে তোমার কখনও কষ্ট পাবে না বড়বউ। ও যে-ঘরেই যাক, সে ঘর আলো করবে।

সরসী লজ্জিত হইয়া আঙুলে আঁচল জড়াইতে লাগিল। দত্তগিন্নী সশব্দে চলিয়া গেলেন।

দুই

যাহাকে লইয়া এত গোলযোগ, সেই শ্রীমান বিমলকৃষ্ণ বসু গাঁয়ের স্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন্ পাস করিয়া কলিকাতায় ইণ্টারমিডিয়েট পড়িতে-ছিল। এইবার পরীক্ষা দিবে। চঞ্চল ও দুষ্ট প্রকৃতির বলিয়া তাহার খ্যাতি ছিল। পড়াশুনায় সে বেশ ভাল হইলেও ডানপিটেমির জন্ত তাহার নিন্দাও নিন্দুকে করিত, কিন্তু তাহার সঙ্গে যাহাদের বিশেষ পরিচয় ছিল তাহারা তাহার গুণের জন্য দোষগুলি অত্যন্ত ছোট করিয়া দেখিত। সে হাস্ত-পরিহাস হৈ-চৈ হট্টগোল করিয়া কাটাইলেও কর্ত্তব্যে তাহার কখনও অবহেলা ছিল না। গাঁয়ের মেয়েদের সব ফাইফরমাস সে খাটিয়া দিত; চিঠি লিখিয়া দিত ও বিপদ-আপদে সাহায্য করিত। গাঁয়ের ছেলেদের সে ছিল নেতা, সুতরাং গাঁয়ের মুরুব্বিরাও তাহাকে ভয় করিয়া চলিতেন। প্রত্যেক বাড়িতে তাহার অবাধ গতি ছিল—বড় মেয়েদের সে অত্যন্ত আদরের পাত্র ছিল, ছোট মেয়েদের তাহাকে না হইলে চলিত না। এটা সেটা আনিয়া দিয়া, আজগুবি গল্প বলিয়া ও নানা ভাবে উপহাস ও অত্যাচার করিয়া সে তাহাদের মন কাড়িয়া লইয়াছিল। সে যখন ম্যাট্রি-কুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় পড়িতে গেল, তখন বৃদ্ধারা

তাহার বিধবা মাতার দুঃখে যথেষ্ট সহানুভূতি দেখাইয়াছিলেন ও তাঁহার পুত্র যে বিদ্যাদিগ্‌গজ হইয়া ফিরিবে তাহারও আশা দিয়াছিলেন; কিন্তু ছোটরা সত্য-সত্যই কষ্ট পাইয়াছিল। বিমল প্রত্যেক ছুটিতে আসিবে, ও প্রত্যেক বারে তাহাদের জন্য উপহার আনিবে, এইসব আশ্বাস দিয়া তাহাদের অনেকটা ভুলাইয়া রাখিত।

মিত্রবাড়ির সঙ্গে বিমলের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল। সুশীলা দেবীর পুত্র ব্রজেন ছিল তাহার সহপাঠী। সরসী কিংবা কনকের সহিত ভবিষ্যতে যে বিমলের একটা গূঢ়তর সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে—এ কথা ব্রজেনও জানিত, বিমলও জানিত; ইহা লইয়া বিমল যখন-তখন ব্রজেনকে ঠাট্টাতামাশা করিতেও ছাড়িত না। এই বিবাহের বিরোধী বিমল কখনও ছিল না, তাহার মাতাও এ বিষয়ে অনেকটা মনস্থির করিয়াছিলেন।

এই সম্বন্ধের কথা ভালরকমে উঠার পর সরসী আর পারৎপক্ষে বিমলের কাছে বাহির হইত না, তবে কাছাকাছি গোপনে থাকিয়া বিমলের হাস্য-পরিহাস উপভোগ করিত। কনক যে বিমলের কাছে গিয়া লাঞ্ছিত হয়, সে যাইতে পারে না, ইহাতে সে আজকাল একটু ঈর্ষান্বিত হয়; সে কনককে বারণ করে, কনক শোনে না; বিমলদা বলিতে কনক অজ্ঞান; বিমলের সহিত ঝগড়া না করিলে তাহার দিন চলে না।

এইভাবে বেশ দিন চলিতেছিল। কনক সরসী যে হোক একজনের সঙ্গে বিমলের বিবাহ হইবে গ্রামের প্রত্যেকেই তাহা জানিত; বিমল সরসীকে বেশ পছন্দ করিলেও কনককেও তাহার মন্দ লাগিত না; 'স্বয়ম্বর' হইতে হইলে কাহাকে সে গ্রহণ করিবে, সে-সম্বন্ধে কিছুই ঠিক করিতে পারে নাই। সে জানিত, তাহার মা সরসীকেই বেশি পছন্দ করেন ও সম্ভবত সরসীর সহিত তাহার বিবাহ হইবে, কিন্তু কনকই বা মন্দ কি! সরসীটা ভারী গম্ভীর, কনকের মত হৈ-চৈ করিতে পারে না। সে নিজে হৈ-চৈ একটু বেশি পছন্দ করিত।

বিমলের দিক দিয়া বিমল যাহাই ভাবুক, বিমল-সম্বন্ধে কনক ও সরসী দুইজনে ভিন্ন মত পোষণ করিত। কনক বয়সে ছোট—বিবাহ জিনিষটা ঠিক কি ব্যাপার সে না বুঝিলেও আঁচ করিয়াছিল, জিনিসটা বেশ মজার, সুতরাং একটা মজার ব্যাপার বিমলদার সহিত ঘটিবে ইহাকেই সে যথেষ্ট মনে করিত ও সগর্ব্বে বলিয়া বেড়াইত, সে বিমলদার বউ হইবে। এই লইয়া বিমলদাকেও সে অনেক পরিহাসাদি করিয়াছে। বিমল তাহার কান মলিয়া দিয়াছে।

সরসী জিনিষটা বুঝিত ও বিমলকে বিবাহ করিলে সে যে খুবই খুশি হইবে তাহাও মনে মনে ঠিক করিয়া লইয়াছিল। ঠিক প্রেম করিবার মত বয়স না হইলেও বিমলের দিকে তাহার মন অনেকটা ঝুঁকিয়াছিল; সেইজন্য বিমলের সান্নিধ্য আকাঙ্ক্ষা করিলেও সে লজ্জায় দূরে দূরে থাকিত।

কিন্তু গোল বাধিল অন্য দিক হইতে। বিমল কলিকাতায় প্রথম যখন আসিল তখন তাহার ভারী বিশ্রী লাগিত; সব যেন কেমন ফাঁকা-ফাঁকা—কাহারও সহিত কাহারও নাড়ীর টান নাই! তাহার ক্ষুদ্র গ্রামখানি, তাহার শিষ্যবৃন্দ ও তাহার সঙ্গিনীদের কথা ভাবিয়া সে ভারী বিমর্ষ হইত। সে কলিকাতায় তাহার জ্যেঠতুত দাদাদের বাড়িতে আশ্রয় লইয়াছিল। তাঁহারা খুব বড়লোক—কলিকাতার বনেদী ঘর। প্রথমটা সে এই বাড়িতে বউদিদিদের আদর-যত্নের ভিতর তেমন বন্ধন অনুভব করিত না—না করিলে নয় এইভাবে যেন তাঁহারা তাহার যত্ন করেন। সে চুপ করিয়া তাহার নির্দ্ধারিত ঘরখানিতে বসিয়া বসিয়া নিজের গ্রাম, মা ও বৌদির আগ সময় সরসী ও কনকের কথা ভাবিত,—তাহারা কি করিতেছে, কি ভাবিতেছে, কবে তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইবে, এইসব চিন্তা। কিন্তু ক্রমশ কলিকাতার জলবায়ু তাহার সহিয়া গেল; তাহার ধাতের পরিবর্ত্তন হইল। ইলেক্‌ট্রিক লাইট, ফ্যান, থিয়েটার, বায়স্কোপ, ফুটবল, গড়ের মাঠ, লোক-লৌকিকতা, সব মিলিয়া কলিকাতা বহুবিস্তৃত ও প্রচুর রহস্যময়।

তাহাদের গ্রামখানি ক্রমশই তাহার নিকট অপরিসর ও ক্ষুদ্র হইয়া আসিতে লাগিল। মেজ বউদিদির বোনেদের দেখিয়া মেয়েদের সম্বন্ধে ধারণাও তাহার পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। তাহারা কেমন আপ্‌টুডেট্—কেহ বেথুন, কেহ ব্রাহ্ম-বালিকা শিক্ষালয়ে পড়ে, জুতা পরে, ইংরেজী বুকনি দিয়া কথা বলে, চুল বাঁধে না, ইত্যাদি নানা জিনিস ক্রমশ তাহার চোখ-সওয়া হইয়া গিয়া তাহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। তাহার দৃষ্টিও মত নূতন অভিজ্ঞতার মোহে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। গ্রামের খেলাধূলার সুখ-দুঃখের স্নেহ-মমতার কথা ক্রমশ আবছা হইতে হইতে মিলাইয়া গেল—যতটুকু মনে রহিল ততটুকুতে শুধু গ্রাম্যতার গন্ধ রহিল, হৃদয়ের পরিচয়টুকু সে বিস্মৃত হইল। যে গ্রামের আবেষ্টনী এতদিন তাহাকে সুখ-দুঃখের রসদ জোগাইয়াছে—যে-গ্রামের ভাল-মন্দ আশা-আনন্দ আয়ার মনে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত ছিল, তাহার আশু-আবিষ্কৃত জগতে সে-গ্রামের স্থান ছিল না, থাকিলেও উপহাসের ভয়ে সে তাহা স্বীকার করিত না। তাহার ক্ষুদ্র গ্রামখানি লইয়া তাহার গ্রাম্যপনা দেখিয়া পূর্ব্বে যখন তাহার কলিকাতার আত্মীয়-আত্মীয়ারা উপহাস করিয়াছে তখন সে প্রতিবাদ করিয়াছে, ক্রুদ্ধ হইয়াছে; একেলা নিজের ঘরে অশ্রু-বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত করিয়াছে। আজকাল সেও এই উপহাসে যোগ দেয়, নূতন শিকার পাইলে সেও লাঞ্ছনা করে। এমন কি, যাহারা তাহার মনের অনেকখানি ঠাঁই জুড়িয়াছিল সেই সরসী ও কনকের বোকামি ও পাড়াগেঁয়ে ভাব লইয়া সে এখন নিজেই সরস গল্প করিয়া বন্ধুবান্ধবদের মনোরঞ্জন করে; পূজার বেদীতে একদিন যাহাদের স্থান ছিল, তাহারা ধূলায় গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। বিমলকৃষ্ণের পরিচ্ছদাদির সহিত মনেরও পরিবর্ত্তন হইল।

বিমলের কলিকাতা যাওয়ার দ্বিতীয় বৎসরে এই ভাবটা খুব বেশি প্রকট হইল; দৈবাৎ মা আছেন বলিয়া তাহাকে গ্রামে আসিতে হয়, না

আসিতে হইলে সে সুখীই হইত। দুই চার দিন থাকিয়া মিথ্যা পড়া-শোনার ওজুহাত দেখাইয়া সে কলিকাতা যাইবার চেষ্টা করে। কলিকাতার মোহ তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল।

তাহার এই উদাসীনতা আর কেহ লক্ষ্য না করিলেও সরলী ইহা লক্ষ্য করিয়া শঙ্কিত হইয়াছিল। সে দেখিতে পাইতেছিল তাহাদের বিমলদা আর সে বিমলদা নাই—এ যেন সম্পূর্ণ নূতন লোক, এজন্য সরলী যথেষ্ট ব্যথিত হইলেও হাল ছাড়ে নাই। বিমল তাহাকে বিবাহ করিবে, এ কথা এখনও সে ভাবিতে পারিত।

কনক বিমলের এই পরিবর্ত্তন মনে মনে অনুভব না করিলেও বাহিরে বিমলদার ব্যবহারে একটু ক্ষুণ্ন হইয়াছিল। বিমলদা আর তেমন করিয়া তাহাকে কাছে ডাকেন না। ডাইনী রাক্ষুসী ইত্যাদি বলিয়া আর তাহাকে জ্বালাতনও করেন না। সে অভিমান করে, বিমলকে উত্যক্ত করিতে চেষ্টা করে এবং মাঝে মাঝে বিমলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সফলও হয়—এইটুকু পাইয়াই কনক সন্তুষ্ট থাকে।

তিন

পূজার ছুটিতে বিমল গ্রামে আসিয়াছে। পূজার কয়েক মাস পরেই পরীক্ষা, সুতরাং সে পূজার কয় দিন দেশে থাকিয়া কলিকাতা ফিরিবে, মায়ের নিকট ইতিমধ্যেই সে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু বিমল এবার সুস্থ মন লইয়া ফিরিতে পারিল না। সেদিন সুশীলা দেবী ও হরসুন্দরী দেবীর ভিতর যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইল, তাহার ঢেউ তাহাকেও গিয়া লাগিল। কনকের পিতা বিমলের মাতার নিকট এ বিষয়ে কথা পাড়িলেন। বিমলের মাতার অমতের কারণ ছিল না, তবে তিনি একবার ছেলের মতটা জানিতে চাহিলেন;—লেখা-পড়া

জানা ছেলে, তার মতটা নেওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন। মাতা এই সঙ্গে সরসীর কথাটা পাড়িতেও ভুলিলেন না।

যৌবন ও কৈশোরের সন্ধিক্ষণে যাহা দুর্লভ স্বপ্ন ছিল, আজ বিমলের তৎসম্বন্ধে কোন মোহই ছিল না। কনক বা সরসীকে বিবাহ করার কথা ভাবিয়া তাহার হাসি পাইল। 'অচল' লিখিতে যাহারা তিনটা ভুল করিবে তাহাদের সঙ্গে বিবাহ! অসম্ভব। সে মাতাকে জানাইল যে, বি-এ পাস না করিয়া কিছুতেই বিবাহ করিবে না—পড়াশোনার সময়ে বিবাহ করিলে পড়াশোনার বিঘ্ন উপস্থিত হয়, ইত্যাদি নানা কথা বলিয়া মাকে অনেকটা ঠাণ্ডা করিল।

মা বলিলেন, ওদের মেয়ে যে খুব বড় হয়ে উঠেছে, ওরা কি আর ঘরে রাখবে?

মৃদু হাসিয়া বিমল বলিল, মা, দেশে মেয়ের তো দুর্ভিক্ষ হয় নি—ঢের মেয়ে পাওয়া যাবে। ওদের বিয়ে হয়ে গেলেই ভাল।

বিমলের মতের পরিবর্ত্তন হইলেও মাতার হয় নাই। এতকাল তাহাদের সহিত কথাটা পাকাপাকি না হইলেও তাহা এমন প্রচারিত হইয়াছিল যে, এখন অমত করিলে অন্যায় করা হইবে। কিন্তু ছেলে নাছোড়বান্দা। তিনি অগত্যা মিত্রবাড়িতে জানাইলেন যে, ছেলে তিনটা পাস না দিয়া বিবাহ করিবে না। শুনিয়া দুই পরস্পর-ঈর্ষাপরায়ণা জায়ের মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। তবু কনকের পিতা বর্ত্তমান, তাহার পাত্রের অভাব হইবে না—হরসুন্দরী চোখে অন্ধকার দেখিলেন। তিনি একদিন গোপনে বিমলকে ডাকিয়া বলিলেন, বাবা, তুমি তো অবুঝ নও, আমি যে বহুকাল থেকে আশা ক'রে আসছি তোমার হাতে হতভাগীকে স'পে দিয়ে নিশ্চিন্ত হব। সরসী জানিত, মা বিমলকে কেন ডাকিয়াছেন। সে অন্তরালে থাকিয়া শুনিয়া লজ্জিত হইয়া উঠিল,—ছি ছি, ভিখারীর মত কৃপা-প্রার্থনা! বিমলের উত্তর শুনিবার জন্য সে ব্যাকুল হইয়া রহিল।

বিমল বলিল, কাকীমা, সরীকে যে আমি এত দিন বোনের মতই দেখে এসেছি ; ওর সঙ্গে বিয়ে হবার কথা ভাবলেই আমার হাসি পায়— তা ছাড়া আমি এখন কিছুতেই বিয়ে করতে পারব না।

হরসুন্দরী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। অন্তরালে সরসী রাগে ফুলিতে লাগিল—এতদিন পরে এই কথা! সে তো বহুকাল হইতে এই সম্বন্ধের কথা জানিত। কি প্রয়োজন ছিল তাহার এতকাল ইহাকে জিয়াইয়া রাখিবার—আগে বলিলেই তো হইত। হরসুন্দরী বলিলেন, বাবা, তুমি বিয়ে না কর—একটা পাত্র ওর জুটিয়ে দাও, তোমার তো বাবা, অনেক বন্ধুবান্ধব আছে, আমার যে তোমরা ছাড়া আর কেউ নেই।

সরসী ভাবিল, তাই বইকি, ওর ঠিক-করা বরকে আমি কখ্খনো বিয়ে করব না। বিমল বলিল, সে চেষ্টা করিবে।

বিমল কলিকাতা চলিয়া গেল।

চার

ইহার পর এক বছর বিমল দেশে ফিরিল না। পরীক্ষা দিয়া মেজদাদার সঙ্গে পুরী গেল ; সমুদ্র দেখিল এবং আরও সব অভিজ্ঞতা লাভ করিল যাহাতে তাহার ক্ষুদ্র গ্রামখানি তাহার মন হইতে একেবারে লোপ পাইল। কনক বা সরসীর স্থান কোথায়ও রহিল না।

পুরীতেই সে পরীক্ষায় পাসের খবর পাইল ; সে একেবারে কলিকাতায় ফিরিয়া বি-এ পড়া শুরু করিয়া দিল।

ইতিমধ্যে তাহাদের ক্ষুদ্র গ্রামখানিতে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। এক দোজবরে পাত্রের সহিত সরসীর বিবাহ হইল—সে নির্ব্বিবাদে বিবাহে মত দেয় নাই ; অনেক ওজর-আপত্তি ধ্বস্তাধ্বস্তি করিবার পর বিবাহ করিয়াছে। বিমলকে সে এজন্য ক্ষমা করিতে পারে নাই। তাহার

কিশোর মনে একবার যে ছাপ্ পড়িয়াছিল তাহা আর উঠিল না—বিমল তাহাকে ভুলিলেও সে বিমলকে ভুলিতে পারিল না। কিন্তু এ কথা কাহাকেও বলিবার নয়। সে ভিতরে ভিতরে দগ্ধ হইতে লাগিল। স্বামীকে সে আপন ভাবিতেও পারিল না—আপন করা তো দূরের কথা। স্বামীর সহিত কোনও প্রকার অসদ্ব্যবহার না করিলেও যতটা পারিত স্বামীর কাছ হইতে দূরে দূরে থাকিত। বিবাহের পর সে যখন প্রথম শ্বশুর-বাড়ি গেল, তখন তাহার মন বেদনা ও হতাশায় আচ্ছন্ন। শ্বশুর-বাড়িতে দুইদিন থাকিয়াই সে হাঁপাইয়া উঠিল। কাঁদাকাটা করিয়া সে মায়ের কাছে শান্তি খুঁজিতে আসিল, তাহার পর সে আর শ্বশুর-বাড়ি যায় নাই। স্বামীর সহিত পত্রাদি ব্যবহার পর্য্যন্ত করে না। তাহার স্বামীর বয়স হইয়াছে—তিনি সদ্যপরিণীতা বালিকা-স্ত্রীর এই বিমুখতা ছেলেমানুষি ভাবিয়া বিশেষ বিরক্ত হইলেন না; সবুরে মেওয়া ফলে জানিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

কনকেরও বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তাহার স্বামী সদ্য-পাস-করা ডাক্তার। কনকের মনে বিমলের সম্বন্ধে এতটুকু খোঁচা ছিল না বলিয়াই সে সখীদের সঙ্গে যথারীতি স্বামীকে লইয়া আলোচনা করে—মস্ত মস্ত চিঠি লেখে, আর স্বামীর চিঠিগুলি সগর্ব্বে সখীদের দেখাইয়া বেড়ায়।

বিবাহের পর কনক উচ্ছল স্রোতস্বিনীর মত কলকল করিয়া ফিরিত—হাসি-গল্প-গানে চারিদিক মুখরিত করিয়া রাখিত। বিমলদা একদিন যেমন তাহার খেলার সামগ্রী ছিল—স্বামীকেও সে তেমনই খেলার সামগ্রী বলিয়া ধরিয়া লইল। তাহার ভারী ইচ্ছা করিত স্বামীর সহিত বিমলদার আলাপ করাইয়া দেয়।

কিন্তু সরসী যতটা পারিল বাহির হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া মনের গভীর অতলে ডুবিয়া রহিল; সে পূর্ব্বের মত আপন মনে রঙিন-রঙিন স্বপ্ন রচনা করে—বাস্তবতার আঘাতে এখন সে স্বপ্ন চূর্ণ হইয়া

যায়; সে ভাঙে আর গড়ে। সে চলে ফেরে, সংসারের প্রত্যেকটি কাজ করিয়া যায়, কিন্তু কোথায়ও কোনও ফাঁক দিয়া প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায় না।

পাঁচ

পূজার ছুটিতে বিমল যখন বাড়ি আসিল, তখন সে মনটিকে সঙ্গে লইয়া আসিতে পারিল না; মেজ-বউদির ছোট বোন লিলির হাতে সেটিকে সমর্পণ করিয়া আসিল। লিলি ব্রাহ্ম-বালিকাবিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে পড়িত। বিমল ও লিলির ভিতরে অদূরভবিষ্যতে যে কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া উঠিবে বউদিদি উহা প্রচার করিয়াছিলেন ও দুই জনের মিলিয়া মিশিয়া চলাফেরা করার যথেষ্ট অবকাশও দিয়াছিলেন। বিমলের সেজদাদা পর্য্যন্ত ইহা লইয়া লিলির সহিত কৌতুক করিতে ছাড়েন নাই। বিমল যখন অল্পকয়েক দিনের কড়ারে বাড়ি আসিল, লিলি তাহাকে শপথ করাইয়া লইল যে, সে প্রত্যহ একখানি করিয়া পত্র দিবে।

আপনার রঙিন স্বপ্নে বিভোর হইয়া আসিয়াছিল বলিয়া বিমল গ্রামে আসিয়া বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন অনুভব করিল না। কনক শ্বশুর-বাড়ি গিয়াছে; সরসী তাহার সম্মুখে ক্বচিৎ বাহির হয়। বিমল যদি সহজ অবস্থায় থাকিত তাহা হইলে এই অভাবে ব্যথা অনুভব করিত—সরসীর ব্যথাকাতর মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইত; কিন্তু সে তখন যৌবনের স্বপ্নে বিভোর—সরসীর বুভুক্ষা সে দেখিল না। সে বুঝিতে পারিল না যে, সে অজানিতভাবে একটি নিরীহ বালিকার জীবনকে কি ভাবে নষ্ট করিয়াছে। বিমলের আদর্শ যদি কৈশোরেই সরসী মনে গাঁথিয়া না লইত, হয়তো এই স্বামীর সহিতই সে আর পাঁচজনের মত স্বচ্ছন্দে সংসার পাতিতে পারিত; কিন্তু স্বামীর বয়স, বিপুল দেহ, জরাগ্রস্ত মন বিমলের সহিত তুলনায় এতটা প্রকট হইয়া উঠিত যে, সরসী স্বামীর ঘর করিবার

কল্পনাতেও শিহরিয়া উঠিত। তাহার ক্ষুদ্র মনে বিমল ছাড়া আর কাহারও স্থান ছিল না।

বিমলের এই তন্ময়তা সরসী লক্ষ্য করিয়া ঈর্ষায় জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু অদৃশ্য শক্রর সহিত লড়াই চলে না; সে নিজেই পীড়িত হইতে লাগিল। সে বিমলদের বাড়ি বেড়াইতে গিয়া প্রায়ই দেখিত, বিমল আপনার পড়ার ঘরে হয় কিছু লিখিতেছে, পড়িতেছে কিংবা চুপ করিয়া বসিয়া আছে। রোগের লক্ষণগুলি ধরিয়া সরসী রোগটি আঁচ করিয়া লইল—তাহার অজানিত প্রতিদ্বন্দ্বীটিকে আবিষ্কার করিবার জন্য তাহার মন ছটফট করিতে লাগিল। সে বুঝিতে পারিত, বিমল কাহারও চিঠির অপেক্ষায় উস্‌খুস করে। প্রত্যহ যেন কাহাকে চিঠি দেয়, বৈকালে যখন বিমল বেড়াইতে বাহির হইত তখন সে বোসেদের বাড়ি গিয়া বই আনিবার অছিলায় বিমলের ঘরে অনুসন্ধান করিত।

ইতিমধ্যে সরসীকে লইবার জন্য তাহার স্বামী আসিলেন। সরসী প্রমাদ গণিল। সে বাঁকিয়া বসিল; স্বামীর কাছে সে যাইবে না। হরসুন্দরী মেয়ের ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই মেয়েকে বাগ মানাইতে পারিলেন না।

বিমল সরসীর স্বামীর সঙ্গে প্রথম দিনেই বেশ আলাপ জমাইয়া লইল। মানুষটি ভাল, যথেষ্ট সাংসারিক লোক।

পূরা একদিন অতীত হইল, তবু সরসী স্বামীর কাছ ঘেঁষিল না। হরসুন্দরী গাল দিলেন, বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, কাঁদাকাটা পর্য্যন্ত করিলেন—সরসী টলিল না। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি বিমলের শরণাপন্ন হইলেন, তিনি জানিতেন—সরসী বিমলের কথা শুনিবে।

বিমল আসিয়া সমস্ত শুনিয়া একটু হাসিল, বলিল, ছেলেমানুষ, কাকীমা—লজ্জায় অমন করছে; তুমি অত ভয় পাচ্ছ কেন?"

হরসুন্দরী কাতরভাবে বলিলেন, বাবা, ভয় করছি কি সাধে!

পোড়া-কপালী কেমন কপাল নিয়ে জন্মেছিল ! পড়েছে তো দোজবরের হাতে ; এর ওপর যদি জামাইটির মন বিগড়ে দেয়, ওর গতি কি হবে বল দেখি ! হাজার হোক পুরুষমানুষ তো, কত সহ্য করবে ! হতভাগী আমাকে জালিয়ে খেলে। তুমি বাবা, একবার ওর সঙ্গে দেখা কর।

বিমল জিজ্ঞাসা করিল, সরসী কোথায় ? হরসুন্দরী একখানি ঘরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, ওই বড় ঘরের মেঝেতে ব'সে আছে।

তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে ; জামাইয়ের খাওয়া-দাওয়া শেষ হইয়াছে। সরসী আজ সমস্ত দিন ঘরের বাহির হয় নাই, বড় ঘরের মেঝেতে সে চুপটি করিয়া বসিয়া ছিল ; বিষাদের যেন প্রতিমূর্ত্তি। এই ছেলেমানুষি করিয়া সে যে কি লজ্জার ব্যাপার ঘটাইতেছে ইহা ধারণা করিবার শক্তি পর্য্যন্ত তাহার ছিল না ; সে শান্ত ভাবে বসিয়া ছিল।

বিমল ঘরে ঢুকিয়া চমকিয়া উঠিল, ঘরের এক কোণে একটা প্রদীপ জ্বলিতেছে—সেই স্তিমিত আলোকে সেই স্তব্ধ মূর্ত্তির পানে চাহিয়া বিমল আশ্চর্য্য হইল। বলিল, সরী, ছি ! আর ছেলেমানষি করে না—দেখ্ দেখি, মা তোর জন্যে আজ সমস্ত দিন খাননি—খালি কাঁদছেন। ওঠ্, চল্, খেয়ে নিয়ে বিনোদবাবুর সঙ্গে দেখা করবি চল্।

বিনোদবাবু সরসীর স্বামী।

সরসী একবার ঘাড় তুলিয়া বিমলের দিকে চাহিল—স্থির নিশ্চল মূর্ত্তি ! সে কি যেন বলিতে গেল—ঠোঁট দুইটি কাঁপিয়া উঠিল মাত্র, কথা বাহির হইল না।

বিমল তাহার কাছে গিয়া তাহার হাত ধরিল, সরসী বিদ্যুৎগতিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিমলের দিকে আয়তদৃষ্টি মেলিয়া একবার চাহিল—সে-দৃষ্টিতে বহুদিনের সঞ্চিত রুদ্ধ অভিমান ফাটিয়া পড়িতেছিল।

সে দৃষ্টি নামাইয়া আবেগকম্পিত স্বরে আবার কি বলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছু বলিতে পারিল না।

কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া থাকিবার পর সে বিমলের দিকে চাহিল ;—অন্তরের প্রবল দ্বন্দ্ব তাহার শান্ত মুখশ্রীতে একটা উগ্রতা আনিয়া দিল। তাহার চোখ দিয়া যেন আগুন ঠিকরিয়া পড়িতেছিল। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।—বলিয়া সে ধীর-গম্ভীর পদক্ষেপে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বিমল স্তম্ভিত হইয়া সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মনে অতীতের স্মৃতি—বহুদিনের বিস্মৃত কৈশোরের মধুর স্বপ্নগুলি ঝলকিয়া উঠিল। সে এক মুহূর্ত্তে বুঝিতে পারিল, কি ভাবে নিজেকে বঞ্চিত করিয়াছে ; কিন্তু এখন আর উপায় ছিল না!

বিমল কিছুদিন লিলিকে পত্র দিতে পারিল না।

প্রতিবেশিনী

কোনও পরিচয় ছিল না, অথচ তিনি আমার নিঃসঙ্গ জীবনটিকে ভরিয়া রাখিয়াছিলেন—আমার শুষ্ক জীবনকাণ্ডটি অলক্ষ্য রসধারায় সিঞ্চিত করিয়া তাহাকে ফলে ফুলে মঞ্জুরিত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

মৌখিক বা ব্যবহারিক কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও এক জায়গায় আমাদের নিবিড় পরিচয় ছিল ; সে পরিচয়ের পরিমাপ দুঃসাধ্য। তিনি জানিতেন—আমি আছি ; আমি জানিতাম—তিনি আছেন। তাঁহার দিক দিয়া আমার অস্তিত্ব তাঁহাকে কি ভাবে আলোড়িত করিত তাহা কখনও জানিতে পারি নাই, তবে কল্পনা করিতে পারিতাম। আমার দিক দিয়া তিনি আছেন, এইটুকুই অনেকখানি রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ বহন করিয়া আনিত। আমার অন্ধকার গৃহকোণটিতেই আমি অপূর্ব্ব স্বর্গ সৃজন করিতাম—তিনি আছেন এই বিশ্বাসে। কাহারও কোনও ক্ষতি হইত না, মুখের কথাটি পর্য্যন্ত খসাইতে হইত না, শুধু তাঁহার অস্তিত্বের অনুভূতিটুকুই আমার শূন্য জীবনকে ভরিয়া তুলিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। আমি আজীবন তাঁহার নিকট এই ভাবিয়া কৃতজ্ঞ থাকিব যে, আমার অস্তিত্ব অবগত হওয়া সত্ত্বেও তিনি কোনদিন বাতায়ন কিংবা দ্বার রুদ্ধ করিয়া আমার অস্তিত্বকে স্বীকার করেন নাই। আমার প্রাপ্য আমি চক্ষু ও কর্ণের সহায়তায় নিয়মিতই পাইতাম।

তিনি ছিলেন আমার প্রতিবেশিনী। একটি বাড়িরই পাশাপাশি ফ্ল্যাট, মধ্যে দুইটি বাতায়ন আর ছোট্ট একটু প্রাঙ্গণ ব্যবধান মাত্র। সেই বাতায়ন-পথ দুইটিতেও নির্ব্বিবাদে আলো-হাওয়া আসিতে পাইত না, সম্মুখে পল্লখড়িযুক্ত দুইটি কাঠের আবরণ ছিল ; সামনাসামনি কিছু

দেখিবার জো ছিল না। তির্য্যক্‌ভাবে চাহিলেই উন্মুক্ত দ্বারপথে তাঁহার শয়ন-ঘরের মেঝে, টেবিলের এক কোণ ও আরাম কেদারার সম্মুখ ভাগটুকু মাত্র দেখা যাইত, তাঁহার ঘরের অন্য দরজাটি খোলা থাকিলে একেবারে সামনের রাস্তার গ্যাসের আলো চোখে পড়িত, আকাশের একটুখানি ফালি উঁকি দিত।

আমি জানালার ধারে টেবিল সাজাইয়া কলম হাতে টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া যখন বসিয়া থাকিতাম, কল্পনার ধোঁয়ায় মগজে তোলপাড় চলিত, ভাবকে রূপ দিবার ব্যর্থ প্রয়াসে মস্তকের রুক্ষ চুলে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে অন্যমনস্ক হইয়া বাতায়ন-পথে চাহিয়া থাকিতাম, হঠাৎ নজরে পড়িত একটি লালপেড়ে শাড়ির নীচে দুইখানি অলক্তক-রঞ্জিত ছোট ছোট পা। এক মুহূর্ত্তে আমার সমস্ত অন্তর্বিপ্লব কাটিয়া যাইত। কল্পনা শান্ত ও সংহত হইয়া অন্তরের মধ্যেই স্তব্ধ হইয়া যাইত; আমি ব্যাকুল আগ্রহে চাহিয়া থাকিতাম—ওইটুকুই যথেষ্ট, আর বেশী কামনা করিতাম না। আমি ভাল গাহিতে পারিতাম না, তবু পা দুইখানির দিকে চাহিয়া চাহিয়া মনের কামনা স্বরের আকারে বাহির হইয়া আসিত। আমি গাহিতাম—

> দুটি অতুল পদতল রাতুল শতদল,
> জানি না কি লাগিয়া পরশে ধরাতল,
> মাটির 'পরে তার করুণা মাটি হ'ল।
> সে কি রে মোর পথে চলিবে না!

গানের সুর তাঁহার চিত্তকেও অধিকার করিত। দেখিতে পাইতাম, তালে তালে তাঁহার পা দুইখানি মাটিকে আঘাত করিয়া করুণা মাটি করিতেছে। আমার লেখা বন্ধ হইত, কিন্তু মন ভরিয়া উঠিত।

গভীর ভাবাবেগে শেলীর এপিশাইকিডিয়ন পড়িতেছি; এমিলীর অস্পষ্ট ছবি চোখের সম্মুখ দিয়া দ্রুততালে নৃত্য করিতে করিতে ছুটিয়াছে।

'Emily, my Love' বলিয়া জোর দিয়া একটু দম লইতেছি, একটি নারীকণ্ঠের উচ্চ হাস্যলহরী কানে আসিয়া লাগিল—আমি চমকিয়া চকিত হইয়া উঠিলাম। এমিলীর অস্পষ্ট ছবি মিলাইয়া গেল, তাঁহার স্পষ্ট হাস্যধ্বনি আমার কানে বাজিতে লাগিল। স্বামীর সহিত কোনও হাসির কথা হইতেছে নিশ্চয়ই। কান পাতিয়া রহিলাম। Sweet Benediction in the eternal curse—Thou Star above the storm—কিছুই স্মরণে রহিল না; স্বামী-স্ত্রীর উচ্চ হাসি আমার সন্ধ্যার শান্তিকে আলোড়িত করিয়া দিল।

তাঁহারা দুইজন মাত্র থাকিতেন—স্বামী আর স্ত্রী। চাকর বামুন ছিল বাড়তির ভাগ। আভাসে বুঝিতাম, স্বামী বড়গোছের কিছু চাকরি করিতেন; অভাব-অনটনের চিহ্নমাত্র ছিল না। দুইটি প্রাণীতে একটি বৃহৎ ফ্ল্যাট ভাড়া লইয়াছিলেন। চাকর ছিল, বামুন ছিল। একটি শাড়ি তাঁহাকে দুইদিন পরিতে দেখি নাই। যাহাকে বলে পায়ের উপর পা দিয়া থাকা—তিনি সেই ভাবে থাকিতেন। কখনও সেলাইয়ে বসিতেন, কখনও দুই-একটি বই বা মাসিকপত্র নাড়া-চাড়া করিতেন—কখন বা উপরের বা নীচের ফ্ল্যাটে বেড়াইতে বাহির হইতেন; কোনদিন প্রতিবেশিনীরা তাঁহার বাড়িতেই জমায়েৎ হইতেন, সেই দিনগুলিতে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক খবর সংগ্রহ করিতে পারিতাম। তাঁহার বাবার কথা, মায়ের কথা, ভগিনীপতি ও বোনেদের কথা, সর্ব্বোপরি তাঁহার 'উনি'র কথা। তিনি মহানন্দে সকলকে সকল সংবাদ দিতেন।—উনি প্যাজ না দিয়ে মাংস খান—প্যাজ না দিলে নাকি আবার মাংস হয়—তোমরাই বল তো দিদি? আপিসের বড় সাহেব ওঁকে ভারী খাতির করে, বিবাহের রাত্রে তাঁহার বোনেদের কাছে 'উনি'র নাকাল হওয়ার কথা। নিজের ছোট বোনের বিবাহের কথা,—সে থার্ড ক্লাসে পড়ে, তার ইচ্ছা ম্যাট্রিকুলেশন পাস করার আগে বিয়ে করবে না, কিন্তু কেমন ক'রেই

বা তাকে মনে রাখা যায়, তাঁর পিসতুত ভায়ের কথা—রেঙ্গুনে তিনি ডেমনেস্ট্রেটরি করেন, ডেমনেস্ট্রেটর ঠিক প্রফেসরের মতই, ইত্যাদি নানা ধরনের আলাপে শুনিয়া শুনিয়া তাঁহার সম্বন্ধে বাস্তবে কল্পনায় অনেকখানিই জানিয়া লইয়াছিলাম।

তাঁহার নাম জানিবার সুযোগও একদিন পাইলাম। সেদিন তিনি কোথায় যেন বেড়াইতে গিয়াছিলেন। বাড়ির দরজায় তালা দেওয়া ছিল। একজন ভদ্রলোক হঠাৎ আমাদের ফ্ল্যাটে আসিয়া একটি চিঠি দিয়া গেলেন—যেন পাশের বাড়ির লোকেরা ফিরিয়া আসিলেই চিঠিটি তাঁহাদিগকে দেওয়া হয়—খোলা চিঠি। পড়িবার লোভ সামলাইতে পারিলাম না। বুঝিলাম, ভদ্রলোকটি তাঁহার ভাই। তাঁহার ডাকনামটি জানিলাম—খাঁদু। ভাল নামটি জানিবার সৌভাগ্য হইল না। তাঁহার বাপ-মায়ের উপর রাগ হইল; নিখুঁত মুখের গড়ন, টিকলো নাক—ওর নাম হইল কি না খাঁদু! ডাকনাম খাঁদু হইলে ভাল নাম কি হইতে পারে, ইহা লইয়া অনেক গবেষণা চলিল। কোন নামই মনঃপূত হইল না;

সেই দিন হইতে খাঁদুকে লইয়া আমাদের নীরস দিনগুলি সরস হইয়া উঠিল। খাঁদুকে আজ রোগা দেখাইতেছে, খাঁদুর সর্দ্দি হইয়াছে, ময়ূরকণ্ঠী কাপড়খানাতে খাঁদুকে চমৎকার মানাইয়াছে, খাঁদু আজ কোথায় যেন বেড়াইতে গিয়াছে, ইত্যাদি আলোচনায় আমরা তাঁহাকে অনেকখানি আপনার করিয়া লইয়াছিলাম।

রবিবারের দিনটা যেন তাঁহাদের বাড়িতে উৎসব পড়িয়া যাইত। সেদিন বিশেষ খাওয়ার ব্যবস্থা। অনেকে নিমন্ত্রিত হইতেন। রবিবারের মধ্যাহ্নে আহার সমাপ্ত করিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া খোলা খড়খড়ির পথে মনোযোগ দিয়া সব লক্ষ্য করিতাম। সেদিন আমারও যেন উৎসব পড়িয়া যাইত।

তাঁহার স্বামী বেলা দশটার সময় অফিস চলিয়া যাইতেন, পাঁচটার সময় ফিরিতেন। সেই নিঃসঙ্গ দ্বিপ্রহরে সেলাই, পাঠ ও প্রতিবেশিনীদের সহিত আলাপ ছাড়াও আরও কোনও দিক দিয়া কেহ তাঁহাকে সঙ্গ দিত কি না, তাঁহার অন্তর্যামীই বলিতে পারিবেন। আমি কিন্তু তাঁহার জন্য দুপুরের অতি প্রিয় নিদ্রাটিকে বিসর্জন দিয়াছিলাম। টেবিলের পাশটিতে বসিয়া মাথা-মুণ্ডু কি যে করিতাম, কাহারেও তাহার হিসাব দিতে হইলে লজ্জায় পড়িতে হইবে। কবিতা পাঠ করিতাম, গান গাহিতাম, আর দূর দিগন্তের দিকে চাহিবার ভান করিয়া 'কাব্য' করিতাম। আমার এই অনন্যনিষ্ঠা তাঁহাকে কখনও বিচলিত করে নাই। এইজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

তাঁহার নিরীহ স্বামীর উপর তাঁহার দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ছিল; বস্তুত সেই ভদ্রলোকের নিরীহতায় আমি অনেক দিন মনে মনে সহানুভূতি দেখাইয়াছি। একদিন তাঁহার ফিরিতে রাত্রি হইয়াছিল। পত্নী ঘুমাইয়াছেন—এই ভরসায় তিনি যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে চাকরকে ডাকিলেন। দরজা খোলা হইল। বাবু চাকরকে বলিলেন, তিনি রাত্রে কিছু খাইবেন না। এই অবস্থায়, 'তিনি' হঠাৎ আসিয়া পড়িয়া গম্ভীর গলায় বলিয়া উঠিলেন, কেন, হোটেলে খেয়ে এসেছ বুঝি? হঠাৎ এই ভাবে আক্রান্ত হইয়া ভদ্রলোকের মুখ কি ভীতত্রস্ত ভাব ধারণ করিয়াছিল, লণ্ঠনের আলোকে তাহা দেখিয়া আমি কৌতুক অনুভব করিলাম। তাঁহার সে ভাব আমি কখনও বিস্মৃত হইতে পারিব না। পূর্ণ উদরে সেই রাত্রে আবার তাঁহাকে আহার করিতে হইয়াছিল।

তাঁহারই মুখের কথায় তাঁহার পরিচয় যতটুকু পাইয়াছিলাম ততটুকুই আমার যথেষ্ট ছিল; আমি কল্পনার রং চড়াইয়া বাকিটুকু পূরণ করিয়া লইতাম। ইচ্ছা করিলেই তাঁহার সম্বন্ধে বিস্তৃত খবর পাইতে পারিতাম। উপরের ফ্ল্যাটের এক ভদ্রলোকের সহিত আমার বিশেষ পরিচয় হইয়াছিল,

তাঁহার স্ত্রী ছিলেন 'তাঁর' বিশিষ্ট বন্ধু। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে খবরাখবর জানিয়া লইবার সুবিধা যথেষ্ট ছিল। কিন্তু, কেন জানি না, কোনদিন বাহিরের কাহারও সহিত তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারি নাই। আমাদের বাড়ির তিনটি প্রাণী মাত্র ঘরে বসিয়া তাঁহার সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করিতাম। আমার সৌভাগ্য ছিল যে, মাত্র আমার ঘরটি হইতেই তাঁহাদের শয়নঘরের অভ্যন্তর অবধি দেখা যাইত;—বন্ধুরা তাঁহার কথাবার্ত্তার শ্রবণ-সুখ মাত্র পাইতেন। দর্শনের বেলায় আমার সাহায্য ছাড়া গতি ছিল না, এজন্য তাহারা আমাকে হিংসা করিত।

এই ভাবে বেশ দিন চলিতেছিল। একদিন বাহির হইতে ফিরিয়া আসিয়া মর্ম্মান্তিক আঘাত পাইলাম। তিনি চলিয়া গিয়াছেন। অন্য অনেক দিন বাড়িতে ফিরিয়া তাঁহাকে দেখি নাই, কিন্তু মন এত চঞ্চল হয় নাই—কোথাও নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া, থিয়েটার বায়স্কোপ দেখিয়া কিংবা বেড়াইয়া তিনি আবার বাড়ি ফিরিয়াছেন। কিন্তু শুনিলাম এবার 'অনেক কালের যাত্রা তাঁহার অনেক দিনের পথে।' তল্পি-তল্পা বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছেন। মন ভয়ানক দমিয়া গেল। সমস্ত বাড়িখানা কঠোর কারাগার বলিয়া মনে হইল। তিক্ততায় চিত্ত ভরিয়া গেল। কিন্তু কি করিব, নিরুপায়! কাজে মন বসে না, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরিবার কোনও তাড়া নাই। আড্ডার আশ্রয় লইলাম, কিন্তু শান্তি পাইলাম না। যে অলক্ষ্য জীবন-ধারা আমার শুষ্ক জীবনকে রসদান করিতেছিল, কে যেন তাহাকে সরাইয়া লইল; দিনে দিনে আমার শাখা-পল্লব শুকাইয়া আসিতে লাগিল।

তাঁহার স্বামী কয়দিন পরে ফিরিয়া আসিলেন। এতদিন এই ভদ্রলোকটির সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই ভাবিবার অবসর পাই নাই। আজ দেখিলাম, তিনিও ব্যথা পাইয়াছেন। এই অভাবের মধ্যে আমরা দুইজনে এক নিবিড় বন্ধন অনুভব করিলাম। তাঁহার প্রতি সহানুভূতিতে অন্তর ভরিয়া গেল। তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া বলিতে ইচ্ছা হইল, এই

বিরহের ব্যথা শুধু তোমার একলার নয় বন্ধু,—আমিও ইহার ভাগ পাইতেছি ; তোমার স্ত্রী বলিয়া তুমি যে কিছু বেশি যন্ত্রণা পাইতেছ, তাহা মনে করিও না—আমার প্রতিবেশিনীর অভাবে আমার যন্ত্রণা কিছু কম নয়। তুমি তাঁহাকে পাইয়াছ বলিয়াই তাঁহার অভাবে তোমার দুঃখ, আমি তাঁহাকে পাই নাই বলিয়াই আমার দুঃখ বেশি।

শূন্য ঘরের দিকে চাহিয়া থাকি। তাঁহার স্বামী বাহিরে-বাহিরে থাকেন, সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে আর দীপ জ্বলে না, ধূপ-ধুনার গন্ধ ভাসিয়া আসে না, চাকর-বামুন বন্ধু-বান্ধবেরা আসিয়া কোলাহল করে—আমার রাগ হয়। তিনি থাকিলে কি এমনটি হইবার জো ছিল ?

আগে খুব ভোরে উঠিতাম ভোরে উঠিবার পুরস্কার পাইতাম বলিয়া। কোন রকমে মুখে চোখে জল দিয়া চেয়ারটি দরজার দিকে ফিরাইয়া বসিয়া তাঁহার জাগরণের প্রতীক্ষা করিতাম, খট করিয়া শব্দ হইত, দরজা খুলিয়া যাইত, তিনি আলুথালু বেশে একবার বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইতেন—তাঁহার দৃষ্টি যেন বলিত, এই যে, প্রাতঃপ্রণাম। আমিও চোখে চোখে প্রাতঃনমস্কার জানাইতাম। সেই দৃষ্টিটুকুর রেশ সমস্ত দিন সর্ব্বাঙ্গে রিমঝিম করিত। আজকাল বিছানা আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকি ; নেহাৎ যখন না উঠিলে নয় তখন উঠি। জানালা দিয়া দেখি, স্বামীটিরও আমার মত দুর্দ্দশা। হাঁ করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া থাকেন, চাকর-বামুনের মর্জ্জির উপর নির্ভর করিতে হয়। তাঁহার দুঃখ দেখিয়া মাঝে মাঝে একটু আনন্দও যে না পাই তাহা নয়।—কেন, বন্ধু, সাধ করিয়া দুঃখ ডাকিবার প্রয়োজন কি ছিল ?

* * * *

সুখে দুঃখে একটি বছর কাটিয়া গেল। দুঃখের ভাগই বেশি ; স্বামীটি মাঝে মাঝে দুই-চারি দিনের জন্য অন্তর্হিত হন। ফিরিবার পর তাঁহাকে দেখিলে আমি উতলা হইয়া উঠি। জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, বন্ধু,

তিনি কেমন আছেন? ভালই বোধ হইতেছে কেন! আশে-পাশের সকলের সঙ্গেই অল্পবিস্তর আলাপ হইল। তাঁহার সঙ্গে কেন জানি না পরিচয় করিতে পারিলাম না ;—ঈর্ষা নয়, এ আমার দুর্ব্বলতা।

তিনি আসিলেন ছয় মাসের শিশু সঙ্গে লইয়া। আমার শুষ্ক মরু-বুকে আবার স্রোতোধারা বহিতে শুরু করিল ; আমার শুষ্ক গাছে ফল ধরিল। শিশুর ও মাতার কলকাকলীতে আমার প্রভাত-সন্ধ্যা মুখরিত হইয়া উঠিল। অনেক দিন পরে তাঁহার সহিত চোখোচোখি হইল—এই যে আসিয়াছেন! তাঁহার ভাবটা এই—আপনি ভাল ছিলেন আশা করি!

এবার শুধু তিনি নন, তাঁহার কন্যাটি পর্য্যন্ত আমার আনন্দের রসদ যোগাইতে লাগিল। শশিকলার মত দিনে দিনে সে আমারই চোখের সম্মুখে বাড়িতে লাগিল। ঘটা করিয়া তাহার অন্নপ্রাশন হইল, গায়ে গহনা উঠিল।

মশারি ও দোলনা ছাড়িয়া শিশু বাহিরে আসিল। সে চলিতে শিখিল। কান্না-হাসি হইতে তাহার কণ্ঠে অস্ফুট ভাষা ক্রমশ স্ফুটতর হইতে লাগিল ; সে আজকাল অসম্ভব রকম বিকৃত করিয়া পৃথিবীর সকল জিনিসের নামকরণ করে ; পৃথিবীর দৈনন্দিন খবর সংগ্রহে তাহার অত্যধিক আগ্রহ দেখা যাইতে লাগিল। মায়ের নিঃসঙ্গ দ্বিপ্রহর এখন এই মেয়েটিকে লইয়া অবলীলাক্রমে কাটিয়া যায়। মায়েতে-মেয়েতে কথা হয়, আমি উৎকর্ণ হইয়া অলক্ষ্যে বা লক্ষ্যে থাকিয়া সেই রসধারা পান করি।

আমার আইন পাঠ সমাপ্ত হইল। এইবার আমার দেশে ফিরিবার পালা। কিন্তু যাইতে পারিলাম না। পিতাকে জানাইলাম, কলিকাতায় থাকিলে একটা প্রফেসারি জুটিবার সম্ভাবনা আছে। আমি রহিয়া গেলাম।

ডিগ্রী ভাল ছিল, ওকালতি পড়িতে পড়িতেই চেষ্টা করিলে চাকরি পাইতে পারিতাম, কিন্তু চাকরি করিতে পারি নাই। এবার অগত্যা

চাকরির সন্ধানে বাহির হইতে হইল। কম মাহিনায় একটা প্রফেসারি জুটিল। বন্ধু দুইজন বিদায় হইল। আমি একলা রহিয়া গেলাম।

চারিদিক হইতে আমার বিবাহের সম্বন্ধের কথা কানে আসিতে লাগিল। আমি ভয় পাইলাম। বিপদ যখন বিশেষ আকার ধারণ করিয়া ভাবী পত্নীর জ্যেষ্ঠতাত-রূপে আমার শূন্য আলয়ে একদিন দেখা দিলেন, তখন দেখিলাম চুপ করিয়া থাকা চলে না। মুখ ফুটিয়া পিতাকে জানাইলাম, বিবাহে আমার প্রবৃত্তি নাই, অন্তত আরও কিছুদিন সবুর করিতে চাই। কয়েকখানি পত্র-বিনিময় হওয়ার পর নিশ্চিন্তে থাকিবার অবসর পাইলাম।

বিবাহ করিবার প্রবৃত্তি সত্যসত্যই আমার ছিল না। মন যখন সঙ্গিনী-পিয়াসী ছিল, তখন পৃথিবীর যাবতীয় অনূঢ়া কন্যাদের লইয়া আমি স্বপ্ন রচনা করিতে পারি নাই—এক স্থানে আসিয়া আমার কল্পনা সার্থকতা লাভ করিয়াছিল। অবিবাহিত যুবক যে অরূপ ধোঁয়ার রাজ্যে বাস করে, একজন মানসীকে অবলীলাক্রমে বিস্মৃত হইয়া প্রতিদিন নূতন মানসীর পশ্চাতে ধাবিত হয় এবং এই ছোটাছুটিতে হাঁপাইয়া উঠিয়া শুধু দম লইবার মানসে যে হোক সে হোক একজনকে জীবন-সহচরী করিয়া নির্ব্বিবাদে জীবন কাটাইয়া দেয়, আমি তাহাদের মত অস্পষ্টতার মধ্যে থাকিতে পারি নাই। একদিন মাত্র স্বপ্ন-সূচনায় তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম, মন বলিয়াছিল—বা, বেশ তো! তারপর তাঁহাকে ঘিরিয়াই আমার যত কবিতা-কাব্য আকার গ্রহণ করিল; আর দ্বিতীয় মানসী পরিগ্রহ করিবার অবকাশ পাইলাম না।

আজ যখন তিনি জননীর পদবী লইয়া ফিরিয়া আসিলেন, আমি চকিত হইয়া দেখিলাম, আমিও কখন্ যেন জীবনের এক কোঠা হইতে ভিন্ন কোঠায় আসিয়া পড়িয়াছি, আমারও পদবী-বৃদ্ধি হইয়াছে। তিনি এখন আর 'মানসী' নন, তিনি এখন জননী। শিশুর নিত্য নূতন রূপ ও লীলা

আমাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। যেখানে একটিমাত্র বন্ধন ছিল, সেখানে দুইটি প্রবল বন্ধন অনুভব করিলাম।

এখন আর দ্বিপ্রহরে মা ও মেয়ের লীলা সম্ভোগ করিতে পাইতাম না। কলেজের অন্যমনস্ক ছেলেদের নিয়মিত অর্থনীতির পাঠ দিতে হইত। কিন্তু মন আমার বাড়িতে পড়িয়া থাকিত। অধ্যাপনার অবসরে যখন অধ্যাপকবৃন্দের শ্মশ্রু ও গাম্ভীর্য্যের মধ্যে বসিয়া থাকিতাম, তখন একটি শিশুর কলকাকলী কর্ণে শুনিতে পাইতাম; আর নানা অসম্ভব চিন্তায় মন পীড়িত হইত, হয়তো মা ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, মেয়ে বারান্দায় রেলিংঙের ভিতর পা ঢুকাইয়া দিয়া আর বাহির করিতে পারিতেছে না, চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে; দোয়াত লইয়া খেলিতে খেলিতে হয়তো খানিকটা কালিই খাইয়া ফেলিয়াছে আর যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে; কি করিবেন বুঝিতে না পারিয়া মা হয়তো কাঁদিতে বসিয়া গিয়াছেন—এই ধরনের নানা চিন্তায় অধ্যাপকের মনও বিভ্রান্ত হইয়া পড়িত।

খুকু দুইয়ের কোঠায় পা দিল। ইতিমধ্যে জীবনেও আমার বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। বাবা মারা গেলেন। পিতার শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম শেষ হইলে বিমাতা বৈমাত্রেয় ছোট ভাই ও বোনটিকে লইয়া বাপের বাড়ি আশ্রয় করিলেন। দেশের বাড়ি শূন্য পড়িয়া রহিল। বিমাতা বারম্বার পত্র দিতে লাগিলেন, এমত অবস্থায় আমার বিবাহ করা একান্ত আবশ্যক। অস্বীকার করিতে পারিলাম না, কিন্তু কিছু সময় চাহিলাম। কন্যাদায়গ্রস্ত পরিচিত লোকেরা বিমাতার সহিত ষড়যন্ত্র শুরু করিয়া দিলেন। আমি কি করিব কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না।

বয়স আমার যতই হউক, মনে মনে আমি প্রৌঢ়ত্বে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। বিবাহের কথায় মনে দক্ষিণাবায়ু বহিতে আরম্ভ করিল না, শীতের কম্পন অনুভব করিলাম। নেহাৎ প্রয়োজনের খাতিরে যদি বিবাহ করিতেই হয় নিজেও সুখী হইব না, একজন নিরীহ বালিকাকেও

অসুখী করিব। এমনই আমার দুর্ভাগ্য, একটা ছোট ভাইও ছিল না, যাহার বিবাহ দিয়া বিমাতাকে ঠাণ্ডা রাখিতে পারি। যত দিন যাইতে লাগিল, আমি ততই অস্থির হইয়া পড়িতে লাগিলাম।

খুকু বড় হইয়াছে। তাহার অন্য নাম জানি না। সে আমার কাছে খুকুই রহিয়া গেল। সকালে নিদ্রাভঙ্গের পর হইতে রাত্রিতে নিদ্রিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সে সর্ব্বদা বকিয়া যায়। সে সব কথার অর্থ অন্য কেহ না বুঝুক আমার কাছে সেগুলি বহু অর্থই বহন করিয়া আনিত। আমাকে জানালায় লক্ষ্য করিয়া রেলিং ধরিয়া ঝুঁকিতে ঝুঁকিতে সে 'এই' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিত। আমি রোমাঞ্চিত গাত্রে সভয়ে বলিয়া উঠিতাম, প'ড়ে যাবে, প'ড়ে যাবে। মা আসিয়া মেয়েকে সরাইয়া লইয়া যাইতেন।

মাও আজকাল মাতৃত্বের গৌরবে অটল হইয়া বিরাজ করিতেছেন; চালচলন ভারিক্কি গোছের হইয়াছে, খুকীকে লইয়া তিনি যে সকল সম্ভব অসম্ভব ব্যাপারের গুরুগম্ভীর আলোচনা করিতেন, তাহার কিছু কিছু আমি শুনিতে পাইতাম। মা হয়তো খুকুর কোনও একটা অন্যায়ের প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, খুকু, ছি, অমন ক'রো না, করতে নেই। খুকু মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, কেন মা। এবং পরক্ষণেই পাশের বাড়ির ছেলেটা সম্বন্ধে এমন মন্তব্য প্রকাশ করিল, যাহাতে মায়ের গাম্ভীর্য্যও টলিয়া গেল, তিনি হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, দাঁড়াও, তোমার বাবা আসুন। তোমাকে স্কুলে দিয়ে আসবেন' খন, তখন মজা টের পাবে। খুকু বলিয়া বসিল, তুমিও যাবে তো মা? দূর বোকা, বলিয়া মা হয়তো মেয়েকে চুমু খাইলেন।

পিতার চালচলন তাহার নিকট ভারী রহস্যময় বলিয়া বোধ হইত। তিনি যে সকালে বসিয়া হিজিবিজি আঁক কাটেন, মা তাঁহার খাবার চা ইত্যাদি সম্বন্ধে সরবরাহ করেন, তাড়াতাড়ি স্নানাহার করিয়া তিনি বাহির

হইয়া যান, সন্ধ্যার আগে ফিরিয়া আসেন, আবার বেড়াইতে বাহির হন— এবং কখন্ আসিয়া ঘুমাইয়া পড়েন, খুকু তাহা জানিতেও পারে না। পিতার এইসব ব্যবহারে খুকু কৌতুক অনুভব করে, মাতাকে প্রশ্নে প্রশ্নে অস্থির করিয়া তোলে। খুকু জিজ্ঞাসা করে মা, বাবা কোথা যান? মা বলেন, আপিসে। খুকী হয়তো অমনই বলিয়া বসিল, তুমি আপিস যাও না কেন, মা? মা অনেক ভাবিয়া উত্তর করিলেন, তা হ'লে বাড়িতে থাকবে কে? খুকু বলিল, কেন মাক্‌কণ্ড। মার্কণ্ড বাড়ির চাকর।

ইহার পরে আমার প্রতিবেশিনীর ইতিহাস আর বেশি নাই। একদিন অশুভক্ষণে খুকুর পিতার সহিত পরিচয় হইয়া গেল। বাজার করিতে গিয়াছিলাম; দেখি, বাবার হাত ধরিয়া খুকুও বাজারে গিয়াছে। আমাকে দেখিবামাত্র খুকু চিনিতে পারিল; ডাকিল, এই! আমি তাহার কাছে গিয়া তাহাকে কোলে লইয়া খুকুর পিতাকে নমস্কার করিলাম। তিনি প্রত্যাভিবাদন করিয়া খুকুকে কোলে লইতে গেলেন। আমি বলিলাম, থাক্ না, আপনি অপরিচিত হ'লেও খুকু আমাকে চেনে। আমি আপনাদেরই প্রতিবাসী। তিনি বলিলেন, তিনি জানেন। তার পর বাজার করিয়া ফিরিতে ফিরিতে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। তিনি আমার বিষয়ে অনেক খবরই রাখেন দেখিলাম। জানিয়া শুনিয়া আমাকে হঠাৎ প্রশ্ন করিলেন, আপনি একলা থাকেন দেখি, আপনার গিন্নী কোথায়? ইচ্ছা হইল বলি, আপনার বাড়িতে। হাসিয়া বলিলাম, সে বালাই নেই। আমি বিবাহ করি নাই। তারপর জাতি-গোত্রের খবর। দেখিলাম, ভদ্রলোক নিরীহ হইলেও সংসারী বটেন। আবিষ্কার করিলেন, শালীর সহিত আমার বিবাহ চলিতে পারে। সেই রাত্রে আমার প্রতিবেশিনীর গৃহে আমার নিমন্ত্রণ হইল।

পূর্ণ পাঁচ বৎসরের দূর হইতে নিবিড় পরিচয়ের পর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আলাপ হইল। অম্লান বদনে তিনি বলিলেন, আপনার

এলা শুনেছি, আপনিই বুঝি কবিতা পাঠ করেন, গান করেন ? এতদিনের পরে—'বুঝি' ! আমার হাসি পাইল, বলিলাম, হ্যাঁ, আমিই সময়ে অসময়ে আপনাদের বিরক্তির কারণ হয়েছি হয়তো।

খুকু আপনার কথা মাঝে মাঝে বলে বটে। আমি ভেবেছিলুম ওটা মেস। আমি মুখের কোণে একটু শীর্ণ হাসি টানিয়া বলিলাম, অন্যায় ভাবেন নি, চাকর-ঠাকুরের কৃপায় যতদিন থাকতে হয় ততদিন মেসই তো।

তারপর আমার সংসারের কথা, বাড়ীতে কে আছে, ভাইবোন কয়টি ইত্যাদি। সবগুলির জবাব দিলাম। বুঝিলাম, ইহার পর আক্রমণ শুরু হইবে।

বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম, কিন্তু বাতায়নের দিকে আর চাহিতে পারিলাম না। এক নিমেষের পরিচয়ে আমার সমস্ত স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল। কোথা দিয়া অলক্ষ্যে কে যেন আমার জীবন-বীণার তন্ত্রীতে আঘাত দিয়া তাহা ছিঁড়িয়া দিল। আমার সমস্ত দিন ও রাত্রি বিস্বাদ হইয়া গেল।

সেই ফার্স্ট ক্লাসে পড়া মেয়েটি এতদিনে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিয়াছেন, এখনও বিবাহ হয় নাই। তাঁহারই যূপকাষ্ঠে বলিস্বরূপ আমাকে উৎসৃষ্ট হইতে হইবে প্রস্তাব আসিল। মাতার অনুমতি লইয়া তাঁহাকেই বিবাহ করিলাম। কিন্তু শ্যালিকার প্রতিবেশী হইয়া আর থাকিতে পারিলাম না। নববিবাহিত বধূ অনেক অনুরোধ করিল, শ্যালিকার তরফ হইতেও যথেষ্ট উপরোধ আসিল; কিন্তু সেখানে থাকিতে পারিলাম না। সকলের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া আমি অন্য বাড়িতে উঠিয়া গেলাম। যেখানে গত পাঁচ বৎসর কাল অদৃশ্য পরিচয়ের সূক্ষ্ম বাঁধনে বাঁধা পড়িয়াছিলাম, সেখানেই শ্যালিকা-সম্বন্ধরূপ কাছির বাঁধন মর্ম্মান্তিক হইয়া বাজিল। আমি তাহা অন্তরে অন্তরে প্রতিনিয়ত অনুভব করিতে লাগিলাম। আর কেহ তাহাতে কিছুমাত্র পীড়িত হইল কি না বুঝিতে পারিলাম না; কল্পনা

করিবার ভরসাও হইল না। শুধু খুকু মাকুর মত এবাড়ি ওবাড়ি ছুটা-ছুটি করিয়া আমাদের পূর্ব্বপরিচয় অক্ষুণ্ণ রাখিল।

আমার কল্পলোকের 'খাঁদু' মরিয়া গিয়া বাস্তব জগতের মাধবী দেবী হইলেন, আমার প্রতিবেশিনী আমার নিকট-আত্মীয়ারূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহার গৌরববৃদ্ধি হইল কি না তিনিই বলিতে পারেন, আমি কিছু বলিব না।

আশ্রয়হীনা

এক

সুধীর ছুটি লইয়া তাহার পিতার কর্ম্মস্থল সাদপুরে আসিয়া বহুকাল পরে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে সিমলাতে সেক্রেটারিয়েটে কাজ করিত। তিন বছর সে বাপ-মার কাছ ছাড়া। সেই পাহাড়ে আর শীতের দেশে গরিব কেরানীর জীবন কলনৃত্য করিয়া ছুটিত না, নেহাত যেন না চলিলে নয় এমন একটা নিঃসাড়-সঙ্কোচে অতি মন্থর গতিতে তাহার দিন কাটিতেছিল। জলভারাক্রান্ত চিক্কণশ্যামা বাংলার অলস দিনগুলির কথা স্মরণ করিয়া সে প্রত্যহ একটি করিয়া ছুটির দরখাস্ত মুসাবিদা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিত। এতদিনে সে কি জানি কেমন করিয়া একটা দরখাস্ত সাহেবের কাছে পেশ করিয়া ছুটি মঞ্জুর করাইয়া পূরা তিন মাসের অবকাশে মহানন্দে দেশে ফিরিয়াছে।

সুধীরের পিতা সাদপুরের ডাকঘরের পোস্টমাস্টার, বহুকাল একস্থানে থাকার দরুন সেই ছোট্ট জায়গাটুকুতেই আপনাকে বেশ মানাইয়া লইয়াছেন। বসতবাটি-সংলগ্ন ছোট্ট বাগানটুকুও এতদিনে বেশ ফলে ফুলে গজাইয়া উঠিয়াছে। সুধীর বহুকাল দূরে দূরে ফিরিয়া প্রথমটা মায়ের আদরে ও ছোট বোনের আবদারে বেশ একচোট হাবুডুবু খাইয়া লইল, কিন্তু কয়দিন যাইতে না যাইতে সিমলা শৈলের সেই বাঁধা-ধরা জীবনের কথা ভাবিয়া বিমর্ষ হইয়া উঠিতে লাগিল। অভ্যাসদোষে তাহার কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিত। প্রচুর অবসর, অথচ তাস পাশা দাবা খেলিয়া বা গল্পচর্চ্চা করিয়া দিন কাটাইবার মত সঙ্গী তাহার ছিল না, সে কোনমতে ছোট বোন অমিয়ার হারমোনিয়মটিকে সঙ্গী করিয়া উদাস জীবন যাপন করিতে লাগিল।

এমন অবস্থায় কিশোরী রাণীকে দেখিয়া তাহার বিবাগী মন চকিত হইয়া উঠিল। সুধীরের বিবাহ করিবার বয়স হইয়াছিল, কিন্তু বিবাহিত জীবনের বাস্তব ও কাল্পনিক নানা অসুবিধার কথা ভাবিয়া ভাবিয়া বিবাহের শখটা অঙ্কুরে বিনাশ করিয়া বসিয়াছিল। রাণী সুধীরদের পাশের বাড়ির মেয়ে, বাড়ির কর্ত্তা সারদাবাবুর ভাগ্নী, রূপে গুণে মেয়েটি লক্ষ্মী ও লোভনীয়। এখনও বিবাহ হয় নাই।

সারদাবাবু স্থানীয় স্কুলের মাস্টার। আজ বছর তিনেক মেয়েকে তাঁহার নিকট দিয়া তাঁহার বিধবা ভগ্নী দেশের বাটিতে ঠাকুর-সেবায় লাগিয়া আছেন। মাঝে মাঝে তিনি দুই-একদিনের জন্য আসিয়া মেয়েকে দেখিয়া যান।

সারদাবাবু দেখিতে খুব সেকেলে গোছ মনে হইলেও ভাগ্নীর শিক্ষা-দীক্ষায় তিনি যথেষ্ট মনোযোগ ও সাহায্য করিতেন। ফলে রাণী বেশ শিক্ষিতা হইয়া উঠিতেছিল।

রাণী অমিয়ার সমবয়সী সখী। অমিয়ার আজ বছরখানেক বিবাহ হওয়াতে সখীত্ব বন্ধন একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। অমিয়া এমন একটি জগতের পরিচয় পাইয়াছে, যেখানে রাণী প্রবেশাধিকার পায় নাই। পূর্ব্বের মত ঘন ঘন না আসিলেও রাণী মাঝে মাঝে অমিয়ার কাছে আসিয়া তাহার স্বামীর গুণপনা বীরপনার কথা অনর্গল শুনিয়া শুনিয়া কেমন যেন বিমর্ষ হইয়া বাড়ি ফিরিত।

রাণীকে দেখামাত্র সুধীরের ভাল লাগিল, বস্তুত ভাল লাগিবার কথাই বটে। তাহার সৌন্দর্য্যের চারিদিকে এমন একটা ব্যথার প্রলেপ ছিল যে, প্রথম দৃষ্টিতে মনে হইত, বা, বেশ তো! মনটা তাহার অজানিত বেদনার প্রতি সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিত।

সুধীরের বাবা মা কয়েকবার সুধীরের বিবাহের সম্বন্ধ করিয়া পুত্রকে

রাজি করিতে বিফলমনোরথ হইয়া একটু মনঃক্ষুণ্ণ, সম্প্রতি আর তাঁহারা বিবাহের কথাবার্ত্তা বলেন না।

রাণীকে দেখা অবধি সুধীরের মনে দক্ষিণা বাতাস বহিতে শুরু করিয়াছে। গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া গেলে সে তাহার উপাধান-পার্শ্বে একখানা কচি মুখ কল্পনা করিয়া রোমাঞ্চিতকলেবর হইত। শেষে সে একদিন অমিয়াকে বলিয়াই ফেলিল, অমি, তোরা আমার বিয়ের জন্য এত উঠে প'ড়ে লেগেছিলি, রাণীর সঙ্গে যদি বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারিস তো বিয়ে করি। অমিয়া প্রস্তাব শুনিয়া খুশি হইয়া উঠিল,—সে তো বেশ হবে দাদা, রাণী আমার বউদি হবে, ভাবতেই কেমন হাসি পাচ্ছে।—বলিয়াই খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

আরে পাগলি, থাম্ থাম্, তুই এখনি গাঁ-গোল করবি দেখ্ছি, এমন করলে আজকেই পালাব ব'লে দিচ্ছি। হ্যাঁরে, ওদের সঙ্গে বিয়েতে কোন বাধা নেই তো?

বাধা আবার কি থাকবে দাদা, ওরা তো বসু—কুলীন। আর সারদাবাবুরা যখন আমাদের সগোত্র তখন ওঁর ভাগ্নী ভিন্ গোত্র নিশ্চয়ই হবে।—বলিয়া লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। সারদাবাবুর পুত্রের সহিত অমিয়ার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল, কিন্তু সগোত্র হওয়াতে বিবাহ হয় নাই।

অমিয়া কিন্তু গাঁ-গোল করিল। মায়ের কাছে কথাটা পাড়িয়াই মায়ের সম্মতি আছে জানিয়া রাণীর কাছে গিয়া ছল করিয়া কথাটা পাড়িল, দাদাকে তাহার কেমন লাগে! রাণী চমকিয়া উঠিল। তাহার মুখ বেদনায় কালো হইয়া গেল। অমিয়া ভাবিল, লজ্জা! সারদাবাবুর স্ত্রী শুনিয়া ভাল মন্দ কিছু বলিলেন না।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় সুধীরের বাবা সারদাবাবুর কাছে কথা পাড়িলেন। সারদাবাবু এ সম্বন্ধে কথা শুনিয়াছিলেন, শুনিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন

না, শান্তভাবে বলিলেন, ভাগ্নীর বিবাহে তাঁহার কোনই হাত নাই, দিদি যা খুশি করিবেন তবে তিনি দিদিকে এ কথা লিখিতে পারেন। জামাই হিসাবে সুধীরকে তাঁহার পছন্দ হইবে বলিয়াই মনে হয়।

দিদিকে লেখা হইল। সুধীর বেশি করিয়া হারমোনিয়ম বাজাইয়া গান গাহিতে শুরু করিল, অমিয়া ভাবী ভ্রাতৃবধূকে লইয়া তুমুল আন্দোলন করিতে লাগিল।

রাণীর মা আসিলেন। সেদিন বিকালে বৈঠকখানা-ঘরে বসিয়া সুধীর সবেমাত্র ভাবী বধূর কচি মুখখানার কল্পনায় বিভোর হইতে আরম্ভ করিয়াছে এমন সময় সারদাবাবুর বাড়ির চাকর আসিয়া তাহার হাতে একখানা চিঠি দিল। অপরিচিত স্ত্রী-হস্তাক্ষর। রাণীর চিঠি। চিঠি পড়িয়া সুধীর হতভম্ব হইয়া গেল। আজ সন্ধ্যার পর রাণী অতি অবশ্য তাহার সহিত দেখা করিতে চায় বিশেষ দরকার।

সুধীর সিমলাপ্রবাসী হইলেও এতটা পছন্দ করিল না। কি রকম বেহায়া মেয়ে বাপু! ভাবী বরের সহিত বিবাহের পূর্ব্বে সাক্ষাৎ করিতে চায়!

সুধীরদের বাগানের মালীর ঘরের পিছনে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল।

সুধীর কত কি ভাবিয়া একটু বিরক্ত ভাবেই রাণীকে সম্বোধন করিল। রাণী যতদূর সম্ভব আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া ধীর বিনীত ভাবে তাহাকে জানাইল যে, বিশেষ বিপদে পড়িয়া সে তাঁহাকে ডাকিতে বাধ্য হইয়াছে, তিনি যেন মনে কিছু না করেন। সুধীর এ ভনিতাটুকুও পছন্দ করিল না, কিন্তু রাণীর ব্যথাতুর দৃষ্টিখানি তাহার মনকে পীড়া দিতে লাগিল, সে আর ভাল মন্দ বিচার করিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে, আমায় ডেকেছ কেন?

রাণী অনেকক্ষণ কথাটা পাড়িল না; লজ্জায় সে মাটির সহিত মিশাইতে চাহিতেছিল; নিজের বিবাহের কথা লইয়া আলোচনা করিবে কেমন

করিয়া? কিন্তু কথাটা তাহাকে বলিতেই হইবে। সে ধীরে ধীরে বলিল, আজ আমি আপনাকে যে কথা বলব, তার বলবার কোনই প্রয়োজন হ'ত না, যদি—

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই রাণী থামিয়া গেল। সুধীর বলিল, যদি এই সম্বন্ধের কথা না উঠত—এই তো? রাণী অস্পষ্টভাবে বলিল, হ্যাঁ, আমাকে নিজের মুখে একথা বলতে হচ্ছে ভেবে আমার লজ্জা করছে, কিন্তু না বললে নয়—আমাদের বিয়ে হতে পারে না—আমি আপনার যোগ্য নই।

সুধীর প্রথমটা চমকিয়া উঠিল, ভাবিল, এই বুঝি নাটক শুরু হইল! বেশি নাটক নভেল পড়িয়া মেয়েটার গরহজম হইয়াছে দেখিতেছি। একটু উদ্ধত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

রাণী একটু ইতস্তত করিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, আমার জাত-কুল বাপ-মা কিছুরই ঠিক নেই, আমি—

সুধীর এবার সত্যসত্যই স্তম্ভিত হইল, মেয়েটা বলে কি? বলিল, কেন তুমি কি সারদাবাবুর ভাগ্নী নও।

শান্তভাবে রাণী উত্তর দিল, না, সারদাবাবুর কোনও দিদি নেই। দিদি ব'লে তিনি যার পরিচয় দেন সে তাঁদেরই গাঁয়ের লোক এই মাত্র, আসলে সে একজন অতি দুশ্চরিত্র স্ত্রীলোক; সে কলকাতার এক বাড়িউলী।

সুধীরের মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। সে উন্মত্তের মত জিজ্ঞাসা করিল, তুমি তবে কে? রাণী মৃদুস্বরে উত্তর দিল, আমি একজন হতভাগিনী, কোথায় বাড়ি কার মেয়ে কিছুই জানি না—ব্যবসার খাতিরে বুড়ী আমায় ছেলেবেলাতেই চুরি করে আনে, তবে শুনেছি আমাদের বাড়ি হুগলিতে।

বাগানে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া সুধীর ভাবিল, সে স্বপ্ন দেখিতেছে, নহিলে এ কেমন করিয়া সম্ভব হয়! সিদ্ধি খাইলে যেমন নেশা হয়, মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের ঘটনা বহুযুগ পূর্ব্বে ঘটিয়াছে বলিয়া ধারণা হয়, সুধীরেরও তাহাই হইল। সে খানিকক্ষণ হতভম্বের মত রাণীর দিকে চাহিয়া আর্ত্তস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, রাণী সত্যি ক'রে বল, তোমার অন্ত কিছু উদ্দেশ্য নেই তো? হয়তো আমাকে পছন্দ হয় নি—কিংবা—তুমি কখনই সে রকম নও।—

সুধীর কি বলিতেছিল, সে নিজেই জানিত না।

রাণী গম্ভীরভাবে বলিল, আমি আপনার সঙ্গে প্রতারণা করি নি, সত্যই আমি কুলশীলহীন।

সুধীরের মাথা দপ দপ করিতে লাগিল; তাহার মাথায় আর কিছু প্রবেশ করিতেছিল না। সে বলিল, রাণী, কালকে সকালে যেমন ক'রে পার আমার সঙ্গে দেখা করবে—এইখানে— আমি মালীকে ব'লে রাখব। সে রাণীর দিকে না চাহিয়া সোজা আপনার ঘরে গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। তাহার মাথায় অসম্ভব যন্ত্রণা হইতে লাগিল। যদি বা এত কাল সবুর করিয়া একজনকে একটু মনে ধরিল, তাহার সুখস্বপ্ন এমনই করিয়াই ভাঙিয়া যাইবে? সে সমস্ত রাত্রি ঘুমাইতে পারিল না। নানা প্রকার সম্ভব অসম্ভব চিন্তা করিয়া সে ব্যাপারটা অনেকখানি আঁচ করিয়া লইল, রাণী নিশ্চয়ই এখনও নিষ্পাপ। সে উচ্চ নীচ ব্রাহ্মণ শূদ্র যাহাই হউক, তাহাকে বাঁচাইতে হইবে। বুড়ী যদি সত্যই বাড়িউলী হয়, তাহা হইলে সে আর বেশি দিন রাণীকে কলিকাতার বাহিরে রাখিবে না—রাণীর বয়স হইয়াছে, শীঘ্রই তাহাকে ব্যবসায়ে লাগাইবে। যাহা করিবার শীঘ্রই করিতে হইবে। সময় কম। রাণীকে বিবাহ করা না-করার কথাই আর তাহার মনে রহিল না, কেমন করিয়া তাহাকে এই পাপ-জীবন হইতে রক্ষা করা যায় সুধীর তাহাই ভাবিতে লাগিল। আর একটা ব্যাপার ভাবিয়া সে আশ্চর্য্য

হইল। সারদাবাবু বিশিষ্ট ভদ্রলোক, তিনিই বা কেমন করিয়া ইহার প্রশ্রয় দিলেন।

পরদিন যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে রাণী তাহার সহিত দেখা করিল। বলিল, কাল রাত্রে বুড়ী আসিয়াছে সম্ভবত দুই-একদিনের ভিতরেই তাহাকে লইয়া যাইবে। সুধীর রাণীর নিকট হইতে ব্যাপারটা আগাগোড়া শুনিয়া লইবার চেষ্টা করিল। নানা প্রশ্নোত্তরের পর তাহার অনেক সন্দেহের মীমাংসা হইল। সে যাহা জানিতে পারিল, তাহা সংক্ষেপে এই—

বুড়ী যৌবনে কলিকাতায় দেহবিক্রয়ের ব্যবসা করিয়া বেশ কিছু অর্থ জমাইয়াছে; সেই অর্থ সুদে খাটায়; তাহার নিজের গ্রাম ও পাশাপাশি গ্রামসমূহে এইভাবে সে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। সারদাবাবু দুঃস্থ লোক; তিনিও নানা ভাবে বুড়ীর সাহায্য গ্রহণ করিয়া তাহার কাছে বিক্রীত আছেন। বুড়ী মাঝে মাঝে তাহার পরিচিত অপরিচিত গ্রাম-সমূহে ঘুরিয়া বেড়াইয়া নূতন নূতন বালিকা খরিদ করিয়া সংগ্রহ করে; যাহাদের বয়স কম তাহাদিগকে নানাভাবে শিক্ষা দিয়া তাহাদের বাজার-দর বাড়াইবার ব্যবস্থা করে ও সময় হইলে, কলিকাতায় লইয়া গিয়া তাহাদের খাটাইয়া যথেষ্ট উপার্জ্জন করে। এই অতি হীন ব্যবসা সে করে, এ কথা গ্রামের সকলেই জানিলেও সময়ে অসময়ে তাহার নিকট অর্থ সাহায্য পাইত বলিয়া প্রত্যেকেই অন্তত বাহিরে তাহাকে খাতির করিত।

সারদাবাবু গ্রাম হইতে বহুদূরে চাকরি করিতেন, সুতরাং বুড়ীর প্ররোচনায় রাণীকে তাঁহার কাছে রাখিয়া শিক্ষা দিতে ও এই ওজুহাতে কিছু অর্থ লাভ করিতে ইতস্তত করেন নাই। তাহাকে নিজের ভাগিনেয়ী বলিয়া চালাইতে তাঁহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। তাঁহার একমাত্র পুত্র রেঙ্গুনে চাকরি করিত, সুতরাং পরের মেয়েকে বাড়িতে রাখার তাঁহার কোনও বাধা ছিল না। তিনি যথাসম্ভব যত্ন করিয়া রাণীকে গান-বাজনা ইত্যাদি শিখাইয়াছেন—তিনি জানিতেন বেশি দিন তাহাকে এ ভার

বহন করিতে হইবে না, কারণ রাণী একটু বড় হইলেই বুড়ী তাহাকে কলিকাতায় লইয়া যাইবে।

নিজের শৈশব-অবস্থার অস্পষ্ট ধারণা থাকিলেও তাহার বাবা মা ভাই বোন কেহ আছে কি না, রাণী মনে করিতে পারে না—খুব অল্প বয়সেই তাহাকে বুড়ী চুরি করিয়া আনে ও নানা স্থানে রাখিয়া শেষে এইখানে আনিয়া ফেলিয়াছে। এখানে সে বেশ সুখেই আছে, কিন্তু ভবিষ্যতের ভীষণ অবস্থার কথা ভাবিয়া সে মাঝে মাঝে অস্থির হইয়া উঠে; এখানে তাহার উপর কেহ বিশেষ নজর রাখে না, সে স্বচ্ছন্দে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিত। কিন্তু একাকী আশ্রয়হীনা অবস্থায় সে কোথায় যাইবে? সে আর কাহাকেও তাহার এই সব কথা বলিতে পারে নাই, অমিয়াকেও না। মাঝে মাঝে ভাবিয়াছে, সারদাবাবু বুড়ীর নিকট যে ভাবে বিক্রীত তাঁহাকে কিছু বলিলে হয়তো তিনি ভয় পাইয়া তাহাকে আবার বুড়ীর নিকট পাঠাইয়া দিবেন; বুড়ী হয় নিজের কাছে নয় অন্যত্র রাখিবে, সেখানে তাহার দুর্দ্দশা হয়তো বাড়িয়া যাইবে।

বুড়ী আসিয়াছে, এবার তাহাকে যাইতেই হইবে। বুড়ী এই বিবাহের প্রস্তাবে ভীত হইয়াছে। অমিয়ার সহিত বন্ধুত্বের দাবিতেই সে সুধীরকে এমন ভাবে এখানে ডাকিতে সাহস করিয়াছে, সে জানে এই বিবাহের কথাটার কোন দাম নাই। অমিয়ার দোহাই দিয়া সে সুধীরকে অনুরোধ করিতেছে যেন তাহার ভয়াবহ পরিণাম হইতে তিনি তাহাকে রক্ষা করেন। ওঃ, সে কি ভীষণ অবস্থা! সুধীরবাবু কল্পনা করিতে পারিবেন না—সে কিছুদিন কলিকাতায় বুড়ীর বাড়িতে ছিল; সেখানে পিশাচ পিশাচী ছাড়া কেহ থাকিতে পারে না। সেখানে থাকিতে হইলে সে বাঁচিবে না।

সুধীর কিছুক্ষণ মূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল। রাণীকে রক্ষা করিবার কোন কূল-কিনারা পাইল না। রাণীকে বাঁচাইতে হইলে এখন অর্থবল প্রয়োজন, তাহা তাহার নাই। সে বেশি ভাবিতে পারিল না বটে, কিন্তু

অটল মনে প্রতিজ্ঞা করিল, যেমন করিয়াই হউক এই নিরীহ বালিকাকে সেই পিশাচীর কবল হইতে রক্ষা করিবে। সে বুড়ীর কলিকাতার ঠিকানা জানিয়া লইল ও রাণীকে কলিকাতায় তাহার দিদির বাড়ির ঠিকানা দিল; বিশেষ কিছু বিপদ দেখিলে সে যেন সেখানে চিঠি দেয়। সুধীর নিজে কোনও ভরসা না পাইলেও রাণীকে যথেষ্ট ভরসা দিয়া বিদায় করিল ও বলিয়া দিল যে, যেন আর কাহাকেও একথা না বলে বা বুড়ি ও সারদাবাবুর প্রতি কোনও রূঢ় ভাব প্রদর্শন না করে। কাহারও সন্দেহ জাগাইয়া তোলা এখন ঠিক নয়।

সুধীর বিমর্ষচিত্তে বাড়ি ফিরিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল, কাহাকেও এই ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গ জানিতে দিল না; সে কলিকাতা যাওয়া স্থির করিল।

পরদিন সারদাবাবু সুধীরের বাবাকে তাঁহার দিদির মত জ্ঞাপন করিলেন—রাণীর অন্যত্র বিবাহ স্থির হইয়াছে—তিনি দুই এক দিনের মধ্যেই রাণীকে লইয়া যাইবেন।

অমিয়া শুনিয়া মুসড়াইয়া গেল। সে তাহার দাদার বিমর্ষ ভাব দেখিয়া বিশেষ কষ্ট পাইল; যদি বা এতদিনে দাদার বিবাহ করিতে মন হইল, এ আবার কি বাধা আসিয়া জুটিল!

রাণীকে লইয়া বুড়ী চলিয়া গেল।

সুধীরও কলিকাতা গেল। তাহার বাপ মা বুঝিলেন, ছেলের মন খারাপ হইয়াছে—একটু বেড়াইয়া আসুক।

পেয়ারাবাগানে দিদির বাড়িতে আসিয়া সুধীর প্রথমটা কি করিবে ঠিক করিতে পারিল না। পুলিসে খবর দিলে ইহার একটা কিনারা হয় বটে, কিন্তু রাণীকে উদ্ধার করিয়া সে রাখিবে কোথায়? সুতরাং হট করিয়া সে কিছু করা যুক্তিসঙ্গত মনে করিল না। কলিকাতায় তাহার এক অন্তরঙ্গ

বন্ধু ছিল—সে বিমল। সুধীর বিমলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া প্রথমটা দুই একটা অনাথ-আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করিল।

রাণীর আশ্রয়-অনুসন্ধান করিতে গিয়া সুধীর ও বিমল দেশ ও সমাজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িল। কোন আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষ বলিলেন, তাঁহারা শুধু বিধবাদের আশ্রয় দেন; কেহ বলিলেন, বিশেষ পরীক্ষা না করিয়া কুস্থান হইতে আগত মেয়েদের তাঁহারা আশ্রমে রাখিতে পারেন না—ইত্যাদি। তাহারা কোথাও এতটুকু সাহায্যের ভরসা পর্য্যন্ত পাইল না।

সব দিকে বিফলমনোরথ হইয়া শেষে তাহারা কলিকাতার এক খ্রীষ্টিয়ান মিশনের কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করিল। কলিকাতা-শাখার যিনি মালিক তিনি অতি অমায়িক সাধু লোক। এই দুইটি যুবকের উদ্যমের প্রশংসা করিয়া তিনি বলিলেন, তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। তিনি কলিকাতার পুলিস কমিশনারের অন্তরঙ্গ বন্ধু, বিশেষভাবে তাঁহাকে এই যুবকদের সাহায্য করিতে অনুরোধ করিয়া এক পত্র দিলেন। বলিলেন, মেয়েটি উদ্ধার পাইলে তাহাকে রাখিবার ভাবনা ভাবিতে হইবে না—মিশনের অনাথ-আশ্রমে তাহাকে রাখা হইবে।

মিশনের সাহেবের কাছ হইতে বাড়ি ফিরিয়াই সুধীর রাণীর এক চিঠি পাইল—রাণীকে সেই দিনই কলিকাতার বাহিরে কোথায় লইয়া যাইবে। রাণী কাতরভাবে তাহাকে শীঘ্র উদ্ধার করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইয়াছে।

সেই চিঠি সঙ্গে করিয়া সুধীর বিমলের সঙ্গে দেখা করিল; দুইজনে মিলিয়া পুলিস কমিশনারের কাছে গেল। কমিশনার সাহেব তাহাদের কার্য্যকলাপের বিবরণ শুনিয়া বিশেষ খুশি হইলেন ও ডিটেকটিভ ডিপার্ট-মেণ্টের একজন উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর সঙ্গে তাহাদের পরিচয় করাইয়া দিয়া তাঁহার সহিত বুড়ীর বাড়িতে যাইতে বলিলেন।

কয়েকটি কনস্টবলকে সঙ্গে লইয়া ঠিক সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাহারা বুড়ীর বাড়িতে হানা দিল। সেখানে তুমুল হৈচৈ বাধিয়া গেল। বারযোষাও

আসবাবপত্রাদি চুরমার করিয়া পুলিস কর্ম্মচারীরা একাকার করিয়া দিল কিন্তু বুড়ী বা রাণীর কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। কেহ জানিলেও কিছু বলিল না।

সুধীর হতাশ হইয়া বাড়ি ফিরিল। রাণী নিজেই হয়তো পত্র দিবে, কিন্তু যদি তাহাকে কয়েদ করিয়া রাখা হয় তাহা হইলে? সে রাণীর উদ্ধারের জন্য এইভাবে যতই পরিশ্রম করিতে লাগিল, রাণীর দিকে সে ততই আকর্ষণ অনুভব করিল। এখন দিনে রাত্রে রাণীর ব্যথাভরা মুখখানি সে দেখিতে পায়। সুধীর প্রবল মানসিক যন্ত্রণায় পীড়িত হইতে লাগিল।

পুলিস এদিকে বুড়ীর বাড়ির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিল।

শেষে একদিন প্রাখিত পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। বুড়ীর গ্রাম হইতে রাণী লিখিয়াছে যে, এ কয়দিন নানা স্থানে ঘুরিয়া বুড়ীর সহিত সে এখানে আসিয়াছে, শীঘ্রই আবার কলিকাতা যাইতে হইবে; যেদিন কলিকাতা রওনা হইবে সেদিন সে টেলিগ্রাম করিবে—তখন যেন তাহার সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা হয়।

সুধীর আবার পুলিস কমিশনারের সহিত দেখা করিল। তিনি বলিলেন, যেন টেলিগ্রাম পাইলে অবিলম্বে তাঁহাকে জানানো হয়, তিনি হাওড়া স্টেশনেই বুড়ীকে ধরিয়া ব্যবস্থা করিবেন। দুই দিন পরে টেলিগ্রামও আসিল। সুধীর অবিলম্বে বিমলকে সঙ্গে লইয়া পুলিস কমিশনারের কাছে গেল। তিনি যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিয়া পুলিস সঙ্গে দিয়া তাহাদিগকে হাওড়া পাঠাইলেন; তারকেশ্বর লাইনের প্রত্যেক গাড়ি দেখিবার হুকুম দিলেন।

হাওড়া স্টেশনেই বুড়ীকে গ্রেপ্তার করা হইল। রাণীকে উদ্ধার করিয়া খ্রীষ্টিয়ান মিশনারিদের একটি অনাথ-আশ্রমে রাখা হইল।

পুলিস কোর্টে কয়েকদিনব্যাপী মকদ্দমায় বুড়ীর যথেষ্ট শাস্তি দেওয়া হয়। মকদ্দমায় রাণীর বাবা আসিয়াছিলেন। তাঁহারা যাতিতে ব্রাহ্মণ।

তিনি মেয়ের সহিত কোন সম্বন্ধই স্বীকার করিলেন না। রাণী অনাথ আশ্রমেই রহিয়া গেল।

সারদাবাবুও এই মকদ্দমায় জড়িত ছিলেন। তিনি কোন প্রকারে বাঁচিয়া গেলেন।

এদিকে সুধীরের ছুটি ফুরাইয়া আসিল। এইবারে সে কি করিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছিল না। রাণীকে উদ্ধার করিতে গিয়া সে দিনের পর দিন রাণীর কথাই ভাবিয়াছে। তাহাকে লইয়া ভবিষ্যতের অনেক স্বপ্নই দেখিয়াছে; কিন্তু তাহাকে পাইবার উপায় কি?

রাণী ব্রাহ্মণকন্যা—বহুকাল দুশ্চরিত্র নারীর কবলে ছিল। তাহার সহিত বিবাহ হিন্দুসমাজে চলিতে পারে না। বিশেষত বাপ মা দিদি ভগিনীপতি সকলেই তাহার এই কার্য্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। একজন পতিতা মেয়ের জন্য তাহার এতখানি দরদ তাঁহারা পছন্দ করেন নাই। রাণীকে বিবাহ করিলে তাহাকে ইহাদের সকলকেই ছাড়িতে হইবে। সিমলায় যাইবারও সময় হইল। সিমলায় সে যে সামান্য বেতন পায়, তাহাতে দুইজনের খোরাক হইবে না। সে চারিদিক অন্ধকার দেখিল। রাণীকে সে ছাড়িতে পারিবে না—অন্য সব কিছু ছাড়িতে সে প্রস্তুত আছে। সে বিমলের সহিত পরামর্শ করিল। বিমলও সুধীরকে বিবাহ করিতে উৎসাহ দিল। সেই মিশনের বড় সাহেবের সহিত দেখা করিয়া সে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বলিল। তিনি যথেষ্ট সহানুভূতি দেখাইয়া বলিলেন, খ্রীষ্টিয়ান হইয়া বিবাহ করা ছাড়া তাহার গত্যন্তর নাই। খ্রীষ্টিয়ান হইলে কলিকাতাতেই তিনি তাহার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিবেন, তাহাকে মিশনের কোন কাজ দিবেন।

অনেক চিন্তা করিয়া সুধীর শেষে তাহাতেই রাজী হইল; সে খ্রীষ্টিয়ান হইয়া রাণীকে বিবাহ করিল। রাণী মনে মনে সুধীরকে দেবতার মত ভক্তি করিত। সে কোন আপত্তি করিল না।

রাণীও

মিশনের এক বাড়িতে তাহারা আশ্রয় পাইল। দুইজনের অন্নের সংস্থানও সাহেব করিয়া দিলেন। বাপ মা আত্মীয় বন্ধু ইত্যাদির সঙ্গে সুধীরের সকল সম্বন্ধ ছিন্ন হইল। বিমল কেবল মাঝে মাঝে তাহাদের সুখে দুঃখে সহানুভূতি দেখাইতে আসিত।

এই তো গেল গল্পের ভূমিকা। আসল গল্প এইবার আরম্ভ হইবে।

দুই

সুধীরকে স্বামীরূপে পাইয়া রাণী বর্ত্তাইয়া গেল, ভাবিল, দেবতা তাহাকে অযাচিতভাবে অনুগ্রহ দেখাইয়াছেন। যে কদর্য্যতার গ্লানি ও পঙ্কিলতা হইতে সুধীর তাহাকে উদ্ধার করিয়াছে—শুধু উদ্ধার করা নয়, ইহার পর তাহাকে জীবনসঙ্গিনী করিয়া আত্মীয় স্বজন সমাজ সকলের বিরুদ্ধে তাহাকে আশ্রয় দিয়া যে মহত্ত্ব সুধীর দেখাইয়াছে, তাহা এক দেবতাতেই সম্ভবে। সে সুধীরকে দেবতার মত পূজা ও ভক্তি করিতে লাগিল। সমাজ অকারণে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহার পিতা-মাতাও তাহার সন্ধান পাইয়া তাহাকে আশ্রয় দিলেন না। এক মৃত্যু ছাড়া তাহার কোনও গতি ছিল না—এ কদর্য্যতা হইতে আত্মরক্ষা করিবার; এই আশ্রয়হীনা পতিতাকে আশ্রয় দিয়া সুধীর পৃথিবীর সব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অনায়াসে পরিত্যাগ করিল—এই চিন্তা অহরহ তাহাকে পীড়িত করিতে লাগিল; সে মনে মনে সুধীরকে সকল রকমে সুখী করিবে প্রতিজ্ঞা করিল। তাহার জন্য সুধীর পৃথিবীর কাছে যতটুকু বঞ্চিত হইল, সে প্রেম ও সেবা দিয়া তাহা পূরণ করিয়া দিবে; সে তাহার দাসী হইয়া থাকিবে। শুধু ইহার আশ্রয়ে থাকিতে পাইলেই সে সুখী—অন্য কোনও কষ্টকে সে কষ্ট বলিয়া মানে না। কি হইবে জাতি লইয়া, কি হইবে পিতামাতার ভাবনা ভাবিয়া? জাতি ও সমাজ পিতা মাতা বন্ধু কেহই তাহার জন্য এতটুকু ত্যাগ স্বীকার করিল না, অথচ সে নির্দ্দোষ। শৈশবে

সে যে অপহৃতা হইয়া পিশাচের কবলে পড়িয়াছিল, সে দোষ তাহার নয়। যাহারা তাহাকে রক্ষা করিতে পারিল না, তাহারাই তাহার লাঞ্ছনা করিবে। এ তো অদ্ভুত বিচার!

সে সমাজপরিত্যক্তা, সমাজপরিত্যক্ত স্বামীকে লইয়া সুখেই সংসার পাতিল। দৈনন্দিন খুঁটিনাটির অভাব সে হাসিমুখে বহন করে। স্বামী বেশি উপার্জ্জন করিতে পারে না। সে কায়িক পরিশ্রম দ্বারা যতটুকু সম্ভব সংসারের অভাব মোচন করিতে লাগিল। হিন্দু সমাজ তাহাকে আশ্রয় দিলে না বটে, কিন্তু চিরন্তন মানব-সমাজে পৃথিবীর সকল সতী-সাধ্বীর সহিত সে এখন সমানে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে; সে নারী, নারীর যথার্থ সম্মান পাইয়াছে। এই অধিকার যে তাহাকে দিয়াছে, রাণী তাহাকে অসুখী করিবে না।

কিন্তু রাণী অসুখী হইতে না দিতে চাহিলেও সুধীর অসুখী হইল। রাণী শৈশব হইতেই আপন স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন। সমাজে থাকিবার কোন মোহ তাহার নাই। কিন্তু সুধীর আশৈশব পিতামাতা বা আত্মীয়স্বজনের স্নেহে বর্দ্ধিত, পরিপুষ্ট—ভাবের আবেগে হঠাৎ তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার মন এখনও আত্মীয়ের স্নেহক্ষুধাতুর। যাহার কেহ নাই, কাহাকেও ছাড়িবার ব্যথা তাহাকে অনুভব করিতে হয় না; কিন্তু যাহার সব আছে সকলের অভাব তাহাকে পীড়া দেয়, প্রবল মনের জোর না থাকিলে সে সুখী হইতে পারে না। ভাবাধিক্যে একদিন সে যাহা ছাড়িয়াছে, প্রতিদিন সেই অভাবের বোঝা টানিয়া চলা তাহার পক্ষে শক্ত—অতখানি জোর সুধীরের মনে ছিল না। রাণী তাহাকে সর্ব্বস্ব দিয়াছে—তাহাকেই তাহার সর্ব্বস্ব মনে করিয়া। তাহাকে লইয়া রাণীর জগৎ। কিন্তু শুধু রাণীকে লইয়াই সুধীরের জগৎ সম্পূর্ণ নয়। রাণীর বড় আদরযত্নের মধ্যেও তাহার মন হাহাকার করিয়া ফেরে। সে দিনে দিনে বিমর্ষ হইতে লাগিল।

বাড়িতে বসিয়া সে কোনও রকমে রাণীকে লইয়া সুখেই থাকিত, কিন্তু বাহিরে বাহির হইলেই তাহার নিগ্রহ শুরু হইত। পরিচিত লোকের সঙ্গে তাহার দেখা হয়, খ্রীষ্টিয়ান হইয়াছে বলিয়া কেহ তাহাকে উপহাস করে, তর্ক করে, কেহ অবজ্ঞা করিয়া চলিয়া যায়; এই খ্রীষ্টিয়ান হওয়াটার ভিতর তাহার মহত্ত্ব কতখানি তাহা কেহ বিচার করে না; দুই-একজনে তাহার স্ত্রী সম্বন্ধে কুৎসিত ইঙ্গিত করিতেও ছাড়ে না; কেহ কেহ তাহার স্ত্রীর সহিত পরিচিত হইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। সুধীর অপমানিত হয়, কিন্তু কিছু বলিতে পারে না। কোনও বৃহৎ পরিবারের বাসগৃহ দেখিলে তাহার মন ছ্যাঁৎ করিয়া উঠে—তাহার ক্ষুদ্র গৃহটির কথা মনে পড়িয়া যায়। কোনও বাড়িতে বিবাহাদি কোনও উৎসব হইতেছে দেখিলে, সে লুব্ধ দৃষ্টিতে দেখিতে থাকে—এই সমস্ত ব্যাপারে তাহার প্রবেশ নিষেধ, অথচ এইগুলিতে যোগ দিবার জন্য তাহার অন্তরে অন্তরে কি কাতরতা! প্রতিদিন এইভাবে বাহিরের আঘাত অপমান লাঞ্ছনা গায়ে মাখিয়া হতাশ মনে সে বাড়ি ফিরিত। রাণী স্বামীর এই ব্যথাকাতর অবস্থা দেখিয়া মনে মনে কষ্ট পাইত—সে বুঝিতে পারিত না, স্বামীর এই দুঃখ কিসের জন্য, তাহার সেবাযত্নের ত্রুটিতো সে করে নাই! হয়তো তাহাকে লইয়া স্বামী সুখী নয়। সে তাহার উপযুক্ত নয়, কিন্তু যে তাহার জীবনের একমাত্র দেবতা তাহাকে মুখ ফুটিয়া এ কথা বলিতে পারে না। অন্তরে অন্তরে স্বামীর যন্ত্রণা অনুভব করিয়া রাণী দগ্ধ হয়। স্বামী তো ইহার কারণ কোনও দিন তাহাকে খুলিয়া বলিলেন না! সে কি তবে তাহার সুখদুঃখের অংশী নয়? তাহার অভিমান হয়।

এইভাবে বাহিরের সংসারের সহিত বিচ্ছিন্নতার বেদনায় সুধীরের ভিতরের সংসারেও শান্তি নষ্ট হইতে লাগিল। হয়ত একদিন মুখ ফুটিয়া এই সমস্ত অভাবের কথা সুধীর রাণীকে বলিলেই জিনিসটা সহজ হইত। কিন্তু রাণী আঘাত পাইবে ভাবিয়া সুধীর কিছু বলে না। কিন্তু এই

গোপনতার জন্তই রাণী আঘাত পাইল বেশি। সে কেমন অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল।

এক-একবার তাহার মনে হয়, তাহাকে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিতে পারিতেছেন না বলিয়া স্বামী দুঃখিত আছেন—অল্প আয়ে তাঁহার মনোমত তিনি সংসারনির্ব্বাহ করিতে পারিতেছেন না—কিন্তু সে তো ইহাতেই সুখী; এইটুকুই তো তার আশার অতিরিক্ত। স্বামীর অভাব-অভিযোগের কথা সে যদি জানিতে পারে সেও তো তাঁহার সাহায্য করিতে পারে। তিনি কিছু বলেন না কেন?

দুইজনে এইভাবে ভিতরে ভিতরে দগ্ধ হইতে লাগিল; স্বামী-স্ত্রীর বন্ধনে নিবিড়তায় একটু ঢিলা পড়িল। রাণী প্রথমটা স্বামীর অন্তরের দুঃখ জানিবার জন্ত ব্যাকুল হইত, এখন ইহা তাহার সহিয়া গিয়াছে। সে আপন মনে সংসারের কাজ করে; স্বামীর সেবায় প্রাণপণ করে। বাহিরের কিছুতেই তাহার প্রয়োজন হইত না যদি স্বামী এভাবে তাহাকে বঞ্চিত না করিতেন। সে এখন দুই-চারিজন খ্রীষ্টিয়ান বন্ধু জুটাইয়া লইয়া তাহাদের সহিত গল্প-গুজবে দিন কাটায়। সুধীর এসব পছন্দ করে না। সে এখন অবস্থাবিপর্য্যয়ে যতটা হীন দশাতেই পড়ুক না কেন, নিজেকে এখনও আপনার সমাজের একজন বলিয়া কল্পনা করে—সে সমাজে থাকিলে তাহার স্ত্রীর যেভাবে চলাফেরা সে পছন্দ করিত, সমাজ-বিচ্যুত হইয়াও স্ত্রী সেইভাবে চলিবে ফিরিবে, ইহাই সে চায়। এইটুকুই বুঝাইয়া বলিলেই কাজ চুকিয়া যাইত। কিন্তু সুধীর তাহার ভিতরের কথাটুকু গোপন রাখিয়া রাণীকে একদিন তাহার মর্য্যাদানুযায়ী চলিতে বলিল। রাণী হাসিয়া বলিল, তাহার আবার মর্য্যাদা কোথায়? সুধীর বিরক্ত হইয়া বলিল, অন্তত তাহার স্ত্রী হিসাবেও তাহার কিছু মর্য্যাদা আছে—সে নিজের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়া তাহাকে যেন অপমান না করে।

রাণী আহত হইল; নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিল। এইভাবে বিচ্ছেদ বাড়িয়া চলিল।

সুধীরের মানসিক যন্ত্রণাও ক্রমশ বাড়িতে লাগিল। সে এখন বেশির ভাগ সময় বাহিরে বাহিরে কাটায়—মিশনের কাজে তাহার কখনও একবিন্দু সহানুভূতি ছিল না। খ্রীষ্টধর্ম্মকে সে আজীবন উপহাসই করিয়া আসিয়াছে; সেই খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণরূপ কলঙ্ক গায়ে মাখিয়াও সে দুঃখিত ছিল না; শুধু রাণীকে পাইয়াছে এই সুখে। এখন সে দুঃখটাও তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল।

পূর্ব্বেকার বন্ধুবান্ধবদের ইতর ইঙ্গিত সত্ত্বেও সে তাহাদের সঙ্গে আবার মিশিতে শুরু করিল—চায়ের দোকানের আড্ডায় সে নিয়মিত উপস্থিত হইয়া অলসভাবে রাজা-উজির মারিয়া মনের দুঃখের লাঘব করিতে লাগিল। মিশনের কর্ত্তৃপক্ষ অনুযোগ করিলেন। সুধীর হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেল।

সুধীরের এই ভাবান্তর রাণী ব্যথিত হইয়া লক্ষ্য করিত, কিছু বলিত না। উপার্জ্জিত অর্থের সমস্তটুকুই আগে সুধীর রাণীর হাতে সংসার-খরচ বাবদ দিত। আজকাল তাহার অংশবিশেষ আড্ডায় ব্যয়িত হইতে লাগিল। সংসারের অনটন বাড়িয়া চলিল। ইহাও রাণী অকাতরে সহ্য করিতে পারিত, যদি সে স্বামীর এই অধঃপতন লক্ষ্য না করিত, যদি সে বুঝিতে পারিত স্বামী এখনও তাহার মুখ চাহিয়া কাজে মন দিবেন; কিন্তু তাহার কোনও লক্ষণই সে দেখিতে পাইতেছিল না।

রান্নাবান্না সংসারের কাজকর্ম্ম সারিয়া সে অন্ধকার গৃহে বসিয়া থাকে—তাহার মন হুহু করিয়া উঠে। অদৃষ্টের এ কি পরিহাস! যে দেবতা তাহাকে নরক হইতে সমস্ত বিপদ তুচ্ছ করিয়া উদ্ধার করিয়া আনিলেন, কাহার অভিশাপে ধীরে ধীরে তিনি নিজেই ধাপে ধাপে নামিয়া যাইতেছেন! এ কি ভীষণ পরীক্ষায় তাহাকে ভগবান ফেলিলেন! রাণী কাঁদিয়া কাঁদিয়া দিন কাটাইতে লাগিল।

কিন্তু এভাবে চলিলে চলিবে না। রাণী দেখিতেছিল, স্বামীর ব্যয়ের মাত্রা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে—বাহিরে তিনি আরও বেশি থাকিতেছেন। তাঁহার স্ত্রী যে তাঁহারই প্রতীক্ষায় ব্যাকুলহৃদয়ে বাড়িতে বসিয়া থাকে তিনি একবারও তাহা ভাবিয়া দেখেন না। কেন এমন হইল?

রাণী মনকে দৃঢ় করিল। স্বামীকে রক্ষা করিতে হইবে, অভিমান করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। প্রথমে ভাবিল, সাদপুরে মায়ের কাছে পত্র দিবে। কিংবা গোয়াবাগানে দিদির সহিত দেখা করিবে। কিন্তু তাঁহারা কি পতিতার কথা শুনিবেন? সে ভরসা রাণী পরিত্যাগ করিল। স্বামীর সহিত খোলাখুলি সমস্ত বোঝাপড়া করাই সে স্থির করিল।

সেদিন সন্ধ্যা হইতেই সে কাজকর্ম্ম সারিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছিল, স্বামীকে আজ সে জেরা করিবে, তাঁহার কিসের অভাব কিসের দুঃখ তাহা জানিয়া লইয়া তাহার প্রতীকারের চেষ্টা করিবে। সে মন স্থির করিয়া একখানা বই লইয়া পড়িতে বসিল। প্রায় রাত্রি এগারোটার সময় স্বামী আসিলেন। দরজা খুলিয়া দিতেই রাণী মদের তীব্র গন্ধ পাইল—সে দরজা খুলিয়া মূকের মত দাঁড়াইয়া রহিল। সুধীর টলিতে টলিতে ভিতরে ঢুকিয়া একটু রসিকতা করিয়া বলিল, কি গো, ঢং ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? খাবার আছে কিছু?

রাণী আর কিছু শুনিতে পাইল না। তাহার চারিদিকে ঘরখানা ঘুরিতে লাগিল। সে 'মা গো' বলিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল।

জ্ঞান হইতেই বুঝিতে পারিল, সুধীর তাহাকে বিছানায় আনিয়া শোয়াইয়া তাহাকে বাতাস করিতেছে; সে লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া সুধীরের হাত হইতে পাখা কাড়িয়া লইল। বলিল, তুমি হাত পা ধুয়ে নাও, আমি তোমার জায়গা করছি। বলিয়াই সে উঠিতে গেল—মাথাটা তখনও দপ দপ করিতেছিল, মদের গন্ধও নাকে আসিতেছিল। সুধীর হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া বিছানায় বসাইয়া দিয়া বলিল, খাবার

কোথায় আছে বল আমি নিজেই নিচ্ছি—এক সঙ্গেই খাওয়া যাবে। রাণীর সমস্ত গ্লানি সমস্ত ব্যথা যেন এক মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইল—স্বামী যে মদ খাইয়া আসিয়াছেন তাহা সে ভুলিয়া গেল। সে গলায় কাপড় জড়াইয়া গড় হইয়া স্বামীকে প্রণাম করিল, বলিল, এইটুকুই আমার সুখ—তোমাকে ব'সে খাওয়ানো, এর থেকে আমায় বঞ্চিত ক'রো না।

সুধীর অত্যন্ত লজ্জিত হইয়াছিল, সে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া বসিয়া রাণীর কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিল।

রাণী আজ বহুদিন পরে তৃপ্তির সঙ্গে স্বামীকে খাওয়াইল। খাওয়া-দাওয়া শেষ হইলে পাখা লইয়া সুধীরকে বাতাস করিতে করিতে বলিল, আজ ভগবান আমার উপর খুব সদয়।

সুধীর জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

লজ্জাজড়িত স্বরে রাণী বলিল, অনেকদিন পরে তুমি আমায় একটু যত্ন করেছ—মনে হচ্ছে অনেক যুগ পরে।

সুধীরকে কে যেন চাবুক মারিল। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, তথা-কথিত বন্ধুদের সঙ্গে মিশিয়া রাণীকে আর অবহেলা করিবে না। সত্য-সত্যই সে রাণীকে যথেষ্ট অনাদর করিয়াছে। অথচ রাণীর সে ছাড়া আর কেহই নাই।

রাণী বলিল, আমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর, ওসব আর খাবে না। সুধীর প্রতিজ্ঞা করিল। সে রাত্রে স্বামী-স্ত্রীতে মিলিয়া অনেক সুখ-দুঃখের কথা হইল। অনেক দিনের সঞ্চিত অনেক ব্যথার বোঝা নামিয়া গেল।

কিন্তু সুধীর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিল না। অনেকদিন ভদ্রভাবে থাকিয়া সে আবার দলে ভিড়িল, আবার মদ খাইল। রাণী চোখে অন্ধকার দেখিল। এই অবস্থায় কাহার সাহায্য লইবে সে?

বিমলবাবুকে তাহার মনে পড়িল। সে স্বামীর নিকট হইতে ঠিকানা লইয়া সমস্ত ব্যাপারটা বিমলকে লিখিয়া পাঠাইল। বিমল বহুকাল কলিকাতায় ছিল না। সুতরাং সুধীরের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই খবর রাখিত না। রাণীর চিঠি পাইয়া সে বিস্মিত হইল। সুধীর এতটা অধঃপাতে যাইবে—ইহা কেমন করিয়া সম্ভব, সে ভাবিয়া উঠিতে পারিল না।

হঠাৎ একদিন বিমল সুধীরের বাসায় উপস্থিত হইল। সুধীর বাসায় ছিল, বিমলকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল; অন্তরে অন্তরে একটু লজ্জাও অনুভব করিল। জিজ্ঞাসা করিল, তুই যে হঠাৎ?

বিমল বলিল, এই দেখতে এলাম। রাণীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, এই যে বউদি, কেমন আছ? বিমলকে দেখিয়া রাণী অনেকখানি ভরসা পাইল। বিমল সুধীরকে সেদিন কিছু বলিল না। পরদিন সন্ধ্যার সময় সুধীরকে বাসায় থাকিতে বলিয়া বিমল চলিয়া গেল।

পরদিন শনিবার। বন্ধুদের সহিত সেদিন সন্ধ্যায় বিশেষ একটি স্ফুর্ত্তির ব্যবস্থা ছিল। সে মহা ফাঁপরে পড়িল।

পরদিন সন্ধ্যায় যখন বিমল আসিল, সুধীর তখন বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে। বিমল আসামাত্র বলিল, এই যে তুমি এসেছ, আমি বিশেষ কাজে একটু বাইরে যেতে বাধ্য হচ্ছি,—তুমি একটু বস, আমি এখনই ফিরে আসছি। সুধীর কোথায় যাইতেছে বিমল তাহা বুঝিতে পারিলেও বাধা দিল না। সে বলিল, আমি ঘণ্টাখানেক থাকব।

সুধীর চলিয়া গেল। বিমল দেখিল, সুধীর আজ 'তুই' ছাড়িয়া 'তুমি' বলিল।

রাণী বিমলকে সমস্ত ঘটনা জানাইয়া বলিল, ঠাকুরপো, এখন আপনি মাত্র ভরসা, আমার আর কেউ নেই, আমার বড্ড ভয় হচ্ছে।

বিমল রাণীকে আশ্বাস দিল। দুই ঘণ্টা হইয়া গেল, সুধীর ফিরিল না। রাণী বিমর্ষভাবে বসিয়া রহিল। রাণীকে এভাবে একলা রাখিয়া

শুধু সঙ্গত হইবে কি না, বিমল ঠিক করিতে পারিল না; সে রহিয়া গেল।

সুধীর যখন ফিরিল, তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে, বিমল চলিয়া গিয়াছে ভাবিয়া সে স্বচ্ছন্দচিত্তেই আসিতেছিল। দরজা খুলিল বিমল। আজ সুধীর প্রায় মাতাল হইয়া আসিয়াছিল, বিমলকে তখনও তাহার বাড়িতে থাকিতে দেখিয়া সে জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, তুই এখনও যাস নি যে? সুধীরের কথার স্বরে বিমল চমকিয়া উঠিল, বলিল, বউদিকে একলা ফেলে যেতে পারলাম না। সুধীর হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, বটে, তবে এখন রোজ রোজ এসে বৌদিকে সঙ্গ দিও ভায়া—আমিও একটু রেহাই পাব। কই গো, সোহাগী বৌদি কোথায় গেলে? সুধীর আরও কি বলিতে যাইতেছিল, বিমল সুধীরের মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল, রাস্কেল, এ:কবারে অধঃপাতে গেছ? নিজের স্ত্রীর সম্ভ্রম পর্য্যন্ত রাখতে পার না?

সুধীর গর্জ্জন করিয়া বলিল, বেশ করব বলব—আমার বাড়ি ব'য়ে উপদেশ দিতে তোমাকে কেউ বলে নি—বেরোও আমার বাড়ি থেকে।

সেখানে থাকিলে গোলমাল বৃদ্ধি হইবে ভাবিয়া বিমল বাহির হইয়া গেল। কিন্তু স্বামীকে লইয়া রাণীর সে রাত্রি বেশ নির্ব্বিবাদে কাটিল না।

রাণী ভাবিল, অপমানিত হইয়া বিমলবাবু আর আসিবেন না, কিন্তু বিমল পরদিন তাহাকে আশ্বাস দিয়া পত্র লিখিল।

পরদিন সন্ধ্যার আড্ডায় সুধীর গর্ব্ব করিয়া বিমলকে অপমান করার কথা বর্ণনা করিল—সকলেই সুখী হইল। বিমলের অত্যধিক সাধুতাকে সকলেই প্রীতির চক্ষে দেখিত না। একজন জিজ্ঞাসা করিল, কি হে, ও রোজ সন্ধ্যায় তোমার ওখানে যায় নাকি! ব্যাপারটা ভাল নয়—সাধুতাকে আমার বিশ্বাস হয় না। সুধীর এতটা অধঃপতিত হইয়াছিল যে, এই ইঙ্গিতে

সে মোটেই কষ্ট হইল না, বলিল, চুলোয় যাক সব—বেঁচে থাক আমার বন্ধু আড্ডা আর বেঁচে থাক—। সে এক পাত্র মদ্য পান করিল।

কিন্তু সুধীরের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুরা ইহাতে সন্তুষ্ট হইল না। বলিল, তাহারাও বউদির সহিত আলাপ করিবে। সুধীর বড়াই করিয়া বলিল, আলবৎ, কাল তোমাদের সব্বাইকার ওখানে নেমন্তন্ন রইল—রাত্রে আমার বাড়িতেই আড্ডা বসবে।

পরদিন হইতে সুধীরের ঘরেই আড্ডা চলিতে লাগিল। রাণীর কষ্টের অবধি রহিল না। সে কিছুতেই এই সব ইতর সহচরদের সম্মুখে বাহির হইবে না—সুধীর বাহির করিবেই, প্রত্যহ ধস্তাধস্তি চলিতে লাগিল। রাণী গত্যন্তর না দেখিয়া বিমলকে পত্র দিল।

একদিন সুধীর অত্যধিক মদ খাইয়াছিল। বন্ধুরা তাহার বাড়িতে বসিয়া জটলা করিতেছিল, সকলে বলিল আজ তাহারা বউদির সহিত আলাপ করিবে—বিমলের সঙ্গে আলাপ করিতে তাহার অপমান হয় না, তাহাদের সহিতই বা সে কথা বলিবে না কেন? যুক্তিটা সুধীরের মনে ধরিল। সে ভিতরে গিয়া রাণীকে বলিল, চল, আমার বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করবে। রাণী বলিল, সে পারিবে না। সুধীর গর্জ্জন করিয়া বলিল, পারতেই হবে। রাণী তাহার পায়ে ধরিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিল। সুধীর হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া তাহাকে পদাঘাত করিয়া তাহার সতীত্বের পূর্ব্ব ইতিহাস লইয়া তাহার প্রতি একটা কুৎসিত ইঙ্গিত করিল। রাণী আর সহ্য করিতে পারিল না। তাহার যে কতদূর সর্ব্বনাশ হইয়াছে সে বুঝিতে পারিল। যন্ত্রচালিতের মত সে সুধীরের সঙ্গে বাহিরের ঘরে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পাষাণের মত ভাবলেশহীন মূর্ত্তি দেখিয়া মাতালেরাও স্তব্ধ হইয়া রহিল; সেই নিশ্চল গম্ভীর মূর্ত্তি তাহারা বেশিক্ষণ সহ্য করিতে পারিল না, রাণীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাহারা সকলেই চলিয়া গেল।

সকলে বাহির হইয়া গেলে সুধীর ব্যাপারটার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া স্তম্ভিত হইল—তাহার নেশা ছুটিয়া গেল। এ কি সর্ব্বনাশ সে করিয়াছে! যে নারীকে সে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তাহাকেই সে এই ভাবে লাঞ্ছিত করিল! সে চুপ করিয়া বাহিরের ঘরে বসিয়া রহিল। একটি কথাও বলিতে পারিল না। রাণী ভিতরের ঘরে গিয়া শয্যায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। সে বুঝিতে পারিল, যে স্বামীর আশ্রয়কে সে আশ্রয় ভাবিয়াছিল—সে তাহার আশ্রয় নয়। তাহার আশ্রয় কোথাও নাই।

এ অপমানের মধ্যে সে তিল তিল এভাবে দগ্ধ হইতে পারিবে না। যে দেবতাকে সে আপনার মনে স্থান দিয়া প্রতিদিন পূজা করিত, সে দেবতা আজ নর্দ্দমার ধূলিকর্দ্দমে লুণ্ঠিত হইতেছে, সে তাহা সহিতে পারিবে না।

শিশু অবস্থাতেই সে আশ্রয়হীন হইয়া পথে পথে ফিরিয়াছে—তাহার জন্মনক্ষত্রের সঙ্গে তাহার এই আশ্রয়হীনতার যোগ আছে, তাহাকে আশ্রয় কে দিবে? সে যে চির-আশ্রয়হীন, মিথ্যা নিজেকে বাঁচাইতে গিয়া সে একটি দেবতার সর্ব্বনাশ করিল। সে যদি সুধীরের সাহায্য-ভিক্ষা না করিত, হয়তো তিনি আজ সমাজগোষ্ঠীর মধ্যে স্বজন-আত্মীয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিতে পারিতেন—অধঃপতনের এমন নিম্নস্তরে তাঁহাকে আর নামিতে হইত না। সমস্ত রাত্রি রাণী এইভাবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাটাইল। স্বামীকে আহার দিবার কথা, ভিতরে ডাকিবার কথা আহার মনেও হইল না।

সমস্ত রাত্রি চিন্তা করিয়া সে মন স্থির করিল। বিমলবাবুকে আহ্বান করিতে ডাকা বৃথা—তিনি অযথা তাহার সহিত জড়াইয়া পড়িয়া লাঞ্ছিত হইবেন। আর কাহারও কথা তাহার মনে পড়িল না; সুধীরের বাপ মা আত্মীয় কেহই তাহাকে ক্ষমা করিবেন না—সে-ই তাঁহাদের সন্তানকে বিপথে আনিয়াছে, সে-ই তাঁহাদের সন্তানের অধঃপতনের একমাত্র কারণ।

সে ভাবিয়া দেখিল, সে-ই সুধীরের কুগ্রহস্বরূপ জন্মিয়াছে; সে মরিয়া

গেলে হয়তো তিনি আবার সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবেন। প্রায়শ্চিত্ত করিলেই হয়তো আবার সমাজ বাপ মা তাঁহাকে স্থান দিবেন ; সে-ই তাঁহার ঘাড়ে বোঝার মত চাপিয়া আছে বলিয়া তিনি ভারাক্রান্ত মনে আড্ডায়-নেশায় শান্তি খুঁজিতেছেন। সে আর তাঁহার বন্ধনস্বরূপ থাকিবে না। সে নিজে সরিয়া গিয়া স্বামীকে রক্ষা করিবে।

কি করিবে, কোথায় যাইবে, সে কিছুই ভাবিল না—সে শুধু স্থির করিল স্বামীর আশ্রয় ত্যাগ করিবে। এমন দেবতার আশ্রয় পাইয়াও যে আশ্রয়হীন হয়—তাহার আশ্রয় কোথাও মিলিবে না।

সুধীর সকাল হইতেই কাজে বাহির হইয়াছিল। সে পরিশ্রান্ত হইয়া লজ্জিতভাবে যখন ঘরে ফিরিল, দেখিল বাড়িতে কেহই নাই। রাণী এমন সময় কোথায় গেল, সে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না। হঠাৎ বিছানার উপরে একটি চিঠি তাহার নজরে পড়িল। চিঠিখানা হাতে লইয়াই সে বুঝিতে পারিল রাণীর চিঠি, তাহাকে লেখা। চিঠিতে লেখা ছিল—

"আমার চোখের সামনে আমার দেবতাকে আমি প্রতিদিন লাঞ্ছিত হইতে দেখিতেছি—আমার দেবতা ধূলি-কর্দ্দমে মলিন হইতেছেন ; আমি আমার সমস্ত যন্ত্রণা তুচ্ছ করিতে পারিতাম, যদি দেখিতাম আমার পূজার অর্ঘ্য যথাস্থানে পৌঁছিতেছে ; আমাকে রক্ষা করিতে গিয়া যে দেবতা ঐহিক সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিলেন—আমাকে আশ্রয় দিতে গিয়া তাঁহার পারত্রিক সর্ব্বস্ব নষ্ট হইতে আমি দিব না। আমি আশ্রয়হীন হইয়া পৃথিবীতে জন্মিয়াছি—আমাকে আশ্রয় দিতে গিয়া এক দেবতার অমূল্য জীবন নষ্ট হইতে দেখিলাম। দেবতা স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত হউন—আমি চলিলাম।"

চিঠিখানা হাতে লইয়া সুধীর স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল।

আকাশ-বাসর

ললিতমোহনের শরীর ভাঙিয়া পড়িয়াছে ; এই অল্প বয়সেই কপালে ও চুলে বার্দ্ধক্য দেখা দিয়াছে। বেচারা অনেক আশা করিয়াছিল। কল্পনার রঙিন স্বপ্নে অনেক আকাশ-কুসুম রচনা করিয়াছিল, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত হতাশাই তাহার ভাগ্যে জুটিয়াছে। আশার ক্ষীণালোক তাহার মনে এখনও ধিকিধিকি জ্বলিতেছে,—স্ত্রী অশোকার সহানুভূতি ও প্রীতি পাইলে সে এই ভগ্ন শরীরেই একবার উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে পারে। তাহার আন্তরিক বিশ্বাস যে, অশোকা যদি এমন করিয়া তাহার প্রত্যেক কাজে বিরক্তি না দেখাইয়া তাহাকে সামান্য মাত্র উৎসাহও দেয়, তাহা হইলে সে বাহিরের সমস্ত অনাদর অকাতরে সহ্য করিয়া এখনও সবলে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে। কিন্তু বেচারার ভাগ্যে এতটুকু উৎসাহ-বাক্যও আজ পর্য্যন্ত জুটিল না।

আজ পাঁচ বৎসর হইল, সে সসম্মানে এম্-এ পাস করিয়াছে ; একটু চেষ্টা করিলেই প্রফেসারি হউক কি মাস্টারী হউক, কিছু একটা ভালো চাকরি সে সহজেই জুটাইয়া লইতে পারিত, কিন্তু সে তাহা করে নাই। কাব্য-সরস্বতী তাহার স্কন্ধে বহুদিন হইল ভর করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সরস্বতীকে তাঁহার ন্যায্য পাওনা-গণ্ডা বুঝাইয়া দিয়া উদ্বৃত্ত সবটুকুই সে কবিতা, কাব্য ও সাহিত্যচর্চ্চাতে দিয়া আসিয়াছে। সেদিনও তাই সে কবিতার কমলবন পরিত্যাগ করিয়া কমলার রত্ন-সিংহাসনের পাশে আসিয়া জুটিতে পারিল না, কাব্য-সরস্বতী ও দারিদ্র্য দুইজনকেই একসঙ্গে বরণ করিয়া লইল। সে অবিশ্রাম কাব্যচর্চ্চা করিতে লাগিল এবং মাসিকে সাপ্তাহিকে গল্প, উপন্যাস, কবিতাদি প্রকাশ করিয়া কোন রকমে মনের

আনন্দে পেটের খোরাক জোগাইতে লাগিল। আসলে, তাহার পেশা হইল সাহিত্য-সাধনা।

ইহাতে মুসড়িয়া পড়িবার কিছু ছিল না, কারণ বন্ধন বলিতে যাহা বুঝায় আমাদের ললিতমোহনের তাহা একটিও ছিল না। অল্প বয়সেই তাহার বাবা মারা যান; মাও অনেককাল গত হইয়াছেন। এক দূর-সম্পর্কীয়া বিধবা পিসীমা ছাড়া সম্প্রতি তিনকুলে তাহার আর কেহ নাই। তিনি দেশে থাকিয়া ললিতমোহনের পৈতৃক ভিটাটুকু আগলাইতেন ও তাহার পৈতৃক সম্পত্তির আয় ২১৸৵০ নিয়মিতভাবে মাসে মাসে তাহাকে পাঠাইয়া দিতেন। সুতরাং, বন্ধন না হইয়া পিসীমা তাহার এই কাব্য-সাধনায় একটু মুক্তির আনন্দই দিতেন। এই ২১৸৵০র উপর লিখিয়া-টিখিয়া সে যাহা পাইত তাহাতেই তাহার কলিকাতায় বাস ও উদরের সংস্থান দুই-ই হইত, এমন-কি মাসিক চার-পাঁচ টাকার বই কিনিবার অভাবও তাহার কোনদিন হয় নাই।

ললিতমোহনের দৃঢ় ধারণা ছিল যে, সে এমনই করিয়া সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধনায় জীবন কাটাইবে; বাঁধা পড়িবে না। কিন্তু কেমন করিয়া যে সব গোলমাল হইয়া গেল, সে ঠিক বুঝিতে পারিল না। এম-এ পাস করার দুই বৎসরের মধ্যে সে অশোকাকে বিবাহ করিয়া ফেলিল এবং সেইদিন হইতেই তাহার দুর্দ্দশা আরম্ভ হইয়াছে।

সাহিত্য-রোগে আক্রান্ত হইলে সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি মস্ত উপসর্গ আসিয়া জোটে; সেটি পাঠক বা শ্রোতা সংগ্রহ করা। রাত্রি জাগরণ করিয়া মনের আনন্দে লিখিয়া গেলাম আর সেখানেই আনন্দের সমাপ্তি হইল, এমন মনোভাব লইয়া কোনও নির্ব্বিকার সন্ন্যাসী সাহিত্যিক কোথায়ও জন্মিয়াছেন কি না জানি না, কিন্তু ললিতমোহন মনের সমস্ত রস দিয়া যাহা লিখিত, মনের সমস্ত রস দিয়া যদি কেহ তাহা উপভোগ না করিত, তাহা হইলে তাহার সব আনন্দ মাটি হইল বলিয়া মনে হইত। তাই সে রাত্রের

থে্যা সকালে অতি সন্তর্পণে চায়ের দোকানে লইয়া গিয়া পরিচিত লোকের অপেক্ষায় থাকিত এবং অর্দ্ধ বা সিকি পরিচিত লোক দেখিলেও কথায় কথায় তাহার লেখার কথা পাড়িয়া তাহা শোনাইতে বসিত। এখানেই অশোকার মামাতো ভাই অজিতের সঙ্গে তাহার পরিচয় হয়। অজিত ললিতের লেখার একজন ভক্ত ছিল; অশোকাকেও ললিতের কাব্য-সাহিত্যের পক্ষপাতী জানিয়া সে একদিন ললিতকে অশোকাদের বাড়ি লইয়া গিয়া তাহাদের সহিত পরিচয় করিয়া দিল। ললিত মধ্যে মধ্যে অশোকাদের বাড়ি গিয়া নূতন গল্প, কবিতা বা উপন্যাসের টুকরাবিশেষ শোনাইয়া আসিত। অশোকা ভালমন্দ সমালোচনা করিয়া তাহাকে উৎসাহিত করিত। অশোকার সহিত এই পরিচয় ক্রমশ প্রণয়, প্রেম ও পরিণয়ে পর্য্যবসিত হইল।

অশোকার পিতা রাজীবলোচনবাবু সাব-ডেপুটী হইতে পদোন্নতি করিয়া সম্প্রতি আলিপুরের ম্যাজিস্ট্রেট ও রায় বাহাদুর হইয়াছেন। ধর্ম্মতলা অঞ্চলে একটি ত্রিতল বাড়িতে সপরিবারে তাঁহার বাস। পরিবার বলি গৃহিণী, অবিবাহিতা তিন কন্যা—অশোকা, রেবা ও ভায়োলেট, এব ভ্রাতুষ্পুত্রী সুপ্রভা ও সুপ্রীতি। মেয়েরা সবাই স্কুল কলে অশোকার বড় তিন বোন হরিমতি, গৌরী ও সুশীলার বি গিয়াছে; তাহারা সিমলা, ঝরিয়া ও বালীগঞ্জের স্ব স্ব স্বামী করিতেছে।

অশোকা তখন বেথুন কলেজে বোটানি, হিস্ট্রি ও বাংলা লইয়া পড়িতেছে; সুপ্রীতি তাহার সহপাঠী। অশোকার বিবাহের চলিতেছে। বালীগঞ্জের ব্যারিস্টার এম. সি. ঘোষের পুত্র অবনী ঘনঘন এ-বাড়িতে গতায়াত করেন। ইতিমধ্যে অজিতের মারফত মোহনের আবির্ভাবে সব গোলমাল হইয়া গেল। বুদ্ধিমতী অশোকার খ্যাতি ছিল, কিন্তু সে-ই ললিতের 'একরাত্রি' গল্পটি শুনি

পড়িয়া গেল। ললিতমোহনের ছেলেমানুষি ও সাংসারিক জ্ঞানের অভাব তাহাকে যতই তাহার বোনেদের ও অবনীবাবুর কাছে বোকা বানাইতে লাগিল, সে ততই তাহার প্রেমকে নিবিড় করিয়া তাহাকে যেন রক্ষা করিতে লাগিল।

এই অকারণ-প্রীতি দেখিয়া ভালমানুষ ললিতমোহনের সমস্ত প্রতিজ্ঞা ভূমিসাৎ হইয়া গেল। কাব্য-সরস্বতীর দিক হইতে তাহার আংশিক মন এই দুষ্ট সরস্বতীটির উপর আসিয়া পড়িল, সে অশোকাকে ভালবাসিল।

রাজীবলোচনবাবু ও তাঁহার গৃহিণী সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, অসম্ভব। ললিতমোহনের দুরবস্থা ও কাব্য-প্রীতির কথা শুনিয়া এই প্রস্তাবকে তাঁহারা ললিতের স্পর্দ্ধা বলিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। তাঁহারা তো ঠিকই করিয়াছেন, আই-সি-এস ব্যতীত অন্য কাহারও ভাগ্যে অশোকাকে পড়িতে দিবেন না। তা ছাড়া অবনীও তো রহিয়াছে। বাধা পাইয়া অশোকার জিদ চড়িয়া গেল। বাবা ও মা অনেক বুঝাইলেন; বলিলেন, নিঃস্বকে বিবাহ করিলে তাহার দুঃখের অবধি রহিবে না। আর রোজগেরে অন্য তিন জামাইয়ের সঙ্গে তাহাকে এক সঙ্গে ই বা কি করিয়া? তাহার কাপড়-চোপড় জোগাইতেই তো প্রাণান্ত হইবে,—ইত্যাদি। অশোকা কিন্তু টলিল না। মা ন, বাবা বকিলেন, বোনেরা হাসিল।

বলিলেন, অবুঝ মেয়ে, নিজের কিসে ভাল হয় তা বুঝছিস না তোকে বিয়ে করবার মত যোগ্যতা কি ললিতের আছে?

শাকা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, কেন, ও আমার অযোগ্য কিসে?

বলিলেন, পোড়া কপাল আমার, যে জেগে ঘুমোয়, তাকে জাগানো

বলিলেন, মেয়ে অবুঝ বলে কি আমাকেও অবুঝ হতে হবে? নেগুনে এমন করে ওকে ভাসিয়ে দিতে পারব না।

অশোকা বলিল, তাহা হইলে সে বিবাহই করিবে না। অগত্যা গৃহিণী ত্রীবলোচনবাবুকে বুঝাইলেন, আর যাই হউক, ছোঁড়াটা ফার্স্ট ক্লাস এম-এ। তুরবস্থায় পড়িলে ডিগ্রী ভাঙাইয়াও খাইতে পারিবে। সংসারের চাপ পড়িলেই এই কাব্য-প্রীতি ঘুচিবে। রায় বাহাতুর মেয়েকে নাছোড়-বান্দা জানিয়া অত্যন্ত তুঃখের সহিত মত দিলেন। নানা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে বিবাহ হইয়া গেল। বালীগঞ্জের জামাই অধরচন্দ্র আসিলেন। সিমলা ও ঝরিয়া হইতে যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথের একটি করিয়া স্বরলিপি-সম্বলিত গানের বই উপহার আসিল। অবনীবাবু গোল্ডস্মিথের জীবনচরিত একখানি দিয়া গেলেন।

ললিত প্রথমটা হাতে স্বর্গ পাইল। অশোকাও সাহিত্যিক স্বামীর গর্ব্বে পিতা মাতা বন্ধু বান্ধবদের তাচ্ছিল্য গায়ে মাখিল না। তাহারা গড়পার খালধারে একখানা চারতালা বাড়ির একটি ফ্ল্যাট ভাড়া করিয়া আপনাদের ক্ষুদ্র সংসার পাতিয়া ফেলিল। বাড়িখানিতে বিশ-পঁচিশটা ফ্ল্যাট। পায়রার খোপের মত ছোট ছোট ঘরগুলি ; বারান্দাগুলিও তক্তা দিয়া ভাগকরা ; নানা ধরনের ভাড়াটের রুচি-বৈচিত্র্যে বাড়িখানি বিচিত্র। কোন জানালায় সুশ্রী পরদা, কোথায়ও বা বস্তা-ছেঁড়া, পুরানো ধুতী কিংবা নানা বর্ণের কাপড়ের সংযোগে পরদা প্রস্তুত হইয়াছে। বারান্দায় কোথাও ছেঁড়া কাঁথা শুখায়, কোথায় রেলিঙের উপর ধুতি শাড়ির সমারোহ। ব্রাহ্ম, হিন্দু, শিখ, কেরানী, সাহিত্যিক, ইলেকট্রিক মিস্ত্রী, ডাক্তার, উকিল প্রভৃতি নানাদরের ও স্তরের ভাড়াটে লইয়া সর্ব্বদা বাড়িখানি গমগম করিত। কাহারও সঙ্গে কাহারও বিশেষ পরিচয় নাই ; আপন আপন ঘরগুলি গুছাইয়া লইয়া প্রত্যেকেই নির্ব্বিবাদে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। সিঁড়িতে কচিৎ কখনও এ-ভাড়াটেতে ও-ভাড়াটেতে দেখা হয় ; সন্ধ্যা ও সকালে উনানে কয়লা দিবার সময় উপরের ও নীচের লোকেদের মধ্যে প্রত্যহ তুইবার করিয়া বচসা হয়, আর পাম্পে জল উঠা বন্ধ হইলেই জল লইয়া ঝগড়া বাধে।

ললিতমোহনের চারতলায় দুইটি শুইবার ঘর ও একটি রান্নাঘর ছাতের সিঁড়িতে চাবি থাকিত, সেটি তাহারই এলাকাভুক্ত।

বেশ দিন চলিতেছিল,—কাব্যে গল্পে গানে দুইটিতে 'কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষচূড়ে বাঁধি নীড় থাকে সুখে', সুখেই দিন কাটাইতেছিল। ইতিমধ্যে সিমলা হইতে হরিমতি আসিয়া গোল বাধাইল। তাহার চালচলন, পয়সার জাঁক, সাজের বাহার আর কমিসরিয়েটের বড়বাবুর খাতির সবসুদ্ধ সে একটা মূর্ত্তিমান বিদ্রোহের মত অশোকার সংসারে আসিয়া পড়িল। হরিমতির যখন কিশোর বয়স, তখন রাজীববাবুর অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না; বাড়িতে স্ত্রী-শিক্ষারও বেশ রেওয়াজ হয় নাই; হরিমতি পাড়া বেড়াইয়া পা ছড়াইয়া সুমতির বর কিংবা কাজলীর নেকলেশছড়া সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া কাটাইয়াছে—এই অবস্থায় শাশুড়ী ও অভিভাবক-হীন ঘরে পড়িয়া সে একেবারে মাতব্বর হইয়া পড়িল ও নিজের শখের মাত্রা নিরীহ স্বামীর উপর দিয়া পূরাপূরি মিটাইয়া লইতে লাগিল। যাহার কথায় অতগুলি সরকারী কর্ম্মচারী উঠে বসে, সেই কমিসরিয়েটের বড়বাবুই উঠিতে বসিতে তাহার মুখ চাহিয়া থাকেন-ইহাতে তাহার গর্ব্বের অন্ত নাই। স্বামীর জন্য স্ত্রীদের আত্মোৎসর্গের কথা সে ভাবিতেই পারে না। অশোকা প্রথমটা বিরক্ত হইয়া স্বামীর প্রতি দিদির খোঁটাগুলির প্রতিবাদ করিত। হরিমতি ললিতের ঘরের সামান্য অভাবগুলিকেই এত বড় করিয়া দেখাইতে লাগিল যে, প্রথমত অশোকার বিরক্তি ধরিয়া গেল। একদিন হরিমতি মাকে সঙ্গে করিয়া অশোকার বাড়ি বেড়াইতে আসিয়া দেখিল, সে তাহার একটা পুরাতন শাড়ি সেলাই করিতেছে, মায়ের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া হরিমতি বলিল, মা, তোমারও কি পয়সার অভাব ঘটেছে নাকি? যখন জানই ললিতের ক্ষমতা নেই, মাঝে মাঝে কাপড়টা ব্লাউজটা কিনে দিলেই পার। মা বলিলেন, আ কপাল, মেয়ের যে দেমাক ভারী, মুখ ফুটে কি কিছু বলে।

সেদিন গোয়াবাগানে নেমন্তন্ন খেতে গেল না—বললাম, কাপড় জামা তোর না থাকে বল্, আমি আনিয়ে দিচ্ছি ; মেয়ের অভিমান হ'ল, বললে, কাপড়-চোপড় আছে। এখনই কি হয়েছে মা, যে লোকের হাতে ও পড়েছে, আরও কত না জানি ওর কপালে আছে।

অশোকা অভিমান-ক্ষুব্ধ ভাবে বসিয়া রহিল, বলিল, সব্বাইকার অবস্থা কি সমান হয় মা, ক্ষমতা নেই দেবে কোত্থেকে।

মা ফোঁস করিয়া উঠিলেন, কেন, চেষ্টা করেছে কোনদিন—তোর জন্যে একটু কি ভাবে? খালি লেখা আর পড়া।

অশোকার ইচ্ছা হইল বলে—বড় জামাইবাবুর মত মদে ডুবিয়া থাকা অপেক্ষা সে অনেক ভাল ; কিন্তু সে চুপ করিয়া রহিল। ঘা খাইয়া খাইয়া তাহার মনেও বিরক্তি ধরিয়াছে। দিনের পর দিন এই ভাবে স্বামীর নিন্দা শুনিতে শুনিতে সে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সব রাগ গিয়া পড়িল ললিতমোহনের উপর, তাই তো, ও তো চেষ্টা করলেই পারে—বিদ্যা বুদ্ধির তো অভাব নাই। তবে সে চেষ্টা করে না কেন? অথচ ললিতকে কিছু বলিতে গেলে সে হাসে। শেষে সেও স্বামীর অপদার্থতা কল্পনা করিয়া তাহার প্রতি বিরূপ হইতে লাগিল। মা ও দিদি ইন্ধন যোগাইতে কসুর করিল না। আরও দুই-চারিজন বন্ধু জুটিল ; তাহাদের সহানুভূতিসূচক হা-হুতাশে তাহার গৃহ মুখরিত হইয়া উঠিল। সে বুঝিল ও বিশ্বাস করিল, তাহার এই অপরূপ রূপ ও গুণ একজন অপদার্থের হাতে পড়িয়া নষ্ট হইয়াছে। ললিত একেবারে তলাইয়া গেল।

একদিকে নিজের কাব্যজীবনের হতাশ্বাস, অন্যদিকে স্ত্রীর বিমুখতা ললিতমোহনকে নিত্যই পীড়া দিতে লাগিল। সে জীবনে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িল। এখনও সে মাঝে মাঝে ভাবিতে বসে—হায়, যদি অশোকা তাহার দুঃখ বোঝে, তাহা হইলে জীবনে যশ ও অর্থ সামান্য যাহা কিছু জুটিতেছে তাহা দিয়াই তাহারা স্বর্গ গড়িতে পারে। এত বিফলতার

মধ্যেও তাহার ভক্তদের নিকট হইতে যথেষ্ট আনন্দের খোরাক [illegible] অশোকার প্রীতি তাহা নিবিড় ও দীর্ঘস্থায়ী করিয়া আর্থিক [illegible] দুঃখ দূর করিতে পারে, কিন্তু মা-বোনের চেষ্টায় অশোকার মনের অবস্থা এখন এমন দাঁড়াইয়াছে যে, ফাঁকা আনন্দে তাহার আর মন উঠে না; সে চায় সাজ-সজ্জা, বিশ্রাম, বিলাস; এগুলি অর্থসাপেক্ষ এবং ললিত-মোহনের আর যাই থাক, এই অর্থ জিনিসটার অভাব ছিল।

ললিতমোহনের প্রথম উপাখ্যাস 'কালের কোপ' বেশ কাটিয়াছিল এবং সে ভবিষ্যতের অনেক রঙিন স্বপ্নও দেখিয়াছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বই 'মনুর মা' একেবারেই কাটিল না। সেই নিশ্চিত ২১॥৵০ ও প্রথম উপন্যাসের আয় হইতে গোড়ার দিকে সংসার বেশ চলিয়াছিল, কিন্তু সম্প্রতি তাহা প্রায় অচল। বর্ত্তমানের সামান্য আয়েই স্বামী-স্ত্রীর বেশ চলিয়া যাইত; কিন্তু রায়-বাহাদুরকন্যা অশোকার খরচের হাতটা বেশ একটু বেশি ছিল। ভালবাসার দিকে আজকাল যেমন সে ভালবাসার দাবি করিত, কিন্তু ভালবাসিত না, খরচের বেলায়ও খরচ করিয়া যাইত, সঞ্চয় করিত না।

সংসার আরম্ভ করিবার প্রথম দিকে মা বলিতেন, বেবী, তোর মত এমন সুন্দরী বউ পেয়ে ললিতের আয়ের দিকে নজর দেওয়া উচিত। দামী কাপড়চোপড়ে তোকে কেমন মানায় এটা লক্ষ্য করা তার কর্ত্তব্য। এই পোড়া কাব্যি-নবেল লেখা ছেড়ে সে কোনও ব্যবসা করে না কেন?

সাহিত্যিক-গৃহিণীর আত্মমর্য্যাদার নেশা তখনও কাটে নাই। সে মায়ের দিকে রোষ-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া চুপ করিয়া থাকিত।

এখন তাহার মন ভাঙিয়াছে। সকাল নাই, সন্ধ্যা নাই, মা বোন ও সখীরা সহানুভূতি দেখাইতে আসিয়া তাহার ঘরে জটলা পাকায়; এই হট্টগোলে বেচারা ললিতের সমস্ত কাজ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সে তিনদিনেও একবারও কাগজ কলম লইয়া বসিতে পারে না। সে ভাবে, আহা, অশোকাকে এরা ভালবাসে, তাই আসে। [illegible] থাকে।

কিন্তু ক্রমশ এসব অসহ্য হইয়া উঠিল, তাহার কাজের অত্যন্ত ক্ষতি হইতেছে ; নিষ্ফল আক্রোশে তাহার মেজাজও খিটখিটে হইয়া পড়িয়াছে। স্ত্রীর অবিবেচনায় আর মনের সঙ্গে যুদ্ধে সে আজ অসুস্থ।

সে চুপি চুপি এক ডাক্তারের কাছে গিয়া পরামর্শ চাহিল। পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার বলিলেন, পাড়াগাঁয়ে এই হট্টগোলের বাহিরে ফাঁকা জায়গায় কিছুদিন বাস না করিলে তাহার শরীর সারিবে না। রোগের ঔষধ শুনিয়া ললিত একটু হাসিল। স্থান পরিবর্ত্তন—হায় রে, সে না জানি কত টাকার ব্যাপার!

ডাক্তার অবাক হইয়া বলিলেন, হাসির ব্যাপার নয় মশাই, আপনার বুকটা—

ফ্যাকাশে শীর্ণ মুখখানি ডাক্তারের দিকে তুলিয়া ললিত আর একবার হাসিল। ডাক্তার বুঝিলেন ও মৃদু হাস্য করিলেন। ললিত বলিল, আমার বুকটা হাসির ব্যাপার নয়—আপনার প্রেস্‌ক্রিপশন শুনে হাসি পাচ্ছে—আমার পক্ষে বেশ একটু রাজকীয় রকমের ওষুধের ব্যবস্থা করলেন কিনা।

ললিত বাড়ি আসিল এবং হাওয়া পরিবর্ত্তন, বুকের অসুখ ইত্যাদি ভুলিয়া একাগ্রচিত্তে তাহার 'গদ্য-সাহিত্যে স্বরবিন্যাস' পুস্তকখানির তৃতীয় অধ্যায় লিখিতে বসিল। কিন্তু পাশের ঘরে তখন তাহার শাশুড়ী, বড় শালী, অশোকা ও তাহার দুই-চারিজন প্রাণের বন্ধু মিলিয়া সশব্দে তাস খেলিতেছে। তাহাদের উচ্চ কলোচ্ছ্বাস হাঁক-ডাকে তাহার সমস্ত স্বর-বিন্যাস ঘুলাইয়া গেল। সে রাগে কলম কামড়াইতে লাগিল, চুল ছিঁড়িতে শুরু করিল এবং ভাবিতে ভাবিতে তাহার একেবারে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। সে সশব্দে [illegible] খুলিয়া দিল। মেয়েরা বিষম বিরক্তিতে তাহার দিকে [illegible] ললিত বলিল, আপনারা কি

আমাকে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বলেন ? একটু আস্তে আস্তে খেলুন না, নইলে আমার এই লেখা-ব্যবসাটা ছাড়তে হবে দেখছি।

ক্ষণকালের জন্য সবাই চুপচাপ ; তারপর সুপ্রীতি খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। শাশুড়ী ঘৃণায় মুখ ফিরাইলেন, অশোকা ঘাড় তুলিয়া ললিতের দিকে চাহিয়া চড়া গলায় বলিল, আচ্ছা আচ্ছা, তা হ'লে তো বাঁচি।

ললিত ক্রোধে বিরক্তিতে ঘর ছাড়িয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। স্ত্রীর বন্ধুদের হাসি তাহার বুকে তীরের মত বিঁধিতে লাগিল, সঙ্কীর্ণ বারান্দা ধরিয়া সে সিঁড়ির সামনে আসিল ; ভাবিল, নীচে রাস্তায় জনতার মধ্যে বাহির হইয়া পড়িবে, কিন্তু তাহার আহত মন একটু নিরিবিলি থাকিতে চায়। হঠাৎ ছাদের সিঁড়ির দিকে নজর পড়াতে সে আশ্বস্ত হইল। সঙ্গে চাবি ছিল—নিঃশব্দে বাড়ির ছাদে গিয়া উপস্থিত হইল।

ছাদে উঠিতেই একটি দূরের বাড়ির ছাদের দিকে তাহার নজর পড়িল ; বাড়ির ছেলেরা ছাদে ব্যায়াম করিতেছে। আকাশের গায়ে মুগুর ডাম্বেল সহ তাহাদের শরীর-সঞ্চালন, ললিতের মনে হাস্যরসের সৃষ্টি করিল। তাহার বিরক্তি ভাব কাটিয়া গেল,—দুর্ব্বল শরীর চাঙ্গা হইয়া উঠিল।

আগে সে দুই-একবার এই ছাদে উঠিয়াছে। কিন্তু তখন ইহা বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় ছিল না। চারিদিক দেখিয়া তাহার মনে হইল, যেন সে একটি সম্পূর্ণ নূতন রাজ্য আবিষ্কার করিয়াছে এবং সে যেন পরীর রাজ্য। কলিকাতা শহর যে কত সুন্দর, সে এই প্রথম তাহা দেখিল। প্রাসাদ ও অট্টালিকার চূড়া, কলের চিমনি, নারিকেলগাছের মাথা, সব-সমেত কলিকাতা অপরূপ সৌন্দর্য্যে শোভা পাইতেছে ; গীর্জ্জার চূড়ায় ও দুই-একটি বাড়ির চিলেকোঠায় নানারঙের পতাকা উড়িতেছে। দূরে খালের জল ইস্পাতের পাতের মত ঝলক দিয়া উঠিতেছে। রাস্তার গাড়ি ঘোড়া ও মানুষের ভিড় যেন পিঁপিড়ার সারি বলিয়া মনে হইল। পশ্চিমাকাশে

সন্ধ্যার মেঘে অপূর্ব্ব বর্ণবৈচিত্র্য। বাতাস মৃদু বহিতেছে। ললিতের উত্তপ্ত ললাট কাহার যেন স্নেহ-করস্পর্শে শীতল হইয়া গেল। চিম্নির ধোঁয়ার গন্ধই তাহার মনে পুলক-সঞ্চার করিল। শব্দ, গন্ধ, আকাশ, মেঘ, ধোঁয়া, দূরের বাড়ির ছেলেদের কসরৎ—সবসুদ্ধ তাহাকে তাহার চার-তলার ঘরের বিরক্তিকর বাস্তবতা হইতে বহুদূরে লইয়া গেল।

ললিত বিপুল আরামে নিশ্বাস লইতে লাগিল, যেন এতকাল কেহ তাহাকে অন্ধকার গুহায় আটক করিয়া রাখিয়াছিল। ছাদের আলিশায় ভর দিয়া উদাস-আগ্রহে একবার শহরের উপর চোখ বুলাইয়া লইল। পাশেই একটু নীচে একটি বাড়ির ছাদ। চৌতলার ঘরটির স্কাই-লাইটের ভিতর দিয়া ভিতরের খানিকটা দেখা যাইতেছিল। ছবি, ছবি আঁকিবার সরঞ্জাম ইত্যাদিতে ঘরখানি ভর্ত্তি। কোনও চিত্রকরের স্টুডিও হইবে। চিত্রকর একটি রঙিন রেশমী লুঙ্গির উপর পাঞ্জাবি পরিয়া আছে, গভীর মনোযোগের সহিত সম্মুখে দেখিতেছে, আনন্দে শিষ দিতেছে ও কাগজে আঁচড় কাটিতেছে। সম্ভবত সে কোনও মডেলকে দেখিয়া ছবি আঁকিতেছিল। মডেলটিকে দেখা যাইতেছিল না।

আর্টিস্টের অখণ্ড মনোযোগ, শিষের শব্দ ও কাজের তৃপ্তি দেখিয়া ললিতের বুক জ্বলিয়া উঠিল, কে যেন তাহাকে বাস্তবজগতের মধ্যে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল। নিজের বিফলতার চিন্তায় তাহার মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ হইতে লাগিল। সে [illegible] রহিল। ইহাই তো তাহারও কাম্য! কাজের মধ্যে মগ্ন হইয়া যাওয়া; নিজের সৃষ্টিকে মনের আনন্দে উপভোগ করা; সৃষ্টির মত্ততায় আত্মহারা হওয়া; স্বাস্থ্য আপনিই আসিবে। ডাক্তারের কথা তাহার মনে পড়িল—খোলা জায়গা, নিরিবিলি, বিশুদ্ধ বায়ু।

অনন্ত আকাশের দিকে মাথা তুলিয়া ললিতমোহন আর একবার চারিদিক দেখিয়া লইল। আকাশে তারা ফুটিতে শুরু হইয়াছে। বাতাসের

গতি মৃদুমন্দ। ঠিক, এখানেই তো সব মিলিবে—পর্য্যাপ্ত বায়ু, বিপুল আলো, নীরব শান্তি। ডাক্তারের নির্দ্দেশমত ললিত হাওয়া পরিবর্ত্তন করিবে, কিন্তু পাড়াগাঁয়ে নয়, এই ছাদের উপরে। সন্ধ্যা-সঙ্গীতের কয়েকটা লাইন ললিতমোহনের মনে পড়িয়া গেল—

অনন্ত এ আকাশের কোলে
টলমল মেঘের মাঝার,
তোর তরে বাঁধিয়াছি ঘর
হে মানসী কবিতা আমার!

সেও এখানে ঘর বাঁধিবে।

এই আকাশ-বাসরের কথা মনে হইতেই সে আরাম পাইল। যাক শাশুড়ী, শালী সমেত অশোকাকে তো ফাঁকি দেওয়া যাইবে!

ললিতমোহনের হাসি পাইল। জিনিসটা কত সহজ, অথচ তাহার কাছে কি অপরূপ স্বর্গই না বহন করিয়া আনিবে! পাশের দুইটি বাড়ির চিলে-কোঠার ছায়া দুপুরের দুই-তিন ঘণ্টা ছাড়া সব সময় ললিতের ছাদে পড়ে, একটি মাদুর আর লেখার সরঞ্জাম আনিলেই চলিবে। পাশের বাড়ির আর্টিস্টের চেয়ে এবিষয়ে সে অধিক ভাগ্যবান। লিখিবার সরঞ্জাম যৎসামান্য।

একদিন তাহার প্রাণে সৃজনের যে অপার্থিব প্রেরণা টলমল করিত—দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পঙ্কিলতা ও ধিক্কারে যাহা সে আজ হারাইয়া ফেলিয়াছে, তাহা আবার বুঝি ফিরিয়া আসিবে। হয়তো বা জীবনের আদর্শ ও সার্থকতা সে লাভ করিবে; সেই অদম্য শক্তির আগমনী তখনই তাহার বুকে বাজিতে লাগিল। তাহার মনে বর্ত্তমানের হতাশ্বাসকে চাপা দিয়া ভবিষ্যতের আশা পুঞ্জীভূত হইতে লাগিল। তাহার চিন্তাধারায় চেতনা সঞ্চারিত হইল। সে বাঁচিবে—তাহাকে যে অনেক কিছুই দিতে হইবে।

পরদিন ভোরে উঠিয়াই ললিতমোহন চুপি চুপি একটি মাদুর, একটি ডেক-চেয়ার ও একটি ছোট্ট জলচৌকি ছাদে রাখিয়া আসিল। সকালে চা খাইয়া সে খাতা পেন্সিল হাতে লইয়া বাহির হইয়া গেল এবং অতি সন্তর্পণে ছাদে উপস্থিত হইল। প্রথম কয়েক দিন সে একটি লাইনও লিখিতে পারিল না। মুক্তি ও শান্তির আনন্দ তাহার মনে উপচিয়া পড়িতেছিল। সে ডেক-চেয়ারখানিতে বসিয়া দূর দিগন্তে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

অশোকার কোনও সন্দেহ হইল না যে, স্বামী তাহাকে এত কাছে থাকিয়া ফাঁকি দিতেছে। কিছুকাল হইতেই স্বামীর দিকে তাহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল না। খাতা লইয়া ললিতকে বাহিরে যাইতে দেখিয়া ভাবিল— লাইব্রেরিতে যাইতেছে। এমন সে প্রায়ই যায়।

এমনই করিয়া সাত দিন কাটিয়া গেল।

ইতিমধ্যে ললিতমোহন বর্ষা-বাদলের দিনে আত্মরক্ষা করিবার জন্য একটি তেরপল সংগ্রহ করিয়া লইয়া পাশের বাড়ির চিলে-কোঠার গায়ে খুঁটি লাগাইয়া তাহা টাঙাইবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিল।

ললিত সকাল-সন্ধ্যা বাহিরে যাইতে লাগিল। শাশুড়ী একদিন বলিলেন, লাইব্রেরিতে বুঝি ঢের কাজ হয়! তাঁহার স্বর শ্লেষপূর্ণ।

অশোকা আহত হইল। তাহার চক্ষু জ্বালা করিতে লাগিল। সম্প্রতি স্বামীর প্রতি বীতরাগ হইলেও সে স্বামীকে ভালবাসিত ও স্বামীগর্ব্বে এখনও সামান্য গর্ব্বিত ছিল। সে নিজেও আজকাল স্বামীর বিরুদ্ধে অনেক কথাই বলিয়া থাকে, কিন্তু তাহার কথায় অভিমান আছে, মায়ের মত জ্বালা নাই। অবশ্য মেয়ের শুভাশুভ চিন্তায় মাকে অনেক কিছু ভাবিতে হয় ও মেয়ের অমঙ্গলাশঙ্কায় মায়ের এই কটূক্তির বিরুদ্ধে বলিবারও কিছু নাই। তবু সে ব্যথিত হইল, মা মেয়ের এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিলেন না।

তাসের আড্ডা নিয়মিত জমিতে লাগিল। রবিবাবুর নূতনতম গানের স্বরলিপি হইতে বালীগঞ্জের আধুনিকতম ফ্যাশন পর্য্যন্ত কথার আর শেষ ছিল না। অশোকার এসব আর ভাল লাগে না, এত গোলমাল সত্ত্বেও তাহার কাছে ঘরগুলি ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। ললিতের অভাব সে এখন অনুভব করে। তাহার মনে হয় স্বামী বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে! রাত্রিতে শুইবার সময় এই দূরত্বটুকু বিশেষভাবে ধরা পড়ে। ললিত তখন কাব্য-সৃষ্টির আনন্দে ভরপূর; মুখচোখ দিয়া তাহার আনন্দ ঠিকরিয়া পড়ে; অশোকা তাহার ভাগ পায় না। স্বামী যেন তাহার অস্তিত্বও বিস্মৃত হইয়াছে।

স্থান-পরিবর্ত্তনের দশম দিনে ললিতমোহনের মূর্চ্ছাহত বাণী পুনর্জাগ্রত হইল; প্রকাশের বেদনায় তাহার মস্তিষ্ক টনটন করিয়া উঠিল, সে লিখিতে শুরু করিল। বন্যার মত ভাব কলমের মুখে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। সে তাহার আংশিক লিখিত উপন্যাসখানি নূতন করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিল। তাহার 'অন্তর্য্যামী' তাহাকে লইয়া খেলিতে লাগিলেন। যাহা সে ভাবে নাই, কেমন করিয়া তাহাই সে প্রকাশ করিতে লাগিল! তাহার অন্য দুইটি উপন্যাস যে মামুলি ভাবে লেখা হইয়াছিল, এটি তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের হইল। বিশ্বমানবের সুখ-দুঃখের, আশা-আনন্দের চিরন্তন বারতা সে লিখিতে বসিল। সে যেন এক নূতন মন পাইয়াছে। কিছু-দিনের রুদ্ধ আবেগ যেন অদম্য শক্তি সংগ্রহ করিয়া বন্যার বেগে বাহিরে আসিতে চায়। বঞ্চিতের ক্রন্দন, ব্যথিতের দুর্ব্বলতা এই বন্যাবেগে কোথায় ভাসিয়া গেল; রসে গানে তেজে সৌন্দর্য্যে তাহার নূতন উপন্যাস-খানি অপূর্ব্ব-সৃষ্টি হইয়া দাঁড়াইল।

প্রত্যহ পাঁচ ছয় ঘণ্টা লেখার পর পরিশ্রান্ত অথচ সুখাবিষ্ট চিত্ত লইয়া সে বহির্জগতের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে। সমস্তই কেমন যেন অপার্থিব আনন্দে ভরপূর। বিগত তিন বৎসর এই আনন্দ কোথায় যেন লুকাইয়া

ছিল! লেখা কাগজগুলি হাতের মুঠার মধ্যে ভাঁজ করিয়া সে ডেক-চেয়ারে আসিয়া বসে; সন্ধ্যার শিশিরে কাগজগুলি ভিজিতে থাকে; শীতল বাতাসের স্পর্শে তাহার সমস্ত ক্লান্তি দূর হইয়া যায়। সে উঠিয়া পায়চারি করিতে থাকে; সঙ্গে সঙ্গে পরের দিনের লেখাগুলি মনের মধ্যে গুঞ্জন করিতে থাকে।

শীত আসিয়া পড়িল। প্রথম প্রথম সকালে ও সন্ধ্যায় কাজ করিতে ললিতের কষ্ট হইত। ক্রমে তাহা সহিয়া গেল। তাহার দেহ ও মন ভারি হালকা হইয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে সন্ধ্যার আগে পাশের বাড়ির ছেলেদের দেখাদেখি সে হাত পা ছুঁড়িয়া ব্যায়াম করিয়া লয়। দৈনন্দিন জাগতিক জীবনযাত্রা হইতে সে এখন বহু উর্দ্ধে।

তাহার এই গোপন-বিহারের কথা সে অশোকার নিকট হইতে সন্তর্পণে ঢাকিয়া রাখে। বারান্দায় দুই-একদিন অশোকার সহিত তাহার দেখা হইয়াছে; সে সোজাসুজি ঘরে ঢুকিয়াছে; অশোকা অনুসন্ধিৎসু নয়—সে কিছু সন্দেহ করে নাই। না, কিছুতেই তাহাকে এই আকাশ-বাসরের কথা জানিতে দেওয়া হইবে না। সে তাহার উপার্জ্জিত সমস্ত অর্থে সংসার চালাইতে থাকুক, কিন্তু তাহার বড় সাধের সাধনাকে সে যখন অবহেলা করিয়াছে, তখন তাহার সুখদুঃখের খবর সে নাই জানিল। তাহা ছাড়া তাহার আনন্দের খানিকটা এই গোপনতার জন্যই। স্ত্রীর নিকট হইতে তাহার যে এই শারীরিক ও মানসিক বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, ইহাতে সে দুঃখিত নয়। তাহার দিনের কাজে সঙ্গী এখন কেবল সেই পাশের বাড়ির পরিচয়-না-জানা আর্টিস্ট। তাহার শিল্প-সাধনা সে লক্ষ্য করে ও উপভোগ করে। লোকটি খুব পরিশ্রমী। শিষ দিয়া গান গাহিয়া সে অক্লান্তভাবে কাজ করিয়া যায় এবং অবসরমত মডেলদের লইয়া চিত্তবিনোদন করে। অন্তরালে থাকিয়া তাহাদের নিষিদ্ধ প্রেমাভিনয় সে দেখিয়াছে।

মাঘের এক সন্ধ্যায় তাহার প্রাত্যহিক সান্ধ্যবিহারে বাধা পড়িল। যে

সংসারকে সে নীচে ফেলিয়া আসিয়াছে ভাবিয়াছিল—তাহারই এক বেদনা-তরঙ্গ তাহার আকাশ-বাসর আলোড়িত করিয়া দিল।

সমস্ত দিন গুমট করিয়া ছিল; চারিদিকে কেমন একটা নিরানন্দ ভাব; খণ্ডমেঘ-ভরা আকাশ পাণ্ডুর; চিমনিগুলি যেন বিষোদ্গীরণ করিতেছিল। সমস্ত শহর মূর্চ্ছাপন্ন; আনন্দ-কলোচ্ছ্বাসের স্থলে শহরের কোলাহল ব্যথিতের ক্রন্দন বলিয়া বোধ হইতেছিল। খালের জল কালো হইয়া যেন আসন্ন কি একটা দুর্য্যোগের প্রতীক্ষা করিতেছে। প্রথম দিকটা ললিতমোহন এসব কিছুই লক্ষ্য করে নাই; সে আপন মনে লিখিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ অস্তগামী সূর্য্যের দিকে দৃষ্টি পড়াতে সে চমকিয়া উঠিল। বোধ হইল, যেন সূর্য্যরশ্মি বেদনায় পাণ্ডুর; চারিদিকে কেমন একটা থমথমে ভাব। সে ছাদের কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইল। আর্টিস্টের স্টুডিওর স্কাইলাইট বন্ধ ছিল; ভিতরের আলো খালি দেখা যাইতেছে। ভিতর হইতে বাঁশীর আওয়াজ কানে আসিতেছে ও বাঁশীর তালে তালে মেঝেতে পা-ফেলার শব্দ শোনা যাইতেছে। সহসা সেই মৌন সন্ধ্যায় ললিতের আকাশ-বাসর কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিল; সে যেন জনশূন্য মরুভূমি মাঝে পড়িয়া আছে। তাহার লেখার কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। ভিতরের আগুন নিব-নিব হইয়া তাহাকে যেন ভস্মমাত্রে পরিণত করিয়াছে। সে একজন সঙ্গী চায়। অনন্ত শূন্যে নিজেকে ভারী একাকী মনে হইল।

হঠাৎ সম্মুখে দৃষ্টি পড়াতে দেখিল সে একা নহে। আর্টিস্টের ঘরের ছাদে একটি মেয়ে স্থির ছবির মত দাঁড়াইয়া আছে; যেন বিষাদের প্রতিমূর্ত্তি! মেয়েটির পরনে একটি নীলশাড়ি; যেন সে বাহিরে যাইবার জন্য সজ্জিত; তাহার চেহারাটি ভারী মধুর—বিষাদ-করুণ।

ললিতের অস্তিত্ব মেয়েটি একেবারেই টের পাই নাই—সে একদৃষ্টে নীচে পথের জনতার দিকে চাহিয়া ছিল। পাছে তাহাকে দেখিয়া

মেয়েটি কিছু মনে করে, ভাবিয়া ললিত অন্তরালে থাকিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে মেয়েটি সহসা আলিশার ধার হইতে সরিয়া আসিয়া অশান্তভাবে ছাদে পায়চারি করিতে লাগিল। ললিত গোপনে থাকিয়া তাহাকে দেখাটা অন্যায় মনে করিল না; কে যেন তাহাকে বলিয়া দিল তাহার উপস্থিতি প্রয়োজন; মেয়েটি ঠিক প্রকৃতিস্থ নহে। সে ছাদে হাওয়া খাইতে আসিয়াছে বলিয়া বোধ হইল না। মানুষের বিয়োগান্ত নাটকের অপরার্দ্ধ—অর্থাৎ নির্য্যাতিত নারীর দিকটি সে যেন সম্মুখে দেখিতে পাইল। যে বেদনা সে অশোকার কাছে পাইয়াছে, সেই বেদনাই বুঝি ইহাকে এই ছাদে শান্তির খোঁজে টানিয়া আনিয়াছে। এই অসীম আকাশের নীরবতার মধ্যে সে বুঝি তাহারই মত ডুবিতে চায়।

ললিত অবিলম্বে বুঝিতে পারিল, মেয়েটির ব্যথা একটু ভিন্ন ধরনের; সে আরও বেশি নিঃসঙ্গতা চায়; যেন তাহার অবসাদ কিছু করিবার অভাবে নহে—সৃষ্টি-শক্তির প্রেরণায় নহে, জীবনের সহিত দ্বন্দ্বে সে ধ্বংসকেই যেন বরণ করিতে চায়। তাহার চক্ষু অস্বাভাবিক দীপ্তিসম্পন্ন; কানের দুল দুইটি পর্য্যন্ত ঠিক স্বাভাবিক ভাবে দুলিতেছে না; তাহার মুখাবয়বে ও অঙ্গুলি-সঞ্চালনে একটা উগ্রতা ফুটিয়া উঠিতেছিল।

মেয়েটি চকিতে একবার চারিদিকে চাহিয়া লইয়া হঠাৎ আলিশার উপর দাঁড়াইল। সে কি করিবে ললিত ইতিপূর্ব্বেই স্পষ্ট অনুভব করিয়াছিল; সে বিদ্যুৎগতিতে ছুটিয়া আসিয়া পাশের বাড়ির ছাদে নামিয়া পড়িল ও মেয়েটি কিছু বুঝিবার পূর্ব্বে অতর্কিতে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

তাহাকে ধরিয়া টানিয়া নামাইতেই সে উন্মত্তের মত ললিতকে মারিতে লাগিল; আঁচড়-কামড় সত্ত্বেও ললিত তাহাকে সবলে ধরিয়া রহিল। এই ধস্তাধস্তির পরে দুইজনেই আলিশার পাশে দাঁড়াইয়া হাঁপাইতে লাগিল, মেয়েটি থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। বিষম উত্তেজনায় তাহার অধরোষ্ঠ

কম্পমান। নীচের রুদ্ধ-দ্বার স্টুডিওতে বাঁশী তেমনই বাজিতেছিল ; সশব্দ তালের শব্দ তেমনই চলিতেছিল।

উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনাবেগে ললিতের হাত ধরিয়া মেয়েটি বলিল, আপনি কেন আমায় বাধা দিলেন ? আপনি কতবড় নিষ্ঠুরের কাজ করলেন তা জানেন না ; আপনি কেন আমার এমন শত্রু হলেন ?

মেয়েটি কাঁদিতে লাগিল। ললিতের মনে পড়িল—বিবাহের কিছু দিন পরে তাহার সহিত ঝগড়া করিয়া একদিন অশোকা শান্তির প্রত্যাশায় তাহারই বুকে মাথা রাখিয়া এমনই কাঁদিয়াছিল। বেদনার সেই মূর্ত্তি। কি অল্প আঘাতেই ইহারা এমন ভাঙিয়া পড়ে !

সে বলিল, কি হয়েছে আপনার ? জীবনটাকে নষ্ট করতে চাইছেন কেন ? কিছুদিন অপেক্ষা ক'রে দেখুন—হয়তো আজকের এই অসহ্য দুঃখ আপনার আর থাকবে না, মিছিমিছি আত্মহত্যা ক'রে দুঃখের হাত থেকে রেহাই পেতে চাওয়া দুর্ব্বলের লক্ষণ ; দুঃখ-কষ্টকে এত ভয় কেন ?

মেয়েটি কথা বলিল না, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ললিত বলিল, দুঃখ জিনিসটা বরাবর থাকে না, ওটা আসে আবার চ'লে যায়। একটু সহ্য ক'রে থাকুন, আমার বিশ্বাস আপনার যত বড় দুঃখই হোক, বেশি দিন থাকবে না।

মেয়েটি ব্যথিত দৃষ্টি লইয়া ললিতের দিকে চাহিল ; তাহার মুখের অস্বাভাবিক ভাবটা কাটিয়া গিয়াছে ; কিন্তু মুখ ছাইয়ের মত সাদা। সে ধীরে ধীরে বলিল, আমি জানি, আমি ভীরু, কিন্তু যন্ত্রণাও বড় কম পাই নি।

শারীরিক যন্ত্রণা, না মানসিক ? আপনার স্বামী আপনাকে ভালবাসেন না, এই তো কষ্ট ?

মেয়েটি প্রায় আত্মগতভাবেই বলিল, ভালবাসেন, খুবই ভালবাসেন, কিন্তু সে আমাকে ছিন্নভিন্ন ক'রে। তিনি আমার কাছে আসেন বাইরের

সব অশুচি গায়ে মেখে; আমি সহ্য করতে পারি না। নিজেকে বড্ড অপমানিত মনে হয়।

ললিত স্তব্ধ হইয়া গেল। ইহার উত্তরে সে কি কথা বলিবে? জীবন্ত প্রাণীকে একেবারে মারিয়া না ফেলিলে যেমন তাহার হৃদ্‌স্পন্দন বন্ধ করা যায় না—এই অশুচির ব্যথা ভুলাইবার জন্য সে আর কিছু বলিতে পারে না। মেয়েটি কষ্টে আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া বলিল, এইসব দেখে শুনে আমার জীবনে ধিক্কার এসেছে—আমি আর পারি না। বুকের উপর ন্যস্ত হাত দুইখানি দারুণ অবসন্নতায় তাহার পাশে ঝুলিয়া পড়িল। সে যেন সহসা বাস্তব জগতে ফিরিয়া আসিল। ভীত চকিত ভাবে বলিল, আমি কি বলছিলাম? আপনি কে?

ললিত তাহার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া শান্তভাবে বলিল, ব্যস্ত হবেন না। আপনিই তো বললেন, আমি আপনার শত্রু; ধরুন তাই। তবে আপনার জীবনটাকেও শত্রু ভাববেন না—এখন হয়তো জীবনকে ঘৃণা করছেন কিন্তু কালই আবার জীবনটাকে ভাল লাগবে। দুঃখকষ্ট তো আছেই।

বিহ্বলভাবে ললিতের দিকে চাহিয়া মেয়েটি পূর্ব্বাপর ঘটনাটি ভাবিতে লাগিল; সবটা মনে পড়িল না। ললিতের সরল কথাবার্ত্তায় ও সহজ প্রশ্নোত্তরে সে মন্ত্রমুগ্ধের মত আবার ধীরে ধীরে নিজের মনের কথা উদ্‌ঘাটিত করিতে লাগিল। বলিল, বেঁচে থাকতে আর চাই না—এই ভাঙা বুক আর পীড়িত মন নিয়ে।

আচ্ছা, আপনার স্বামীকে কেন একেবারে শেষ দেখতে দেন না; ঘা খেলেই তিনি হয়তো ফিরবেন।

না না, তার চাইতে মৃত্যু ভাল। বেঁচে থেকে একেবারে তাঁকে ছাড়তে পারব না।

আচ্ছা, আপনার কি স্বামী ছাড়া অবলম্বন আর নেই, ছেলেপিলে ?

না।

বড় কোন কাজ, কি গান-টান কিছু ?

ছিল, কিন্তু স্বামী সেসব পছন্দ করতেন না ; তিনিও আমাকে সম্পূর্ণ নিজের ক'রে আগলে রাখতে চেয়েছিলেন।

স্বামীর কথায় এইসব ছেড়ে দিয়েই আপনি আত্মহত্যার পথ ধরছেন—মেয়েদেরও নিজস্ব একটা অবলম্বন চাই—স্বামী-সন্তানের অধিকারের বাইরে—

অশোকার কথা মনে হইতেই তাহার বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। আপনি বুঝি গান-বাজনা পছন্দ করতেন ?

হ্যাঁ। আমাকে দয়া ক'রে যেতে দিন ; আমি বড্ড ক্লান্ত।

ললিত সরিয়া আসিল। সেও তো ক্লান্ত। সে শুধু বলিল, আপনি একেবারে না ম'রেও হয়তো এখন শান্তি পেতে পারেন। নিজেকে অত সহজে ধরা দেবেন না ; একটু দুষ্প্রাপ্য ক'রে তুলুন নিজকে। সব ঠিক হয়ে যাবে। মরলেই তো সব গেল। আজকের এই মেঘ কাটতেও পারে। নিজের মধ্যেই বেঁচে থাকার অবলম্বন খুঁজে পাবেন, শুধু নিজেকে একটু অবকাশ দিন।

এতক্ষণে মেয়েটি চারিদিকে চাহিবার অবসর পাইল।—আমি কোথায় আছি ভুলে গেছলুম। আপনাদের বুঝি ওই ছাদ ?

হ্যাঁ, ওই ছাদের কোণে আমার আকাশ-বাসর।

নীচের ঘরের বাঁশীর স্থর ও পায়ের তাল কানে আসিতেই মেয়েটির ভাবান্তর হইল। বহুকষ্টে আপনাকে সংযত করিয়া সে বলিল, ওই শুনুন।

এ তো সহ্য করতেই হবে।

আচ্ছা, আপনি ছাদে ব'সে কি করেন ?

আমি পৃথিবীর সুখ-দুঃখের আশা-আনন্দের কথা ভাবি আর সেই ভাবনাগুলো লিখে রাখি। দুঃখকে কাটিয়ে ওঠার এ এক সহজ উপায়। পৃথিবীর সবাইকে নিয়ে আমার কারবার আমি, আপনি, আমার অন্ধ স্ত্রী—

আহা, আপনার স্ত্রী অন্ধ।

শুধু অন্ধ নয়, কিছু শুনতেও পায় না, বলতেও পারে না।

আপনি লেখক বুঝি ?

হ্যাঁ।

আচ্ছা, বেঁচে থাকতে আপনার বেশ ভাল লাগছে ?

খুব, মরতে চাইব কোন্ দুঃখে ?

আমি যখন গান শিখতুম, আমারও তাই মনে হ'ত, আমি বেশ ভাল গাইতে পারতুম—এস্‌রাজও বাজাতে পারতুম।

মেয়েটি কপালে হাত রাখিল, বলিল, আমি নীচে যাই ; আমার ভারী লজ্জা করছে।"

ভাল লক্ষণ বটে।—বলিয়া ললিত সিঁড়ির দরজা পর্য্যন্ত মেয়েটিকে আগাইয়া দিল।—আর কখনও ওপরে আসবেন না। যদি কখনও এস্‌রাজটিকে সঙ্গে আনতে পারেন, আসবেন। আমার এই নিভৃত আকাশ-বাসরে আজকের মত কোনও অনাচার আমি সহ্য করব না।

মেয়েটি ললিতের এত সব রুদ্ধ মনের কথা শুনিয়া কি বুঝিল জানি না। বিবর্ণ মুখের কোণে তাহার একটু মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল—বুঝি তাহা প্রাণ ফিরিয়া পাইবার আনন্দের বিকাশ। সে নীচে চলিয়া গেল।

ললিত নিজের উচ্ছ্বাসে লজ্জিত হইল, ভাবিল, যাই হোক মেয়েটি আমাকে আর মুখ দেখাইবে না। কিন্তু সে ইহা ভাবিয়া সুখী হইল না। সেও ক্লান্তমনে শ্রান্তদেহে আপনার নীড়ে ফিরিয়া আসিল।

সে অনেকক্ষণ ঠাণ্ডা বাতাসে পায়চারি করিল। ধোঁয়ার ভিতর দিয়া পথের আলোগুলি মিটিমিটি জ্বলিতেছে—হতাশার মধ্যে ক্ষীণ আশার মত। বাঁশীর সুর তখনও থামে নাই। কাগজপত্রগুলি গুছাইয়া লইয়া সে মনে মনে বলিল, 'সব ঝুট হ্যায়'—সে শুধু শান্তিতে থাকিতে চায়। কিন্তু যাহার উপর এই অভিমান, সেও তখন অভিমানে মনের কপাট রুদ্ধ করিয়াছে; ভুল দিয়া ভুলের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে।

ললিত সন্তর্পণে নামিয়া আসিল।

দিন পনরো পরে সন্ধ্যার খানিক আগে ললিত তাহার উপন্যাসের উপসংহার লিখিতে ব্যস্ত ছিল; হঠাৎ এস্‌রাজের মৃদুগুঞ্জন-ধ্বনি শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল। নিশ্চয়ই সে। লেখা বন্ধ করিয়া ললিত উঠিয়া পড়িল। কিনারায় আসিয়া দেখিল—সেই বটে। ছাদের এককোণে বসিয়া আপন মনে এস্‌রাজের তারে ঝঙ্কার দিতেছে। ললিতের মন খুশিতে ভরিয়া উঠিল। সে নিঃশব্দে শুনিতে লাগিল। তরলধারার মত সুর যেন গলিয়া পড়িতেছে। রাগিণীটি শেষ হইতেই মেয়েটি উপরের দিকে চাহিয়াই লজ্জায় মুখ নামাইল। এস্‌রাজটি ছাদের উপর রাখিয়া আলিশার ধারে আসিয়া ললিতকে ছোট্ট একটি নমস্কার করিয়া বলিল, আমি আবার বাজাতে চেষ্টা করছি, কিন্তু হাত চলে না। অনেক দিনের অনভ্যাস—

ললিত বলিল, কেন, আপনি তো চমৎকার বাজাচ্ছিলেন!

চমৎকার, না ছাই! বা রে, আপনার এখানে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করলে তো চলবে না—লিখুন গিয়ে; আমি আপনার কাজে বাধা দিচ্ছি দেখছি।

অপরিচিতার এই আগ্রহ দেখিয়া ললিত একটু হাসিল, কিন্তু তাহার চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। খুশোকার স্মৃতি? সে বলিল, না, না, আপনার ভারী ক্ষমতা, আপনি বাধা দেবেন আমাকে? এ তো আর ঘরের

অন্ধকার নয়— এখানে অসীম বিস্তার, প্রচুর অবকাশ। আজকের দিনটি ভারী সুন্দর, না? তেমন শীত নেই।

তা হোক, আমি নীচে যাচ্ছি, আপনার কাজের ক্ষতি হতে দেব না। আপনার লেখা কেমন চলছে?

চমৎকার। বইখানা ভাল ওতরাবে বোধ হয়।

নিশ্চয়ই, ভাল হতেই হবে—বলিয়া মেয়েটি এস্‌রাজের কাছে গিয়া সেটি কোলে লইয়া বসিল। ললিত ফিরিয়া আসিয়া আবার লিখিতে বসিল। কিন্তু তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। ফিরিয়া ফিরিয়া এস্‌রাজের ঝঙ্কার আর মেয়েটির শান্ত চোখ দুইটি ললিতের মনে পড়িতে লাগিল।—অশোকার চাইতে বড়, না ছোট? বড়ই হবে; সংসারের দুঃখ-যন্ত্রণাতেই তো ওর বয়সে ঢের বেড়ে গেছে। অশোকা তো দুঃখ কাকে বলে এখনও জানে না। সে যে কিশোরী মেয়েটির মতই চঞ্চল। যাক্‌গে ছাই, এসব ভাবি কেন?—ললিত বেড়াইতে লাগিল।

এমনই করিয়া অনন্ত আকাশের কোলে দুইটি নীরব সাধকের সাধনা চলিতে লাগিল। ক্বচিৎ কখনও দেখাসাক্ষাৎ হয়—এস্‌রাজের ঝঙ্কারে তাহার আভাস পাওয়া যায়; কথাবার্ত্তা বড়-একটা হয় না। ললিত যখন উচ্ছ্বসিত মন লইয়া কথা বলিতে আসে, মেয়েটি তখন প্রায়ই নীচে নামিয়া যায়।

একদিন মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল, কই, আপনার স্ত্রী তো কোনদিন ওপরে আসেন না!

ললিতের মুখের উপর হাসি ও অশ্রু এক সঙ্গে খেলিয়া গেল। সে বলিল, না, ও জানে না—আমি এখানে আসি।

আপনি লুকিয়ে আসেন বুঝি? ভারী অন্যায় আপনার। আচ্ছা, আপনার স্ত্রী, অন্ধ বোবা কালা—সত্যি তো?

ললিত চুপ করিয়া রহিল। কি বলিবে সে?

বলুন না?

আমার সম্বন্ধে ও তিনই—আমি তার অপদার্থ স্বামী; অনেক আশায় ও আমায় বিয়ে করেছিল; আমি সব আশায় ছাই দিয়েছি।

ও বুঝেছি, আমি কিন্তু অপদার্থ লোককে বিয়ে করলে সুখী হতে পারতুম। জীবন-যুদ্ধে জয়ী যারা তাদের কথা আপনার স্ত্রী যদি জানতেন! আচ্ছা, আপনার এ বইটার যদি খুব কাটতি হয়, তা হ'লে?

ললিতকে সে যেন কষাঘাত করিল; সে মুখ ফিরাইয়া দূরে চাহিয়া রহিল।

মেয়েটি বলিল, বুঝেছি, আপনি এত দাম দিয়ে কেনা সাফল্যের বিনিময়ে তাকে আর ফিরে পেতে চান না। ছি! আপনি কি নিষ্ঠুর!

দুই জনে বিষণ্ণ মনে স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া গেল।

ললিতের উপন্যাসখানি শেষ হইল। কিন্তু যতটা আনন্দ সে পাইবে কল্পনা করিয়াছিল, তার সামান্য অংশও পাইল না। সৃষ্টির মধ্যে হয়তো পরশপাথরের সন্ধান ছিল, কিন্তু সমাপ্তিতে তাহা যেন নুড়ি-মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। কেন এমন হইল—ভাবিতে গিয়া অশোকাকেই মনে পড়িয়া গেল।

সে আর একখানি উপন্যাস লিখিতে শুরু করিল।

প্রথম উপন্যাসখানি শেষ হইবার পর রাত্রে খাইবার সময় সে অশোকাকে তাহা জানাইল। অশোকা ক্ষুণ্ণ হইল; তাহার দাবি কি শুধু এইটুকু? বলিল, এ ক মাস তুমি খুবই খেটেছ দেখছি। তাহাকে আরও আঘাত দিবার জন্য ললিত বলিল, হ্যাঁ, খুবই খাটুনি হয়েছে বটে। অশোকাও খোঁটা দিয়া বলিল, লাইব্রেরিতে খুব শান্তিতে কাজ করতে পাও বুঝি?"

হ্যাঁ, সেখানে ভারী নিরিবিলি।

অশোকা গম্ভীরভাবে বলিল, বাড়িতেও তুমি খুব নিরিবিলিতে কাজ করতে পারতে। আর কেউ এখানে আসে না।

সে কি? মা, দিদি—এঁরা?

কেউ না, তাদের সঙ্গে ঝগড়া করেছি।

ঝগড়া! কেন?

ঝগড়া তোমাকে নিয়েই।—বলিয়াই অশোকা অন্য কথা পাড়িল। সেই অভিমান! ললিত জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি অশোকা? নির্লিপ্তভাবে অশোকা বলিল, সেকথা থাক—যা হবার তা তো হয়েই গেছে। হ্যাঁ, তোমার এই বইটা যদি ভাল চলে, আমাকে দার্জ্জিলিং নিয়ে যেতে হবে। এবার গৌরীদিরা যাবে।

ললিতের মন ভিজিয়া আসিয়াছিল; শেষের কথা শুনিয়া আবার সে কঠিন হইল। বুঝিল মিলনের চেষ্টা বৃথা; কোথায় যেন কি গোলমাল হইয়া গিয়াছে।

স্বামীর এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া অশোকাও বাঁকিয়া বসিল। পরস্পর আবার বহুদূরে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল।

দ্বিতীয় উপন্যাসের জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রমে ও অজানিত মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্যে ললিতের শরীর আবার ভাঙিতে শুরু হইয়াছে। সে প্রথম বইখানি লইয়া কোথায়ও গেল না। যে যশকে সে এত কাম্য ভাবিয়াছিল, হাতের কাছে তাহাকে পাইয়াও সে ছাড়িয়া দিতে দ্বিধা করিল না। কাজের জন্য প্রচুর নিভৃত অবকাশ, আলো ও হাওয়া ছাড়া আরও কিছু সে চায়, কিন্তু সে যাহা চায় তাহা তাহাকে কে দিবে? যে দিতে পারে, সে নিজের দোষে ও ললিতের হতাদরে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে। ললিতের এমন দুর্ব্বল শরীর সে দেখিয়াও দেখিল না।

সেদিন ললিতের শরীর খুবই খারাপ ছিল, মনও ভাল ছিল না। কিসের প্রত্যাশায় মন্ত্রচালিতের ন্যায় সে অশোকার কাছে গিয়া দেখিল, সে

বাক্স ইত্যাদি গুছাইতেছে। কোথায়ও যাইবার আয়োজন। ললিতের মনের আবেগ পাহাড়ের গায়ে ঢেউয়ের মত ভাঙিয়া চুরিয়া ছড়াইয়া পড়িল। সে বিরক্তভাবে বলিল, কোথা যাওয়া হচ্ছে শুনি। অশোকা সহজ ভাবেই বলিল, দার্জ্জিলিং। গৌরীদি চিঠি দিয়েছে সেখানে যেতে।

বেশ! বলিয়া ললিত ঘরের বাহির হইয়া গেল। হায় রে যশ আর খ্যাতি! একটি আঘাতেই সমস্ত বিস্বাদ হইয়া গেল।

অশোকা চলিয়া গেল। ললিত ভাঙা শরীরে ছাদের কোণে আশ্রয় লইল; এবার কিন্তু নির্ভয়েই। বুড়ী ঝি মঙ্গলার মা উপরে গিয়া তাহার খাবার দিয়া আসে। সে বেশির ভাগ সময় ছাদেই কাটায়; কিন্তু কাজ আর বেশি অগ্রসর হয় না। সে নিঝুম হইয়া পড়িয়া থাকে।

কয়েক দিন হইতে পাশের বাড়ির মেয়েটিরও দেখা নাই। ললিতের দুর্ব্বল শরীর আরও দুর্ব্বল হইতে লাগিল। দ্বিতীয় উপন্যাসখানিও শেষ হইল; কিন্তু সুখ, শান্তি আসিল কই? মাঝে মাঝে সে ভাবে, বুঝি অশোকার দীর্ঘশ্বাসে তাহার সাধনা অভিশপ্ত হইয়াছে; কিন্তু পীড়া যে তাহার নিজেরই মনের মধ্যে সেটুকু সে স্বীকার করে না। সে কোনও প্রকাশকের কাছে গেল না। উপন্যাস দুইখানি সযত্নে নিজের কাছে রাখিয়া দিল। কি হইবে প্রকাশ করিয়া?

তাহার আকাশ-বাসরের সঙ্গিনীটিকে একদিন দেখা গেল, বিবর্ণ শরীর লইয়া আলিশার উপরে হাত রাখিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া। ললিত তাহাকে কাছে ডাকিল। স্টুডিওতে আলো ছিল না। মেয়েটিও এস্‌রাজ লইয়া আসে নাই। ললিতের ভয় হইল। আবার বুঝি সেদিনের মত—

বলিল, আপনার এস্‌রাজ কই?

মেয়েটি মৃদু হাসিয়া বলিল, ভয় নেই। আমার স্বামীর বড় বিপদ—উদ্ধারের বুঝি কোনও উপায় নেই।

ললিত চকিত হইয়া উঠিল। বলিল, ব্যাপার কি? সঙ্গিনীর কথা শুনিয়া বুঝিল,—আর্টিস্টটি কিছুকাল যাবৎ আয়ের অধিক ব্যয় করিতেছিল —আপনার খেয়াল পরিতৃপ্ত করিবার জন্য। কোথা হইতে হ্যাণ্ডনোট দিয়া টাকা ধার করিয়াছে। শোধ দিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। তাহার নামে ডিক্রীজারী হইয়াছে। স্ত্রীর গহনা-পত্র যাহা ছিল ইতিপূর্ব্বেই বন্ধক পড়িয়াছে— ছবিও সব বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। সুতরাং পাওনাদার হয় জিনিসপত্র সব ক্রোক করিবে—কিংবা তাহাকে হাজতে লইয়া যাইবে।

মেয়েটির চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইতে লাগিল, ললিতের জীর্ণ বুকের অন্তস্তল হইতে একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইল। হায় রে, ওই স্বামী, তাহার জন্যও কান্না! আর অশোকা?

সে বলিল, দু-একদিন পরে আমার সঙ্গে দেখা করবেন—দেখি যদি নূতন বই দুটো দিয়ে কিছু পাই।

মেয়েটি আবেগকম্পিত স্বরে বলিয়া উঠিল, না না, সে কিছুতেই হবে না। আপনার বুকের রক্ত দিয়ে গড়া জিনিস এমন ক'রে আমি নষ্ট করতে দেব না। তাড়াতাড়িতে হয়তো কিছুই দাম পাবেন না। আপনার এই রোগা শরীরে সেটা সইবে না। আর আপনার স্ত্রীরও তো একটা দাবি আছে। আমিই বা কে যে, আমার জন্যে এত করবেন?"

আমার আর কে আছে, যার জন্যে আমি কিছু করতে পারি? এই সামান্য সুখটুকু থেকে আমায় বঞ্চিত করবেন না। কাল পরশু একবার খবর নেবেন।—ললিত আর দাঁড়াইতে পারিতেছিল না, বলিল, আপনি যান।

ডেক-চেয়ারটিতে বসিয়া ললিত তাহার বুক-নিংড়ানো ধন দুইটি নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতে লাগিল। পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে এক জায়গায় চোখে পড়িল—

"মানুষের ব্যথার ইতিহাসই চিরন্তন ইতিহাস নয়। মানুষ জন্ম হইতে

মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রতিনিয়ত বাহিরের ও ভিতরের দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হইবে, জীবনে বিশ্বাস হারাইবে ; কিন্তু একদা রৌদ্রালোকে কুয়াশারই মত সমস্ত ব্যথা, সমস্ত দৈন্য তাহার নিঃশেষে মুছিয়া যাইবে। সেই শুভ মুহূর্ত্তের জন্য চিরন্তন মানব প্রতীক্ষা করিয়া আছে। হয়তো এ জীবনে সে মুহূর্ত্ত না আসিতে পারে। পথিক মানবের পথ চলাই পথের সমাপ্তি নহে। সঙ্কীর্ণ মন দিনে দিনে প্রসার লাভ করিতেছে। একদিন সে নিঃশেষে সম্পূর্ণ অপরিচিতের হাতে আপনার সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিয়া বিগত দিনের দুঃখযন্ত্রণা ভুলিয়া ভাবিবে, পথের সন্ধান মিলিয়াছে।

তাহারও বুঝি পথের সন্ধান মিলিবে।

ললিত স্বস্থির নিশ্বাস ফেলিয়া মঙ্গলাকে ডাকিয়া একটি বিখ্যাত পাবলিশার্সের নামে চিঠি দিয়া তাহার প্রথম উপন্যাসখানি পাঠাইয়া দিল। চিঠিতে লিখিল—বইখানি পছন্দ হইলে তাহার প্রথম সংস্করণের জন্য যে কিছু মূল্য নির্দ্ধারণ করেন, তাহা যেন কল্যই তাহার ঠিকানায় পাঠাইয়া দেন।

মঙ্গলা ফিরিয়া আসিল। ললিত কম্পিত চিত্ত লইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। যদি না মনোনীত হয়? না, তাহার এত পরিশ্রমের ফল কখনই ব্যর্থ হইবে না।

পরদিন সুসংবাদ আসিল। বইখানি পছন্দ হইয়াছে। প্রকাশক প্রথম সংস্করণের জন্য পাঁচ শত টাকার চেক পাঠাইয়াছেন। আকাঙ্ক্ষিত জয়শ্রী তাহার মুখে একটু শীর্ণ হাসি টানিয়া আনিল মাত্র।

পরদিন সকালবেলায় মেয়েটি আসিল। আসন্ন ঝড়ের ভয়ে মুখ বিবর্ণ ; শরীর কাঁপিতেছে। আদালতের লোক আসিয়াছে। ললিত হাত বাড়াইয়া চেকখানি তাহার হাতে দিল। সে ছলছল চোখে ললিতের হাত দুইটি চাপিয়া ধরিল মাত্র। কোন কথাই বলিতে পারিল না। তারপর দ্রুত নীচে নামিয়া গেল।

ললিতের লেখা সার্থক হইল। ইহার চেয়ে অধিক কিছু সে প্রত্যাশা করে নাই। ভগবান তাহার পরিশ্রমের অযাচিত মূল্য দিয়াছেন। তাহার চোখ দিয়া দরদর ধারে জল ঝরিতে লাগিল। অশোকার কথা মনে পড়িল। আজ আর তাহার বিরুদ্ধে মনে কোনও গ্লানি নাই—শাশুড়ীর বিরুদ্ধেও না।

দিন কয়েক পরে তাহার আকাশ-বাসরের সঙ্গিনী আসিল স্বামীকে সঙ্গে করিয়া। স্বামীটি বোধ হয় শোধরাইয়াছে। মেয়েটি বলিল, ধন্যবাদ জানিয়ে আপনার অপমান করব না। আমার স্বামী আপনার ঋণ স্বীকার করতে এসেছেন। সামর্থ্য হ'লেই শোধ দেবেন।

আর্টিস্ট বলিল, আমি আমার স্ত্রীর কাছে সব শুনেছি ; আপনি মহৎ লোক। আজ আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমার সমস্ত গ্লানি কাটিয়ে উঠতে পারি।

ললিত হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে গেল, কিন্তু তাহার রুগ্ন শরীর এতটা উত্তেজনা সহ্য করিতে পারিল না। সে সহসা চোখে অন্ধকার দেখিল ও মূর্চ্ছাহতের মত বসিয়া পড়িল। স্বামীস্ত্রী দুইজনে একসঙ্গে চমকিয়া উঠিয়া ললিতের ছাদে উঠিয়া আসিল। তাহাকে ধরাধরি করিয়া ডেক-চেয়ারে বসানো হইল। দুইজনেই সভয়ে দেখিল, ললিতের গা বেশ গরম। ললিত বলিল, ভয় নেই ; একটু অবসন্ন হয়ে পড়েছিলুম। এখন সেরে উঠেছি। মেয়েটি শুনিল না, তাহার স্বামীকে ঠেলিয়া ডাক্তার আনিতে পাঠাইল।

ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া শঙ্কিত হইলেন—যক্ষ্মা। স্বামীস্ত্রী দুইজনেই শিহরিয়া উঠিল। ললিতও শুনিল, কিন্তু কিছু বলিল না। তাহার ঠোঁটের কোণে সেই মৃদু হাসিটুকু ফুটিয়া রহিল।

দুর্ব্বল শরীরে সে কঠিন পরিশ্রম করিয়াছে, ঠাণ্ডা লাগাইয়াছে অথচ পুষ্টিকর আহার পায় নাই, স্ত্রীর যত্ন পাইতে পারিত, কিন্তু হতভাগ্যের

ভাগ্যে তাহাও জোটে নাই। শরীর আর কতদিন টিকিতে পারে? ডাক্তার বলিলেন, আর বেশিদিন নয়। ওঁকে নীচে নিয়ে যান আর ওঁর বাড়ির লোকদের খবর দিন।

ললিত বাঁকিয়া বসিল—জীবনে যাহাকে চাহিয়াও পায় নাই, মৃত্যুতেও তাহাকে কাছে চাহিবে না। বলিল, না, অশোকাকে খবর দেবেন না—এইটি মাত্র আমার একান্ত অনুরোধ। বরঞ্চ পিসীমা আসুন। আর নীচের ঘরে সে মরিবে না। এই আকাশ-বাসরেই তাহার জীবন শেষ হইয়া যাক—এইখানেই টিন দিয়া কিংবা টালি দিয়া উপরের একটা আচ্ছাদন তুলিয়া দিলেই হইবে; অন্ধকার ঘরে মৃত্যুকে সে বরণ করিতে পারিবে না।

টালি দিয়া ঘর তৈয়ারি হইল। পিসীমা আসিলেন। অশোকা দার্জ্জিলিঙে হাওয়া খাইতে লাগিল, এসবের কিছুই জানিল না।

আর্টিস্ট সকাল সন্ধ্যা আসে। মেয়েটি তো দিনরাত্রি ললিতের সেবায় লাগিয়া রহিল। পিসীমা চিরদিন নির্ব্বাক; আজিও নির্ব্বাকভাবে হতভাগ্য ভ্রাতুষ্পুত্রের শিয়রে বসিয়া থাকেন। ডাক্তার আসা বন্ধ হইল। ললিত গভীর পরিতৃপ্তির সহিত মৃত্যুকে বরণ করিতে প্রস্তুত হইল। বাহির হইতে দেখাইত যেন তাহার মনে কোন ক্ষোভ নাই, কোন দুঃখ নাই, কিন্তু তাহার আকাশ-বাসরের সঙ্গিনী তাহার মর্ম্মকোণের ব্যথার কাহিনী জানিত। জানিত, তাহার বেদনা কত নিবিড়; অশোকার জন্য তাহার দুঃখ হইত। হায় হতভাগিনী, রত্ন চিনিল না। তাহার চোখ জলে ভরিয়া আসিত। ললিত হাসিত। সে হাসি কান্নায় ভরা।

ললিতের সাধের উপন্যাস 'করুণা' বাজারে বাহির হইল। কাগজে অযাচিত প্রশংসা—হুহু করিয়া বই কাটিতে লাগিল। ললিতমোহনের খ্যাতি সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। লোকে বলিতে লাগিল, 'করুণা' সাহিত্যে যুগান্তর আনিয়াছে—লেখক অমর হইয়া থাকিবে।

প্রকাশক 'করুণা'র পরের সংস্করণের জন্য ও লেখকের অন্য কোন বই লেখা থাকিলে তাহার জন্য কনট্রাক্ট করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। অসম্ভব মূল্য দিতেও তিনি পিছ্‌পা নহেন। তিনি যেদিন ললিতের কাছে গেলেন, তখন যমের সঙ্গে তাহার কনট্রাক্ট হইয়া গিয়াছে।

দার্জ্জিলিঙে অশোকার কানে স্বামীর বিপুল খ্যাতির বার্ত্তা পৌঁছিল। স্বামী যে খ্যাতি-নিন্দার বাহিরে যাইতে বসিয়াছেন, সে খবরটুকু পৌঁছিল না। মা দার্জ্জিলিঙে ছিলেন। মা বলিলেন, বেবী, তোর কপাল ফিরিয়াছে। আমি বরাবরই জানি, ললিত একটা কিছু করিবেই করিবে; তাহার মত খাতির আর কে পাইয়াছে! অশোকা চুপ করিয়া রহিল। মা বলিলেন, বেবী চল্, কলকাতায় যাই, এসময় তোর তার কাছে থাকা দরকার। অনেক টাকা হাতে আসবে—হয়তো সব বাজে খরচ ক'রে বসবে।"

খরচের ভয়ে বা অর্থলোভে নহে, অন্য কারণে অশোকা ললিতের কাছে যাইতে চায়। নিজের সঙ্গে যুদ্ধে সে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে। তাহাদের এই ঝগড়ার জন্য সে যতবারই স্বামীকে দোষী করিতে চাহিয়াছে ততবারই সে স্বামীর দোষ খুঁজিয়া পায় নাই—নিজের প্রচণ্ড অভিমান ও নীচতাকেই তাহার কারণ বলিয়া মনে হইয়াছে। অভিমান তখনও পূরামাত্রায় আছে, কিন্তু ক্ষমা চাহিবার জন্য মন ব্যাকুল,—সে আর পারে না এই অকারণ দ্বন্দ্বকে জীয়াইয়া রাখিতে। হয়তো এখনও সময় আছে—শুধু তাহার নিরীহ স্বামীকে লইয়া আবার সে সুখের স্বর্গ গড়িতে পারে; মা বোন নাই-ই থাকিল।

সেদিন সকাল হইতেই আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন—গাঢ় কৃষ্ণ মেঘের প্রলেপে নীলাকাশে যবনিকা পড়িয়াছে। ললিতের আকাশ-বাসর কাল-বৈশাখীর তাণ্ডবলীলার প্রতীক্ষা করিতেছে। ললিত মাঝে মাঝে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছিল ও প্রলাপ বকিতেছিল—খালি অশোকার আর আকাশ-

বাসরের কথা। ডাক্তার বলিয়াছেন—সেদিন কাটিবে না। মাঝে মাঝে তাহার জ্ঞান সম্পূর্ণ ফিরিয়া আসিতেছিল। মেঘভরা আকাশের দিকে চাহিয়া তখন সে প্রবল বর্ষণ কামনা করিতেছিল। সে পিসীমার একহাত একহাতে ধরিয়া ছিল, অন্য হাত তাহার দুঃখদিনের সঙ্গিনীর হাতের মুঠার মধ্যে ছিল। মেয়েটির চোখের জল বাগ মানিতেছিল না।

ললিত শিয়রে হাত দিয়া কি যেন খুঁজিতে লাগিল। বালিশের নীচে তাহার দ্বিতীয় উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি ছিল, পিসীমা তাহা বাহির করিয়া ললিতের হাতে দিলেন। ললিত পরম আগ্রহে সেটি হাতে লইয়া নীরবে কিছুক্ষণ তাহা দেখিল। তাহার চক্ষু উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে তাহার সঙ্গিনীর হাতে সেটি তুলিয়া দিয়া বলিল, দুর্দ্দিনের বন্ধুর এই শেষ-দান—আর কিছুই আমার নেই। মেয়েটি ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আকাশ ভাঙিয়া বৃষ্টি নামিল। অবিরল জলধারে চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। অদূরে নারিকেলশাখাগুলি বায়ু-তাড়নে হু হু করিয়া উঠিতেছিল। যেন কাহার ব্যথিত দীর্ঘশ্বাস। ছাদের টালির উপর বৃষ্টিপাতের শব্দ ললিত কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল—যেন কাহার অবিশ্রাম পদশব্দ। ললিত ব্যাকুল আগ্রহে উঠিয়া বসিতে গিয়া সংজ্ঞাশূন্য হইল।

প্রলাপের ঘোরে সে বলিয়া উঠিল, "অশোকা, এস, এস—দেখ আমার আকাশ-বাসর কেমন নিরিবিলি, কই, তুমি এলে না? বেশ।"

সে আবার নিঝুম স্তব্ধ হইয়া পড়িল। সে স্তব্ধতা আর ভাঙিল না। চিরন্তন মানবের চিরন্তন ইতিহাস সমাপ্ত হইল।

কথায় এবং কাজে

বাঁকুড়া কলেজ হইতে ইণ্টারমিডিয়েট পাস করার পর বহুকাল আর বাঁকুড়ামুখী হই নাই। যদিও সেটা ন-মামার কার্য্যস্থল ছিল, তবু নানা গোলমালে সেখানে যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই। এম-এ পাস করার পর দীর্ঘ অবসর পাইলাম। পুরানো ছাত্রত্বের দোহাই দিয়া যদি একটা প্রফেসারি জুটাইতে পারি, এই ভরসায় প্রায় পাঁচ বৎসর পরে মাতুলালয়ে দর্শন দিলাম। এই পাঁচ বৎসরেই বাঁকুড়ার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পূর্ব্বেকার পরিচিত মুখগুলি অধিকাংশই আর দেখিলাম না। শহরের অনেক দোকানেই আগে দেনাপাওনার কারবার ছিল, তাহারা খাতির করিত। অনেক আশা করিয়া প্রাচীন স্থানগুলিতে ঢুঁ মারিতে গিয়া প্রায় সর্ব্বত্রই আহত হইয়া ফিরিলাম। মনটা ভারী দমিয়া গেল। হায় রে, ছাত্রাবস্থায় এই বাঁকুড়া শহরেরই বুকের উপর কত নৃত্যই করিয়া গিয়াছি! মামার বাড়ি বাঁকুড়ায় থাকা সত্ত্বেও বাবা আমাকে লেখাপড়ায় অধিক মনোযোগী করিবার আকাঙ্ক্ষায় কলেজ-সংলগ্ন হোস্টেলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। সেই হোস্টেলে ফার্স্ট ইয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া ফোর্থ ইয়ার পর্য্যন্ত প্রায় শতখানেক ছেলে বসবাস করিত। প্রথম হইতেই হোস্টেলে মোড়ল সাজিয়া—বেশ ছোটখাট একটি দল গঠন করিয়াছিলাম। কোন কোন দিন বিকালে সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া শহরের রাস্তায় বাহির হইতাম; তখন লোকে হাঁ করিয়া খানিকক্ষণ চাহিয়া দেখিত। একবার ভাদুপূজা উপলক্ষে একটা মেলায় গিয়া একদল পুলিসকেই ঠেঙাইয়াছিলাম। আর আজ সব নূতন মুখ, আলাদা মনোভাব! সাধে কি পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, 'সময় কাহারও অপেক্ষা করে না'!

গন্ধেশ্বরী ও দ্বারকেশ্বর নদী দুইটি বাঁকুড়াকে দুই দিক হইতে বেড়িয়াছে। সেই নদী দুইটির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের কথা আজিও ভুলিতে পারি নাই। পার্ব্বত্য নদী, বর্ষার সময় ঠেলিয়া ঠুলিয়া কোমর অবধি জল হয়, তারপর সেই বানের ঘোলাটে জল সরিয়া গিয়া নদীর বুকে একটা স্বচ্ছ জলের আস্তরণ পড়িয়া থাকে। পায়ের পাতা অবধি সব জায়গায় ডোবে না; কিন্তু তবু সেই ধবধবে বালির উপর ক্ষীণ জলের রেখা যখন তপ্ত সূর্য্যে ঝলকিয়া উঠে, তখন কি যে এক অপূর্ব্ব স্বপ্নের সৃষ্টি হয়, বলিয়া তাহা বুঝাইতে পারিব না। গন্ধেশ্বরী আর দ্বারকেশ্বর দুই নদীর দুই ধরনের সৌন্দর্য্য। দ্বারকেশ্বর শহর হইতে একটু দূরে, রেল-লাইনের ওপারে। সেখানে লোকজনের মোটে ভিড় নাই—দিনের সব সময়েই সেখানে একটা নীরব শান্তি বিরাজ করিত। বিস্তীর্ণ নদী-বুক—মাঝে মাঝে নদীর বুক ভেদ করিয়া জীবন্ত পাথর মাথা খাড়া করিয়া উঠিয়াছে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে সেই পাথরেরই একটায় গিয়া সকলে বসিতাম। নদীর বুক রাঙা হইয়া আসিত, অন্ধকার ধীরে ধীরে নদীর দুই পারে কালো ছায়া বিছাইয়া দিত—আমরা সমস্ত বাস্তব বিস্মৃত হইয়া, কোন এক কল্পলোকে যেন বিচরণ করিতাম। বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে যখন উন্মত্ত কলরোল করিতে করিতে বানের জল নীচে নামিয়া আসিত, দূরে মেঘের ডাকের মত গুরু গুরু গর্জ্জন শুনিতাম, তারপর জনতার ভিড়ের মত কোলাহল করিতে করিতে সেই গেরুয়া জলস্রোত যখন দুই কূল ছাপাইয়া সম্মুখ দিয়া ছুটিয়া যাইত, তখন আর নিজেদের ধরিয়া রাখিতে পারিতাম না। জামা খুলিয়া দল বাঁধিয়া সেই স্রোতে গা ভাসাইয়া অধীর আনন্দে ভাসিয়া চলিতাম। আমাদের মধ্যে যাহারা জলকে ডরাইত, তাহারা আমাদের জামা কাঁধে করিয়া পাড় ধরিয়া ছুটিত; দুই পাশে অনেক লোক আমাদের এই ক্ষ্যাপামি দেখিয়া খুশি হইয়া উঠিত।

গন্ধেশ্বরীর ছিল অন্য রূপ; সে যেন আমাদেরই বাড়ির পুকুর ঘাট,

শহরের বুকের উপর দিয়া শ্রান্তগতিতে সে চলিয়াছে—লোকের ভিড়ে গন্ধেশ্বরী যেন সর্ব্বদা গিজগিজ করিত। দিনের যে প্রহরেই সেখানে গিয়াছি, দেখিয়াছি লোকে বালি খুঁড়িয়া জলের গভীরতা বাড়াইয়া তাহার মধ্যে গলা ডুবাইয়া স্নান করিতেছে। আশে পাশে যতদূর দৃষ্টি যায়, দেখিতাম, মেয়েরা সব জলের ধারে বালি খুঁড়িয়া চোঁয়ান জল কলসীর কাণাভাঙ্গা দিয়া কলসীতে ভরিতেছে। পৌষ-সংক্রান্তির দিন ভোরে গন্ধেশ্বরীর চেহারা ফিরিয়া যাইত: অবিশ্রাম জনস্রোত স্রোতহীন জলধারায় কোনো রকমে গা ভিজাইয়া অবগাহন-স্নানের পুণ্য সঞ্চয় করিত। সম্ভবত সেদিন শহরের কোনো লোকই গন্ধেশ্বরীতে স্নান না করিয়া ছাড়িত না।

আজ পাঁচ বৎসর পরে গন্ধেশ্বরী আর দ্বারকেশ্বর দুইটি পরিচিত বন্ধুকেই দর্শন দিয়া আসিলাম, কিন্তু চোখে তেমন রঙ ধরিল না। যৌবনের প্রথম হিড়িকে সবেমাত্র গৃহের বন্ধন ত্যাগ করিয়া বাহিরের বিশ্বকে যে সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত দেখিয়াছিলাম, আজ কে যেন অভিজ্ঞতার কালো পরদা দিয়া তাহা মন হইতে আড়াল করিয়া দিয়াছে। কলিকাতার ধূম্রকৃষ্ণ আকাশ আর বাধাগ্রস্ত দৃষ্টিই কেমন যেন অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। মনের এই বিকারে দুঃখ হইল; কিন্তু এখন আর উপায় ছিল না। কোন্ অজানা মুহূর্ত্তে পরশ-পাথর কুড়াইয়া একবার চক্ষে বুলাইয়া সোনার স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, আজ বুঝিতে পারিলাম, অনাদরে অবহেলায় চোখ বুজিয়া পথের মাঝে কখন তাহা ফেলিয়া দিয়াছি, সেটিকে খুঁজিয়া পাইবার অবসর ও ধৈর্য্য আর নাই।

পরদিন আমার পুরাতন কলেজে উদ্বেগ-আকুল চিত্তে প্রবেশ করিয়া বিমর্ষ হইলাম; যেখানে একদিন সর্ব্বত্রই পরিচিত সম্ভাষণ আর কৌতুক-কোলাহল শুনিতে পাইতাম, সেখানে সকলে কৌতূহলী হইয়া আমাকে লক্ষ্য করিতে লাগিল, তাহাদের দৃষ্টি আর মুখভঙ্গীর ভাবটা এইরূপ—তুমি আবার কে হে? বড় যে গটগট করিয়া আমাদের কলেজের বারান্দায়

পায়চারি করিতেছ! সেই কলেজ, সেই বোর্ড, সেই বেঞ্চ, সেই টেবিল, সেই-লাইব্রেরি, সেই অফিস ঘর, মাঠ, কাঁঠালগাছ, আর কৃষ্ণচূড়ার গাছ, সেই ফুটবল, ব্যাডমিণ্টন, টেনিস গ্রাউণ্ড, সেই প্লেন, সেই ডাইনামো হাউস, সব ঠিক তেমনই আছে, অথচ যেন কত অপরিচিত মনে হইল। অনেক দর্শনচিন্তা মনে উদিত হইল,—কেন এরূপ হয়? নূতন আর পুরাতনের ভিতর অভ্যাস ও কালের এই গভীর কালো যবনিকা কেন? কোনও উত্তর পাইলাম না। অফিস ঘরে কয়েকজন প্রাচীন প্রফেসার আর লাইব্রেরিয়ানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা ডাকিয়া আলাপ করিলেন; কিন্তু সে আলাপনের মধ্যে গাঢ়তা ছিল না—পূর্ব্বেকার পরিচয় কেমন করিয়া জানি না ফিকা হইয়া গিয়াছে। আমার উদ্দেশ্য দুই-একজনকে ব্যক্ত করিয়া বলাতে তাঁহারা আমাকে অবিলম্বে প্রিন্সিপাল সাহেবের সহিত দেখা করিতে বলিলেন; তিনি নাকি সেই দিনই বিশেষ কাজে কলিকাতা যাইতেছেন।

ভয়ে ভয়ে প্রিন্সিপালের কুঠীতে তাঁহার সহিত দেখা করিলাম। তিনি চিনিতে পারিলেন বটে, কিন্তু ব্যস্ত থাকার দরুন ভাল করিয়া কথাবার্ত্তা হইল না। বলিলেন, কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি এ বিষয়ে চিন্তা করিবেন। পরে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে হইবে। কলিকাতায় তাঁহার তিন সপ্তাহ দেরি হইবে।

সেদিনই সব কথা চুকিয়া না যাওয়াতেই যেন খুশি হইলাম। আমারও দীর্ঘ অবসর। প্রিন্সিপাল ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত বাঁকুড়াকেই আবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইব—এই চিন্তা করিয়া শান্ত মনে বাহির হইয়া দুইবৎসরের প্রিয়-আবাস হোস্টেলখানি দেখিতে গেলাম। চাকর, ঠাকুর, ম্যানেজার সব নূতন, ছেলেরা তো আমাকে হাঁ করিয়াই দেখিতে লাগিল। একজন ভরসা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কাকে চাই মশায়? কি বলিব? বলিলাম, আমি একদিন এখানেই থাকিতাম, তাই একবার দেখিতে আসিয়াছি।

উঠানের সেই নিমগাছ! ছুটির দিনে সর্ব্বাঙ্গ তৈলাক্ত করিয়া এই গাছে দাঁতন ভাঙিতে উঠারই কি আনন্দ ছিল! পুরাতন তালগাছটি তেমনই নিরুদ্বেগে দাঁড়াইয়া আছে—পত্রহীন হরীতকীগাছগুলির শাখায় শাখায় হরীতকী ঝুলিতেছে। পুকুরটির শোভা অনেক বাড়িয়াছে। মনে পড়িল, একদিন মাঘ মাসের শীতের রাত্রে শ্যামাপদের সহিত বাজি রাখিয়া সাঁতরাইয়া ওপারে গিয়াছিলাম; মনে পড়িল, প্রখর গ্রীষ্মে কলেজ কামাই করিয়া এই পুকুরের জলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গলা ডুবাইয়া বসিয়া থাকিতাম। হায় রে অতীত! সমস্ত লেপিয়া মুছিয়া দিবার কি অসীম ক্ষমতা এই কালের! ডাইনিং হলে সারি সারি যখন ৮০।৯০ জন খাইতে বসিতাম—'ঠাকুর, ভাত' 'ঠাকুর, তরকারি' 'ঠাকুর, ঝোল' 'ওকে বেশী দিলে কেন', 'আমাকে মাছের এই খানটা দাও' ইত্যাদি চীৎকারে হল যখন মুখর হইয়া উঠিত, সমবেত কলরবে প্রিন্সিপালের অসীম ধৈর্য্যেরও চ্যুতি ঘটায় তিনি হুঙ্কার করিয়া সকলকে সাবধান করিতে আসিতেন; রাত্রে খাওয়ার পর ধীরে ধীরে সব শান্ত হইয়া আসিত; ১০॥০ টার ঘণ্টা পড়িত, আলো নিবিয়া যাইত; তারপর ওয়ার্ডেনের কড়া হুকুম অমান্য করিয়া অন্ধকার ঘরে ফিস ফিস গল্পের আওয়াজ শুনা যাইত। খালি পায়ের নীরব পদক্ষেপে বারান্দা চঞ্চল হইয়া উঠিত। ওয়ার্ডেন টের পাইলে চুপি চুপি আসিয়া সহসা আলো জ্বালিয়া দুই-চারজন আইন-ভঙ্গকারীকে জরিমানা করিয়া গাঁক গাঁক করিতে করিতে ঘরে ফিরিতেন। তারপর ধীরে নিশীথের গর্ভে সকল ফিস ফিস সকল পদশব্দ একেবারে মিলাইয়া যাইত।

ভোরে উঠিবার ঘণ্টা বাজিত, চায়ের পর্ব্ব শেষ হইবার পর পড়া ও না-পড়ার দ্বন্দ্ব বাধিত। তারপর স্নান এবং খাওয়ার পালা, দলে দলে কলেজ যাওয়া ও কলেজ হইতে ফিরিয়া আসা, টিফিনের হুড়াহুড়ি, তাস খেলার কোলাহল, বৈকাল পাঁচটা হইতে সাতটায় মাঠে ও হোস্টেলে খেলার চঞ্চলতা, সঙ্গীতের কলোচ্ছ্বাস আর চীৎকারের কি বিরাট বহর! আমার



ছিল দোতালার ছয় নম্বর ঘরখানি—একেবারে পুকুরের ধারে। যেদিন আকাশে জ্যোৎস্না উঠিত, আলো নিবাইয়া দক্ষিণের জানালার ধারে দাঁড়াইতাম, অনাবিল জ্যোৎস্না মুখের উপর আসিয়া পড়িত, পুকুরের জল ঝলকিয়া উঠিয়া এক অপূর্ব্ব শোভায় মণ্ডিত হইত। ওপারের লিচু আর আম বাগানের চূড়ায় কে যেন আগুনের ঢাকনি দিয়া দিত—অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঘুমাইতে পারিতাম না। ভোর রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গিয়া দেখিতাম, আকাশের খেয়া পাড়ি দিয়া চাঁদখানি দূর বনান্তের অন্তরালে শুকতারাকে সঙ্গে লইয়া ডুবিতে বসিয়াছে। পথের ধারের প্রাচীন বটগাছে পাখীদের কোলাহল পড়িয়া গিয়াছে। কাঁকর-বিছানো পথে ভারমন্থর গরুর গাড়ি ক্যাঁচকোঁচ শব্দ করিতে করিতে চলিয়াছে। বর্ষার দিনে রাত্রে যখন আকাশ আঁধার করিয়া ঘোর কৃষ্ণমেঘ ছুটাছুটি করিত, বিদ্যুৎঝলকে মাঠের প্রান্ত অবধি জলিয়া উঠিত, প্রবলবেগে ঠাণ্ডা হাওয়ার সঙ্গে বর্ষণ শুরু হইত, তখন পুঁথি বন্ধ করিয়া আলো নিবাইয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইতাম, গেটের আলোকে বৃষ্টির ফোঁটাগুলা পর্য্যন্ত স্পষ্ট দেখিতে পাইতাম। কোন কোন দিন ওয়ার্ডেনের সকল আদেশ অমান্য করিয়া মাঠে গিয়া অকারণে ভিজিতাম, রাত্রির অন্ধকারে ফুটবল খেলিতাম হায় রে, সে কি জীবনই গিয়াছে! প্রত্যেকটি দিন যেন নব নব আনন্দের খোরাক সঙ্গে করিয়া আনিত, কাঁচা মনে সকলই প্রচুরভাবে উপভোগ করিতাম! হোস্টেলের সম্মুখে পুকুরপাড়ের তালগাছটির নীচে কয়েক মুহূর্ত্ত মাত্র দাঁড়াইয়া ছিলাম, কিন্তু সেই কয়েক মুহূর্ত্তেই আমার জীবনের পূরা দুইটি বৎসর যেন আদ্যোপান্ত পুরানো পড়ার মত 'রিভাইজ' করিয়া গেলাম। সুখ দুঃখের অপূর্ব্ব দ্বন্দ্ব লইয়া বাসায় ফিরিলাম।

আমার স্মরণশক্তির বহর দেখাইবার জন্য আজ এসব কথা লিখিতে বসি নাই। যাহা শুনাইব বলিয়া এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছি, তাহার সহিত ইহার কোন যোগ নাই; কিন্তু মানুষ বড় দুর্ব্বল, সে নিতান্ত

প্রয়োজনীয় কথা শুনাইয়াই ক্ষান্ত হইতে পারে না, দম দেওয়া কলের মত যাহা তাহার বক্তব্য সেইটুকু বলিয়াই তাহার বলা শেষ হয় না, অনেক অবান্তর কথা আসিয়া পড়ে, অনেক পুরাতন ক্ষুধা, অনেক অশান্ত ক্ষোভ অকারণে বাহির হইয়া পড়ে। এই অকারণ বাহুল্য যদি না থাকিত, তাহা হইলে মানুষের জীবনের দীর্ঘতা মানুষের বিষম ভারস্বরূপ মনে হইত, সে আত্মহত্যা করিয়া বাঁচিত।

পাঁচ বৎসর পরে বাঁকুড়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আমি একটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, সেইটাই শুনাইতে বসিয়াছি। ঘটনাটি যৎসামান্য; কিন্তু এই সামান্য ঘটনার প্রভাব আমি আজিও অতিক্রম করিতে পারিলাম না। যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা বলিতে গিয়া যাহা দেখি নাই, তাহাই বলিয়া ফেলিলাম। সামান্য মানবের সামান্য দুর্ব্বলতার কথা যদি কাহারও বিরক্তির কারণ হয়, তিনি ক্ষমা করিবেন।

অন্তত তিন সপ্তাহ বাঁকুড়ায় থাকিতে হইবে। মামাতো ভাইদের সহিত ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাস খেলিয়াও সময় কাটে না। প্রত্যহ বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইতাম; কিন্তু দিন ও রাত্রির অন্যান্য জাগ্রত প্রহরগুলি লইয়া ভারী গোলমালে পড়িলাম।

বাঁকুড়ায় পদার্পণ করিবার পর দ্বিতীয় কি তৃতীয় দিন হইবে, শহরের ঠিক কেন্দ্র এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল হলের পাশ দিয়া কলেজ অভিমুখে বেড়াইতে চলিয়াছি, এডওয়ার্ড হলের ঠিক সম্মুখের ল্যাম্পপোস্টের তলায় বেজায় ভিড়। এক দীর্ঘশ্মশ্রু ভদ্রলোক মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া গান গাহিতেছেন ও তাঁহার পশ্চাতে আর জনকয়েক লোক ধুয়া ধরিয়াছে। বুঝিলাম, খ্রীষ্টের মহিমা কীর্ত্তন হইতেছে। এই ভাবে ধর্ম্মপ্রচারের দৃশ্য ইতিপূর্ব্বে বাঁকুড়াতেই এবং অন্যান্য স্থলে বহুবার দেখিয়াছি; দৃশ্যটা একেবারেই নূতন নহে। অবসরবিনোদনের জন্য সেখানে দাঁড়াইয়া রঙ্গ দেখিতে লাগিলাম। বুঝিলাম, জনতার অধিকাংশই আমার মত বেকার লোক, সময়

অতিবাহনের এই সহজ পন্থাটাই গ্রহণ করিয়াছে, নিখরচায় একটু মজা দেখিয়া লইতেছে। প্রচারককে চিনিলাম। আগে ইঁহাকে দেখিয়াছি, ইঁহার নাম নন্দবাবু।

গান শেষ হইলেই অনেকে সরিয়া পড়িল, জনকয়েক মাত্র তখনও দাঁড়াইয়া রহিল, আমিও তন্মধ্যে একজন। নন্দবাবু বক্তৃতা শুরু করিলেন, সেই মামুলী ধরনের বক্তৃতা—পাপীর পরিত্রাণের জন্য তাঁর আগমন, তিনি ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র, সয়তানের সয়তানি দূর করিবার জন্য ৪০ দিন অনাহারে তপস্যা করিয়াছিলেন এবং অন্তিমে মানবের পরিত্রাণের জন্য ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন ইত্যাদি।

শ্রোতা সকলেই বাঙালী এবং রঙ্গদর্শকের দল, কেবল একজন বৃদ্ধ নগ্নগাত্র, কৌপীন-পরা সাঁওতালকে দেখিলাম গভীর মনোযোগের সহিত যীশুনামকীর্ত্তন শুনিতেছে। প্রচারকের লক্ষ্যও এই সাঁওতালটি, সম্ভবত সে কয়েকদিন যাবৎ এই ফাঁদে পা বাড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। সাঁওতালটিকে বিশেষভাবে দেখিতে লাগিলাম, মুখে ভারী একটা বিষাদের ভাব, কাঁধে একটা বাঁক, সম্ভবত সে দূর পল্লীগ্রাম হইতে কাঠ বেচিবার জন্য শহরে আসিয়া থাকে।

তাহাকে লক্ষ্য করিতে করিতে অনেক রকম অনুমান করিতে লাগিলাম। মনে হইল, লোকটি সম্প্রতি বিশেষ কোন ব্যথা পাইয়াছে—হয়তো তাহার কোন আত্মীয়বিয়োগ ঘটিয়াছে; তাই শহরে জীবিকার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে কিছু ধর্ম্মকথাও শুনিয়া মনকে সান্ত্বনা দেয়।

ইতিমধ্যে প্রচারকার্য্য শেষ হইল। নন্দবাবু সাঁওতালটিকে কিছু না বলিয়া সদলবলে চলিয়া গেলেন। লোকটা সেইখানেই কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে নূতনচটীর পথ ধরিল। আমিও তাহার অনুসরণ করিলাম।

কিছুদূর গিয়া হঠাৎ তাহার সহিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলাম। আমার

অনুমানই ঠিক। কিছুদিন হইল বৃদ্ধের উপযুক্ত পুত্র মারা গিয়াছে। এখন পেট চালাইবার জন্য তাহাকে নিজেকেই কাঠ লইয়া শহরে আসিতে হয়। সে ছাতনার কাছাকাছি হাতীশাল নামক গ্রামে থাকে। তাহার নাম বোধনা। সে এখন সেইখানেই চলিয়াছে।

তাহাকে ভয়ে ভয়ে এই খ্রীষ্টানী প্রচার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলাম। ধর্ম্মমতে পাছে কিছু আঘাত দিয়া ফেলি, তাই এই ভয়। সে বলিল, সে কয়দিনই এই গান ও কথা শুনিতেছে। মাঝে মাঝে সাহেবেরাও যীশুর কথা বলে। যীশুর কথা শুনিতে তাহার ভাল লাগে—বুকের জ্বালা অনেক কমে।

বুঝিতে পারিলাম, লোকটা মরিতে বসিয়াছে, কোনও আশা নাই। খ্রীষ্টানীর উপর একটা সহজাত ক্রোধ আমার মনে আছে, রাগও হইল একটু, কেন-রে বাপু, ধর্ম্মকথা শুনিবি তো রামায়ণ মহাভারতের কথা আছে, কালী, কৃষ্ণরাধা, রামলক্ষ্মণ, শিবদুর্গা সবই তো আছে। মনের শান্তি কি উহাতে পাওয়া যায় না? উহাদের গ্রামে কি একটা পুরোহিত বামুনও নাই? এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল, ইহাদের ধর্ম্মকথা শুনাইবার কোনও ব্যবস্থা তো আমাদের সমাজ করে নাই। যাহারা শুনিবে না, তাহাদেরই এই সব শোনানো হয়; যাহারা শুনিতে চায়, তাহাদিগকে শুনাইলে শাস্ত্রের অপমান হয়।

সেদিন সেই সন্ধ্যায় এক নিরক্ষর সাঁওতালের সম্মুখে কোনও তর্ক করিবার মুখ আমার রহিল না, আমি লজ্জায় অধোবদন হইলাম। তাহাকে প্রতিবাদস্বরূপ স্বধর্ম্মের স্বপক্ষে একটি কথাও বলিতে পারিলাম না। হায়, এ কি ভয়ঙ্কর অবহেলা! অথচ ইহাদেরই সহিত শত শত শতাব্দী ধরিয়া হিন্দু আর্য্যেরা পাশাপাশি বাস করিয়াছে, আর আজ সাগর পারের ধর্ম্ম তাহাদের শোনাইতে আসিয়াছে তাহারই স্বদেশের লোক! এই প্রচারক দলের বিরুদ্ধে কিছু কি বলিবার আছে?

কিছুদূর তাহার সঙ্গে গেলাম। শুনিলাম, হাতীশাল একটি সাঁওতাল-

পল্লী। সেখানে উচ্চজাতের কোনও লোক বসবাস করে না। আমি ইহাকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন কথা শুনাইতে পারিলাম না। আমাদের প্রবল প্রতাপান্বিত বিরাট সমাজই যখন ইহাদের গোষ্ঠীভুক্ত করার প্রয়োজন অনুভব করে নাই, তখন আমি কে এক নগণ্য শূদ্র কায়স্থ যুবক! এই সমাজ-সমুদ্রের বুকে একটি ঢেউ তুলিবার ক্ষমতাও কি আমার আছে!

দুই-তিন দিন পরে ঠিক সেই ল্যাম্পপোস্টের নীচে আবার সেই সাঁওতাল বৃদ্ধকে দেখিলাম। প্রচার করিতেছিলেন এক বিদেশী সাহেব। ভাঙা ভাঙা ট, ড সমাকীর্ণ গানটা সেদিন জমিয়াছিল ভাল। বোধনা মুগ্ধের মত শুনিতেছিল। গানের পর সাহেব যখন অনভ্যস্ত ভাষায় ব্যথিত আর্ত্তনাদে যীশুর নামে বলিলেন,—এস, কে আছ কোটায় পাপী, আমি টোমাড্গিকে পরিট্রাণ করিব—তখন সমবেত অবিশ্বাসী জনতা উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেও ব্যথিত সাঁওতালের চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিল। বুঝিতে পারিলাম, আর একটি মেষশাবক অচিরাৎ যীশুর খোঁয়াড়ে প্রবেশ করিবে।

বোধনা সম্বন্ধে আমার কৌতূহল বাড়িয়া চলিয়াছিল; তবু যাহোক ইহাকে উপলক্ষ্য করিয়া সমাজ সম্বন্ধীয় গভীর তত্ত্বগুলি মনে মনে আলোচনা করিয়া সময় কাটিতেছিল। যাক, এখন তিন সপ্তাহ শেষ হইলেই কার্য্য সমাধা করিয়া ফিরিতে পারিলেই বাঁচি। মেমোরিয়াল হলের সম্মুখে বৈকালে প্রত্যহ যাইতে লাগিলাম। একদিন শুনি, সেই বিদেশী সাহেব যীশুর দশ আদেশের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতেছেন। বাঁকুড়ার মিশনরীর প্রাচীন সাহেবদের প্রায় সকলকেই চিনিতাম, কারণ আমাদের কলেজটি মিশনরী কলেজ। এটি সম্ভবত নবাগত, এখনও উচ্চারণদুরস্ত হয় নাই, কিন্তু সেই অদ্ভুত উচ্চারণ ও অদ্ভুত ভাষা লইয়া 'দশাদেশ' বর্ণনার উৎসাহ কত! Thou shalt not kill—খুন কড়িও না, কাহাকেও হট্যা কড়িও না—পশু প্রাণী পিপীলিকা কাহাকেও। চারিদিকে ভারী

একটা হাসির ঘটা পড়িয়া গেল; কিন্তু তাহারই মধ্যে বোধনার শীর্ণ শান্ত মুখখানি ব্যাকুল আগ্রহে কি যেন খুঁজিয়া ফিরিতেছিল। সে কি পাইল সেই জানে, কিন্তু মনে হইল যেন সে কিছু পাইয়াছে।

একদিন হঠাৎ খেয়াল হইল, শুশুনিয়া পাহাড় দেখিতে যাইব। পাঠ্যাবস্থায় দুইবার গিয়াছি। খোলা মাঠ দেখায় অভ্যস্ত চোখ দুইটি পরিতৃপ্ত হইয়া ফিরিয়াছে। বাঙলার সমতল ক্ষেত্রে উত্তরে হিমালয়কে বাদ দিলে এই সবেধন নীলমণি, এই একটিমাত্র শুশুনিয়া পাহাড়। আসানসোল অঞ্চলে বর্দ্ধমানের প্রত্যন্ত দেশে দুই-একটি পাহাড় আছে বটে, তবে সেগুলি আকার-আয়তনে ছোট। আমাদের অনভ্যস্ত চোখে শুশুনিয়ার দৃশ্য উপভোগ্য সন্দেহ নাই। মামাতো ভাইয়েরা দুই এক জন সঙ্গ লইল। শুনিলাম, ছাতনার কাছে এক মেলা হইতেছে; তাহাও দেখিয়া আসা যাইবে।

শুশুনিয়া পাহাড়! দূর হইতে ঠিক একটি হাতীর মত দেখিতে। পাহাড়ের গাত্র চূড়া অবধি গভীর জঙ্গলে সমাকীর্ণ—অতি শীর্ণ পথ। সেই পথে বহু কষ্টে উপরে উঠিয়া এক অপরূপ দৃশ্য দেখিলাম। দূরে দ্বারকেশ্বর নদীর জল ইস্পাতের পাতের মত ঝলসিয়া উঠিতেছে। চারিদিকে বিস্তীর্ণ সবুজ প্রান্তর—তাহার মধ্যে মধ্যে লাল রঙের রাস্তাগুলি রক্তরেখার মত মনে হইতেছিল। বহুদূরে পশ্চিমদিকচক্রবালসীমানায় পঞ্চকোট পাহাড় একটি জমাট ধূম্রপুঞ্জের মত মনে হইল।

নামিয়া আসিয়া শুশুনিয়াগিরিকন্যা—ঝরনার শীতল ধারা পরিতৃপ্ত হইয়া পান করিলাম। খাওয়া-দাওয়ার সরঞ্জাম সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলাম। পাহাড়ের পাদদেশে ডাকবাংলা আশ্রয় করিয়া রন্ধনাদি সমাপণ করিলাম। সে রাত্রে সেই ডাকবাংলাতেই রাত্রি যাপন করিতে হইল। ভোরে ভোরে রওয়ানা হইয়া বেলা আটটা নাগাদ ছাতনার মেলায় পৌছিলাম। বিরাট জনসমাগম, অধিকাংশই সাঁওতাল ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দু। এদিক সেদিক

ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, হঠাৎ এক জায়গায় একটা দৃশ্য দেখিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিলাম। সেই সর্ব্বনেশে প্রচারকার্য্য—ইহারা কি পৃথিবীর কোন স্থানকে রেহাই দিবে না? আফ্রিকার গভীরতম জঙ্গল হইতে সুদূর উত্তরমেরুর তুহিন শীতলতার মধ্যেও কি ইহারা এই ধর্ম্মের ধ্বজা বহন করিয়া ফিরিবে? আপনার অজ্ঞাতসারে সেই জনতার ধারে আসিয়া দেখি আমাদেরই ইংরেজীর অধ্যাপক লরেন্স সাহেব পরিষ্কার বাংলায় খ্রীষ্টের মহিমা সম্বন্ধে সরস বক্তৃতা দিতেছেন। একজন নবদীক্ষিত সাঁওতাল ভ্রাতাকে তিনি সেই জনতার সম্মুখে উপস্থিত করিয়া এই ধর্ম্মের শীতল শান্তির উল্লেখ করিতেছেন; নবদীক্ষিত ভ্রাতাটি দেখি আমাদেরই বোধনা। যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই; তবে এত শীঘ্র যে লোকটা অন্ধকার হইতে আলোকে উত্তীর্ণ হইবে, তাহা ভাবিতে পারি নাই। একপাশে দাঁড়াইয়া প্রচারের মহিমা শুনিতেছিলাম, হঠাৎ দেখি বোধনাও বলিতে শুরু করিয়াছে। তাহার গলায় যীশুর প্রতীক ক্রুশ ঝুলিতেছে। সে বেশি কিছু বলিতে পারিল না, দুই-একটি কি অস্পষ্ট কথা বলিয়াই হাত জোড় করিয়া তাহার নূতন দেবতাকে নমস্কার করিল। তাহার হাতে একখানি মঙ্গলসমাচার শোভা পাইতেছিল।

অভিনয় শেষ হইল। মামাতো ভ্রাতারা আমার যীশুপ্রীতি সহিতে না পারিয়া এদিক-ওদিক ছিটকাইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদিগকে খুঁজিতে যাইব কি না ভাবিতেছি, হঠাৎ শুনিলাম, হ্যালো যতীন, তুমি এখানে? আলাপের প্রথম পর্য্যায় শেষ হইলে সাহেব বোধনার সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন, ইহাতে তাঁহার একটু গর্ব্বও ছিল। আমি বলিলাম, উহার সহিত আমার পরিচয় আছে।

একথা সেকথার পর সাহেব আমাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার তাঁবুতে লইয়া গেলেন। এইরূপ মেলায় প্রচারের ভার ইহাদের এক-একজনকে লইতে হয়; এইসব জায়গায় ইহাদের কাজ খুব দ্রুত অগ্রসর হয়।

সেই নিঃসঙ্গ স্থানে সাহেব আমাকে পাইয়া খুব খুশিই হইয়াছিলেন। আমার জন্য তিনি প্রিন্সিপালকে বলিবেন, এ আশ্বাসও দিলেন। আমি মামাতো ভাইদের জন্য একটু চিন্তিত হইলাম, তাহারা হয়তো আমাকে খুঁজিবে। সাহেব বলিলেন, বেশ, তাহাদের শহরে ফিরিয়া যাইতে বল, তুমি আমার সঙ্গে আজ থাক, কাছেই শালবনে শিকার করিতে যাইব, তোমাকে সঙ্গী পাইলে খুশি হইব।

সাহেবের মন রাখিলে যদি চাকরিটা পাওয়া যায়, এই ভরসায় মামাতো ভাইদের বিদায় করিয়া আসিলাম। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি বন্দুক ব্যবহার করিতে জানি কি না। আমি বলিলাম, জানি, কিন্তু বন্দুক সঙ্গে নাই দেখিতেছেন। সাহেব বলিলেন, তাহাতে আটকাইবে না, তাঁহার দুইটা বন্দুক আছে, তাহা ছাড়া এই জঙ্গলের মাঝে লাইসেন্সের কোন মূল্য নাই।

ডজনখানেক পাখী ও দুইটা খরগোশ শিকার করিয়া তাঁবুতে ফিরিয়া আসিতেছি; রাস্তায় বোধনার সঙ্গে দেখা, বেলা তখন প্রায় পড়িয়া আসিতেছে। দূরে শুশুনিয়া পাহাড় ঝাপসা দেখা যাইতেছে। বোধনা মেলা হইতে হাতীশালে ফিরিতেছিল, সাহেবকে দেখিয়াই সে সেলাম করিয়া অভিবাদন জানাইল। সাহেব তাহাকে আবার পরদিন যথাসময়ে তাঁবুতে আসিতে বলিলেন। সাহেবের হাতে ব্যাগ ও বন্দুক দেখিয়া বোধনা জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাগে কি? সাহেব মহা উৎসাহে তাহাকে শিকারগুলি দেখাইতে লাগিলেন, বলিলেন, এক গুলিতে পাঁচটা পাখী মারিয়াছেন।

সাহেবের কথা শুনিয়া বোধনা কেমন যেন বিমর্ষ হইয়া গেল। সাহেব তাহা লক্ষ্য করিলেন কি না জানি না, আমি দেখিলাম, বৃদ্ধ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, তাহাকে অত্যন্ত অভিভূত হইতে দেখিলাম। কারণ বুঝিতে পারিলাম না; মনে করিলাম, হয়তো এই শিকারের সহিত ইহার পুত্রের

কোন স্মৃতি জড়িত আছে। সে একটিও কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

বাঁকুড়া ফিরিতে চাহিলাম, সাহেব বলিলেন, তাই কি হয়? শিকার করিয়া শিকারের আস্বাদ না লইয়া যাওয়া কি উচিত? অনিচ্ছার সহিত থাকিতে হইল। তাঁবুর দুইটা কক্ষ, এক কক্ষে আমি শয়ন করিলাম। সেদিন রাত্রে কেন জানি না, বৃদ্ধ বোধনার কথা আমার মনে হইতেছিল। লোকটা অমন করিল কেন?

সকালবেলায় সাহেব ও আমি একত্র খাইতে বসিয়াছি, ট্রেনের বেশি বিলম্ব নাই, তাই তাড়াতাড়ি করিতেছিলাম, এমন সময় বৃদ্ধ বোধনা আনত-মুখে সাহেবের পাশে দাঁড়াইল। মনে হইল, সে নিতান্তই ব্যথা পাইয়া আসিয়াছে। সাহেব সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি বোধনা?

বোধনা ধীরে ধীরে তাহার ক্রুশখানি গলা হইতে খুলিয়া লইল এবং সেটি ও তাহার মঙ্গলসমাচারখানি সাহেবের পদতলে নামাইয়া রাখিল। সাহেব ও আমি উভয়েই চমকিয়া উঠিলাম। সাহেব বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কি ব্যাপার?

বৃদ্ধ একবার শান্ত মুখখানি সাহেবের মুখের পানে তুলিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা নামাইয়া লইল। ধীরে ধীরে বলিল, সাহেব, তোর ধর্ম্ম তোর থাক্, আমার ওতে কাজ নাই। আমি তোর ধর্ম্ম তোকে ফিরিয়ে দিলাম।

সাহেব মূঢ়ের মত তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন; কিছুই বুঝিলেন না, মনে হইল। আমি কিন্তু বুঝিলাম। সাহেব বলিলেন, কি হ'ল আবার, ধর্ম্ম নিয়ে কি ইচ্ছা করলেই ফিরে দেওয়া যায়? কি হয়েছে বল না? তোমার সমাজের লোকেরা কি গোলমাল করছে?

বোধনা শান্তকণ্ঠে বলিল, না সাহেব, বুড়াকে আবার কে কি বলবে? আমি বড় দুঃখে তোর ধর্ম্ম নিয়েছিলাম সাহেব, কিন্তু তোর কাজে আমি

কষ্ট পেয়েছি। তোর দেবতা বলেছে—খুন না করতে, সবাইকে প্রেম করতে; আর তুই তো ভক্ত হয়ে কাল অতগুলো জীব খুন করলি, তোর যীশু তোকে কি বলবে বল্ তো?

ধর্ম্মের এতটা সূক্ষ্ম বোধশক্তি প্রমত্ত সাহেবের ছিল না। তিনি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, ও, এই! আরে বোকা, আমি যা বলি সেইটাই তুই শুনবি, আমি কি করি না করি, তা দেখিস কেন? সংসারে সবাই কি ধর্ম্মের সব আইন মেনে চলতে পারে?

সাহেবের হাসিতে বৃদ্ধের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। সে নত হইয়া আভূমি সেলাম করিয়া কহিল, কিন্তু সাহেব, তুই কালই যে অত লোকের সামনে বললি, যীশু সব জীবে প্রেম করতে বলেছেন! যীশু কি এক কথা ব'লে কাজে অন্য কিছু করতে বলেছে, তা হ'লে কেমন দেবতা সে! সাহেব, তোর ধর্ম্ম তোর থাক, আমি চললাম।

এই বলিয়া বৃদ্ধ তাহার ঋজু দেহখানি লইয়া ধীরে ধীরে সেখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। সাহেব মুহূর্ত্ত মাত্র স্তব্ধ হইয়া রহিয়া আবার অট্টহাস্য করিয়া বলিলেন—The old fool, he will have to come to me again (বুড়ো বোকা, ওকে আমার কাছে আবার আসতে হবে)।—বলিয়াই সাহেব আবার শান্তভাবে চা পান করিতে লাগিলেন। আমার কাছে কিন্তু চা-টা কেমন তিক্ত বোধ হইল। গত রাত্রের ভুক্ত মাংস আমার মগজের মধ্যে গুঞ্জন শুরু করিয়া দিল। সমস্ত সভ্য জগতের তরফ হইতে আমি লজ্জা অনুভব করিলাম। ধনমদগর্ব্বে, বিষয়বুদ্ধির মোহে আমরা সহজ সত্য এমন করিয়াই বিস্মৃত হইয়াছি, অথচ বিশ্ব ব্যাপিয়া সহজ-বুদ্ধিকে বলি দিয়া এই বিষয়-বিকৃত ধর্ম্মকে কি ভাবে ছড়ানো হইতেছে ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। সভ্যতার মোহে আমরা এমনই অন্ধ হইয়াছি যে, মৈত্রী-ও-প্রেম-ধর্ম্মের একজন প্রচারক অকারণ প্রাণীহত্যায় কিছুমাত্র

গ্লানি অনুভব করে না। কেহ যদি তাহার হইয়া এই গ্লানি অনুভব করে, তাহা হইলে সে বিস্মিত হয়।

ট্রেন ফেল করিলাম। ভারাক্রান্ত চিত্ত লইয়া হাঁটিতে হাঁটিতে বাঁকুড়ায় আসিয়া পৌঁছিলাম; কিন্তু বোধনার কথাগুলি আমার মনের মধ্যে নিরন্তর পাক খাইতে লাগিল। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মপ্রচার! হায়, এ কি অধর্ম্ম মানুষ করিতেছে! হিন্দুরা এই প্রচারকার্য্য করে না বলিয়া সে দিন গ্লানি অনুভব করিয়াছিলাম, আজ তাহা দূর হইল। এই তো ঠিক। প্রচারক যতদিন পর্য্যন্ত ধর্ম্মকে শ্রদ্ধা করিতে না শিখিবে, ততদিন ধর্ম্মপ্রচারের মত বিড়ম্বনা কি হইতে পারে!

প্রিন্সিপালের সঙ্গে আর ভরসা করিয়া দেখা করিতে পারিলাম না, যদি চাকুরিটা দিয়া ফেলে, তাহা হইলে হয়তো গৌণভাবে এই ধর্ম্মপ্রচারেরই সাহায্য করিতে হইবে। সে যে অত্যন্ত সাংঘাতিক।

সেবার বাঁকুড়ায় গিয়া কোনও কার্য্য সাধন করিতে পারি নাই বটে, কিন্তু জীবনে এক সহজ সত্যের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করিয়া আসিয়াছি; তাই এই ভ্রমণের কথাটি আমার জীবনের পটে সোনার অক্ষরে লেখা হইয়া গিয়াছে।

কায়া

হিমাদ্রির এই অকস্মাৎ অন্তর্দ্ধানে সবাই আশ্চর্য্য আর বিরক্ত হ'ল—ব্যাপারটাকে নিরুদ্বেগে আর সহজভাবে গ্রহণ করলে শুধু উর্ম্মিলা। কলেজে-পড়া মেয়ে—স্কটিশে বি-এ অনার্স পড়ছে, পড়াশোনা ও বাইরের জগতের সঙ্গে মেলামেশার দরুন তার মনের মধ্যে একটা সহজ আত্মসম্মানের বোধ জাগ্রত হয়েছে, হিমাদ্রির ব্যবহারে তাতে ঘা লাগা খুবই স্বাভাবিক। দেখতে শুনতে সে মন্দ নয়, গুণী যে কিছু কম তাও নয়—তবু বাঙালী ঘরের বয়স্থা আইবুড়ো মেয়ে, তাকে পার করা নিয়ে ঘরে বাইরে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, পিতৃকুলের তরফ থেকে তার অপমান ও হীনতা সে সর্ব্বদা অনুভব করছিল। মুখে আপত্তি করার মত মেয়ে সে নয়, পিতৃব্য অমূল্যরত্নের নীচ কৌশলে যোগ দিতেও সে অসম্মতি জানায় নি। তার মনের গ্লানি তাকে উত্তরোত্তর গম্ভীরই ক'রে তুলছিল। হিমাদ্রি স্বয়ং তাকে নিষ্কৃতি দিলে দেখে সে খুশি হ'ল—মনে মনে হিমাদ্রির প্রতি কৃতজ্ঞও যে একটু না হয়েছিল তা নয়। মোটের উপর, ব্যাপারটার আকস্মিকতায় উর্ম্মিলার আত্মীয়পরিজন কিছু মুহ্যমান হয়ে পড়লেও বেশিদিন ও বেশিদূর এটা গড়াল না ভেবে সবাই নিশ্চিন্ত হয়েছিল!

এই ব্যাপারটাই অন্যভাবে ঘটলে হয়তো উর্ম্মিলার মনে দাগ না হোক একটা আঁচড়ও লাগত। স্বামী হিসাবে হিমাদ্রি কাম্য বইকি! সুপুরুষ, এ-এ পাস, পড়াশোনায় সেরা ছেলে, পুত্রকে অধিকতর কাম্য করে তোলবার জন্যে পিতা রেখে গেছেন অগাধ পয়সা; সংসারের খুঁটিনাটি নিয়ে দেখার মত হীনও সে নয়। এমন স্বামীকে হাতের মুঠোর মধ্যে

পেয়েও যখন হারাতে হ'ল, তখন উর্ম্মিলা কাঁদতে বসলেও কেউ আপত্তি করত না, কিন্তু বর হিসাবে হিমাদ্রি কেমন, এবং নিজের সঙ্গে হিমাদ্রিকে জড়িয়ে একটা কোনও ছবি মনের মধ্যে এঁকে নিলে কতখানি সুখ হয়, এ সব যাচাই করবার অবসর উর্ম্মিলা পায় নি। নিরুপদ্রব রাজ্যে জরুরি অর্ডিন্যান্সের মত হিমাদ্রিকে তার ঘাড়ে এমন হঠাৎ চাপানোর চেষ্টা চলেছিল যে, অতর্কিত আক্রমণে মুহ্যমান না হ'লেও হিমাদ্রির প্রতি কোনও উচ্চ ভাব পোষণ করাও তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। হিমাদ্রির জ্যেষ্ঠ সহোদর ব্রজেন্দ্র যেভাবে তার হাত টিপে তার মাংস নরম কিনা পরীক্ষা ক'রে গিয়েছিল, ট্রামের কণ্ডাক্টারের টাকা বাজিয়ে নেবার মত যেভাবে তাকে বাজিয়ে দেখেছিল, তাতেও তার সন্তুষ্ট হওয়ার কথা নয়। তবু সে মেয়ে-জাতীয় ও দেশটা বাংলা দেশ ব'লে এতদূর পর্য্যন্ত সহ্য করেছিল। কিন্তু খুড়া অমূল্যরত্ন জরুরি টেলিগ্রাফ পাঠিয়ে তাকে বহরমপুরে নিয়ে গিয়ে হিমাদ্রির সদ্য-কেনা বাড়িটার ভূতসম্বন্ধীয় অপবাদের সুবিধা নিয়ে সেই তথাকথিত ভূতুড়ে বাড়িতে তাকে দিয়ে ছ-ছটা রাত্রি হিমাদ্রির শোবার ঘরে যে কসরৎ করালেন, সেটা সে একেবারেই সমর্থন করতে পারে নি। অবিশ্যি এতে হিমাদ্রির কোনই দোষ ছিল না। সে বেচারা স্বপ্নপ্রবণ, এক টুকরো ছেঁড়া চুল হাতে পেলেই যারা গোটা মানুষটাকে কাছে পায়, সেই জাতীয় লোক সে। তাকে ঠকাতে খুব বেশি পরিশ্রম হয় নি, কিন্তু যদি তাকে সত্যি সত্যিই চেপে ধরত, যদি চেঁচিয়ে উঠে লোক জড়ো করত! একজন কুমারীর পক্ষে খুড়ার গুপ্ত উপস্থিতি সত্ত্বেও ব্যাপারটা শোভন হ'ত না। ভূতের অপবাদ ছিল ব'লে তবু রক্ষে, কায়াকে ছায়া বলে ভেবে নিতে হিমাদ্রিরও বেশি পরিশ্রম করতে হয় নি—চেঁচামেচি করলেও হয়তো বাড়িটার ত্রিসীমানায় লোকের টিকি দেখা যেত না; তবু সেদিন তো সে প্রায় ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে, চেয়ার ছেড়ে পালাবার সময় হাতের বইটা ফেলে আসত আর একটু হ'লে, আর বইটার একেবারে

প্রথম পাতায় তার নাম ধাম স্পষ্ট লেখা, তার ইংরেজী বাংলা হাতের লেখার নমুনাও হিমাদ্রির কাছেই ছিল।

এই সব কারণে, সে প্রথমটা যখন শুনলে যে হিমাদ্রি তার সঙ্গে বিয়েটা বন্ধ করবার জন্যে অনির্দ্দেশ যাত্রা করেছে তখন সে মোটেই উদ্বিগ্ন হয় নি, বরঞ্চ জুয়াচুরির সাহায্যে স্বামী ধরার হীনতা থেকে রক্ষা পেল ভেবে খুশিই হয়েছিল। এর পরে হয়তো আজীবন এই নিয়ে তাকে আপসোস করতে হ'ত!

কিন্তু এরই সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে হঠাৎ কেন জানি না তার মনে হতে লাগল, হিমাদ্রিবাবু পালালেন কেন? তাকে পছন্দ হয় নি? অন্য কোথায়ও মন পড়েছে? না, ভুতুড়ে বাড়িতে প্রথম রাত্রে তাকে দেখে তিনি যেমন চমকে উঠেছিলেন, অভিভূতের মত যেভাবে তার দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন, করুণকাতর বুভুক্ষিত কণ্ঠে যেভাবে ডেকে-ছিলেন, 'কে? তুমি কে?' তাতে মনে হয় হিমাদ্রিবাবুর আর যাই দোষ থাক ভূতপূর্ব্বরাগের বালাই তাঁর মধ্যে ছিল না। তবে? ভুতুড়ে বাড়িতে যে ছায়ারূপিণীকে দেখে তিনি মোহাবিষ্ট—হ্যাঁ মোহাবিষ্ট বইকি, মানুষের চোখ কখনও মিথ্যা বলে না—হয়েছিলেন, ঊর্ম্মিলার মধ্যে তারই কায়ারূপ দেখে তিনি ভয় পেলেন কি?

হিমাদ্রির পলায়নের আগের ব্যাপারটা একটু ঝালিয়ে নেওয়া যাক। বিধবা মাতা ও দুই পুত্র—ব্রজেন্দ্র ও হিমাদ্রি। হিমাদ্রি ছোট, অবিবাহিত। ব্রজেন্দ্রের পত্নী আছে। পিতার অগাধ অর্থ, হিমাদ্রি তার অর্দ্ধেকের মালিক। লেখাপড়ায় এদেশে যতটা ওঠা সম্ভব হিমাদ্রি ততখানিই উঠেছিল, বিলেতে গিয়ে শেষ একটা ডিগ্রি উপার্জ্জন করে আনার একটা গোপন বাসনা এখনও সার্থকতা লাভ করে নি। বিয়ের সম্বন্ধ করার পক্ষে সময়টা অনুকূল, সুতরাং ব্রজেন্দ্র দেখে এলেন ঊর্ম্মিলাকে, সুন্দরীই বলতে হবে—কটিশে বি-এ পড়ছে। ব্রজেন্দ্র কনে দেখে ফেরবার পথে পাথেয় সঙ্গে

এনেছিলেন, উর্ম্মিলার ইংরেজী বাংলা হস্তাক্ষর। ব্রজেন্দ্রের মারফৎ কনের বর্ণনা শুনে মা তো উদ্যত হয়ে উঠলেন, বউদিদিও উর্ম্মিলার ইংরেজী-বাংলা হাতের লেখার নমুনা হিমাদ্রির কাছে ফেলে দিয়ে সারা শরীরে চাপা হাসির ঢেউ তুলে অন্তর্হিত হলেন। সেই কাগজের টুকরো দুটি অনিচ্ছা-সত্ত্বে নিজের অজ্ঞাতসারে যখন তখন দেখতে দেখতে হিমাদ্রির মনে কায়া ও ছায়া সম্পর্কে গভীর দার্শনিক তথ্যের উদয় হতে লাগল। অক্ষরগুলোই চোখের সামনে একটা জীবন্ত নারীমূর্ত্তিতে লীলান্তরিত হয়ে উঠল। কিন্তু হিমাদ্রি ছায়াবিলাসী; এই ছায়া-মূর্ত্তিকেই স্থূল মাংসল ক'রে তুলে একেবারে নিঃশেষে আয়ত্ত ক'রে ফেলতে হবে—এটা হিমাদ্রির রুচিতে বাধল। সে ব্রজেন্দ্রের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে কলকাতা ছেড়ে একেবারে বহরমপুরে গঙ্গার ধারে পাঁচ হাজার টাকায় একটা সুন্দর বাড়ি খরিদ ক'রে সেখানেই ডেরা বাঁধলে। স্থানীয় লোকে বাধা দিলে—ভূতের বাড়ি, নানা বিপদের আশঙ্কা ইত্যাদি ভয় দেখিয়ে তাকে নিরস্ত করতে চাইলে, কিন্তু হিমাদ্রি জেদ ছাড়লে না। এই বাড়িতেই ছয় রাত্রে বিভিন্ন অবস্থায় এক ছায়ারূপিণীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ এবং সপ্তম দিনে সেটেল্‌মেণ্টের হাকিম অমূল্যরত্নের বাড়িতে ছায়ারূপিণীর কায়ামূর্ত্তি প্রত্যক্ষ ক'রে তার পুলক-বিস্ময়। পরিচয়ে জানল সেই উর্ম্মিলা, স্কটিশে বি-এ পড়ে। হিমাদ্রির মনটা হঠাৎ কায়ালোভী হয়ে উর্ম্মিলার সঙ্গে বিয়েতে সায় দিয়ে বসল। কিন্তু কত কি আশা ক'রে সে রাত্রে সে বাড়ি ফিরে কায়ার প্রতীক্ষা করে করে সমস্ত রাত্রের মধ্যে আর ছায়ারূপিণীর সাক্ষাৎ পেলে না। তার পরদিন না, তার পরের দিনও না।

বিয়ের তারিখ ঠিক, মা ও বউদি দু-চার দিন বাদে এলেন ব'লে, এমন সময়ে হিমাদ্রির স্বপ্ন গেল ভেঙে, সে ভাবলে, যে কায়াবন্ধনে সে বন্দী হতে বসেছে, সে একটা মাংসস্তূপ—লজ্জা আর লোভ, জ্বর আর জরার একটা সমষ্টি। তার মনে হ'ল, ওই ছায়া হচ্ছে তার প্রথম প্রেমের স্বপ্ন—মোহে

যার জন্ম, মুক্তিতে যার অবসান। উর্ম্মিলার পায়ের শব্দ শুনে ছায়া পালাল। কলকাতায় সে টেলিগ্রাফ করলে, মা বউদির আসার প্রয়োজন নেই। তারপরে সে ট্রেনে চেপে বসল—বহুদূরের ট্রেন।

হিমাদ্রি গেল কোথায়? উর্ম্মিলার জানার কথা নয় বটে, কিন্তু আমাদের সে কথা জানবার বাধা নেই। যার থেকে হিমাদ্রির এই ছায়া-বিলাস তাকেই এড়াবার জন্যে সে সোজা পাড়ি দিল সেই ক্ষুধিত পাষাণের দেশে হাইদ্রাবাদ নিজামের রাজ্যে অরালী (আরাবল্লী) পর্ব্বতশ্রেণীর পাদমূলে স্বচ্ছতোয়া শুস্তাবিধৌত বরীচে। সেখানে বাল্যবন্ধু হিরণকুমার ফরেস্ট-রেঞ্জার, স্তম্ভের ধারে একটা চমৎকার বাংলোতে সস্ত্রীক তার বাস। হিমাদ্রি আশ্রয় পেলে।

একটা কথা এখানে বলে রাখা আবশ্যক, উর্ম্মিলা শিক্ষিতা মেয়ে, স্কটিশে বি-এ পড়ে, মারি স্টোপ্স, হ্যাভেলক এলিস পার হয়ে ক্রাফ্ট এবিং পর্য্যন্ত তার আধুনিক মনস্তত্ত্বের বিদ্যা, সে স্বচ্ছন্দে হিমাদ্রির এই ছায়াপ্রীতি ও তদ্ধেতু পলায়ন ঘটনাটাকে একটা প্যাথলজিকাল কেস ভেবে নিশ্চিন্ত হতে পারত। কিন্তু কেন জানি না, হিমাদ্রিকে ততখানি ছোট করে দেখতে তার মন চায় নি। সে তার কাব্যের দিকটাকেই বড় করে দেখে নিজেও ক্ষণিকের আত্মবিস্মৃতিতে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল। হিমাদ্রির পলায়নের সঙ্গে সঙ্গেই উর্ম্মিলার মনের এই দুর্ব্বলতার সূত্রপাত হয় নি, তাকে জড়িয়ে হিমাদ্রি একটা কাণ্ড ক'রে বসেছিল ব'লেই আস্তে আস্তে হিমাদ্রি উর্ম্মিলার চিন্তারাজ্যে একটু একটু ক'রে রাজ্য বিস্তার করছিল।

হিরণকুমারের ডাকবাংলোটা যেখানে, সেখানে শুস্তা একটা বাঁক ফিরেছে, সেই বাঁকটা পার হ'লেই সেই প্রসিদ্ধ দ্বিতীয় শা মামুদের ভোগ-বিলাসের প্রাসাদ, নদীর ধারে পাথর-বাঁধানো দেড়শত সোপানময় অত্যুচ্চ ঘাটের উপরে শৈলপাদমূলে একাকী দাঁড়িয়ে আছে এবং সম্ভবত আজও পাগলা মেহের আলি যথানিয়মে প্রাসাদ প্রদক্ষিণ ক'রে তার

অভ্যস্ত চীৎকার করছে—তফাৎ যাও, তফাৎ যাও, সব ঝুট্ হ্যায়, সব ঝুট্ হ্যায়।

আশেপাশে হালফ্যাসানের দু-চারটে ডাকবাংলো ওঠা সত্ত্বেও স্থানটির নির্জ্জনতা দূর হয় নি, বড় বড় পুরাতন বিরাটকায় বটবৃক্ষের পাশে শিশু বকুলগাছের মত বাংলোগুলি বাড়িটার বিরাটত্ব আর প্রাচীনত্ব বাড়িয়েই তুলেছিল। প্রথম দিন বিকেলেই হিরণকুমারের স্ত্রী মাধবী হিমাদ্রিকে সম্বোধন ক'রে বউদিদির ঢঙে হাসতে হাসতে যখন বললে, আপনি তো আবার কবি শুনেছি, দেখবেন ওবাড়িটা রবি ঠাকুরের মত আপনাকেও না পেয়ে বসে, আমরা যেন পাপের ভাগী না নই, দেখবেন, তখন সে সত্যিসত্যিই চমকে উঠেছিল; সেই ছায়াময়ী বহরমপুর থেকে বরীচ অবধি পেছনে ধাওয়া করবে না তো!

প্রাসাদ স্থানে স্থানে ভগ্ন জীর্ণ হ'লেও এখনও বাস করার অযোগ্য হয় নি, কিন্তু তবু কেউ তাতে বাস করে না। এক-একদিন সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও যখন হিমাদ্রি সেই প্রাসাদের সোপানমূলে দূরবর্ত্তী অরালী পর্ব্বতের ঘনায়মান অন্ধকারের দিকে চেয়ে একলা ব'সে থাকত, তখন বরীচের সেই তুলার মাশুল-আদায়কারীর মত তারও মনে হ'ত—যেন একেবারে অনেকগুলি পায়ের শব্দ শোনা গেল, যেন একদল প্রমোদচঞ্চল নারী শুস্তার জলে স্নান করতে নামছে—কাকেও যেন লক্ষ্যই করছে না। আরও কিছু দেখবার শোনবার প্রতীক্ষায় সে চুপ ক'রে ব'সে থাকত,বাতাস হিমে মন্থর হয়ে আসত, তবু সে উঠে যেতে পারত না। দূরে যখন একটা টর্চ আর একটা লণ্ঠনের আলো ধারালো ছুরির মত সেই প্রসন্ন অন্ধকারকে চিরতে শুরু করত, হিরণকুমারের গম্ভীর বিস্ময়সূচক সম্বোধন ও মাধবীর চঞ্চল কলহাস্যে নদীতীরের স্তব্ধতা তরঙ্গিত হয়ে উঠত, হিমাদ্রি তখন বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলত, যাও, তোমরা বড় ব্যস্তবাগীশ, নির্জ্জনে একটু আরাম করছিলাম, তা বুঝি সইল না! মাধবী হেসে বলত, এই

রে, ওষুধ ধরেছে! তখন হঠাৎ কেন জানি না তার মনে পড়ে যেত বহরমপুরে তার সদ্য-কেনা বাড়ীর শয়নপ্রকোষ্ঠে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শায়িত যূথীর মত শুভ্র একটি নারীমূর্ত্তি—উর্ম্মিলার। কিন্তু দণ্ডকারণ্যে নির্ব্বাসিত লক্ষ্মণের চাইতেও সে তখন নিরুপায়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও হিরণের ডাক-বাংলোতে ফিরে মুগের ডালের সুরুয়া হতে শুরু করে মুর্গীর রোস্ট পর্য্যন্ত গলাধঃকরণ ক'রে নিঃসঙ্গ শয্যায় তপ্তদেহে ও বিক্ষুব্ধমনে শুয়ে শুয়ে বাতায়ন-পথে আকাশের তিমির-মহিমা প্রত্যক্ষ করা ছাড়া তার আর কিছু করবার ছিল না।

জ্যোৎস্না উঠলে এক-একদিন সে মাঝ রাত্রে উঠে নিঃশব্দপদসঞ্চারে বেরিয়ে পড়ত, যদি সেই পুরাতন প্রাসাদের শূন্য প্রকোষ্ঠে কোনও অসম্ভবের দর্শন মেলে, গঙ্গাতীরের সেই ছায়া যদি শুস্তার তীরে এসেও তাকে ছলনা করে! কিন্তু বৃথা, হঠাৎ-বিপন্ন চামচিকা আর আরসোলারাই শুধু চঞ্চল হ'য়ে মাথার উপর উড়তে থাকে, নিজের পায়ের শব্দের প্রতিধ্বনি নিজেকে প্রতারিত ক'রে যায়, শিশিরস্নাত হয়ে বাড়ি ফিরে সকলের অজ্ঞাতসারে শুয়ে পড়া ছাড়া আর কিছু করবার থাকে না।

হিমাদ্রি অস্থির হয়ে উঠতে লাগল। হিরণ ও মাধবীর সঙ্গও যেন তার নিঃসঙ্গতাকে বাড়িয়ে তুলছে; তারা পরস্পর পরস্পরকে নিয়ে পরিপূর্ণ—এমনই পরিপূর্ণ যে, বাইরের তৃতীয় ব্যক্তি এখন তাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক, হয়তো বা বাধাই। এদের জীবনযাত্রা দেখে ছায়াবিলাসী মন তার কামনাকাতর হয়ে উঠতে লাগল, কিন্তু কলকাতায় বা বহরমপুরে ফেরবার মুখ নেই। ফলে সে একদিন শুভ প্রভাতে উঠে সোজা পাড়ি দিল বোম্বাইয়ের দিকে এবং সেখান থেকে জাহাজে চেপে লণ্ডন। শুধু মনের অস্থিরতাকে দমন করাই এই যাত্রার উদ্দেশ্য, পি-এইচ-ডি ডিগ্রীর লোভ নয়।

মায়ের কান্নাকাটি সত্ত্বেও ব্রজেন্দ্র হিমাদ্রির কোনই খোঁজ করে নি, তার

অপমানবোধ একটু বেশি। মা তলে তলে খোঁজ পেলেন; হিরণের চিঠিতেই জানলেন ছেলে বিলেত গেছে। মায়ের প্রাণ কতকটা নিশ্চিন্ত হ'ল।

আর উর্ম্মিলা? তার পরীক্ষা সন্নিকট, পাঠ্য বইয়ের পাতাগুলি ছাড়া আর কোনও কিছু সম্বন্ধে ভাববার তার অবসর ছিল না, অন্তত বাইরে থেকে তাই মনে হত। কিন্তু অন্তর্য্যামী ভিন্ন ইতিহাস সংগ্রহ করেন, তিনি জানেন, রাত্রি যখন গভীর, মনের আবিলতায় পড়ার বইয়ের পাতা যখন চোখে ঝাপসা ঠেকে, সুইচটি তুলে দিয়ে অন্ধকার বাতায়নে এসে সে দাঁড়ায়, তখন মমসেনের ইতিহাস বা হব্‌সের পলিটিক্‌স আর অন্তরাল রচনা করে না, বিপুল পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তেই হিমাদ্রি থাক্, তার মন যায় ততদূর পর্য্যন্ত ছুটে। দূরত্বটা কত তা সে জানে না, জানতে চায় না। হোক না বোম্বাই, লণ্ডন হ'লেই বা কি ক্ষতি!

বাইরের লোকে অনেকে অনেক কথা বলে, বন্ধুরা হিমাদ্রির নামোল্লেখ করেই ঠাট্টা করে, তাতে তার কি এসে যায়! পত্রপুষ্প পর্য্যন্তই তাদের দৃষ্টিগোচর, কিন্তু কোন্ অন্ধকার মৃত্তিকাগর্ভ হতে শিকড় জীবনীরস সংগ্রহ করে, তা তারা জানে না। হিমাদ্রি তাকে উপেক্ষা করেছে, তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে দেশছাড়া হয়েছে, এ মন্তব্যগুলির কোনও মূল্য নেই তার কাছে, হিমাদ্রিকে স্মরণ ক'রে বিনিদ্র অন্ধকার শয্যায় সে যে জীবনের খোরাক সংগ্রহ করে।তাদের তা জানবার কথা নয়।

সত্যই উর্ম্মিলা হিমাদ্রিকে ভালবাসতে আরম্ভ করেছিল, এর জন্যে তাকে কোনও প্রয়াস করতে হয় নি, উল্টোরকমের মনোভাবের উৎপত্তি হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু যে দেবতা অন্ধ, চক্ষুষ্মান্ লোকেদের মত পৌর্ব্বাপর্য্য ভেবে কাজ করা তার স্বভাব নয়, যে সম্পূর্ণ অযোগ্য তারই জন্যে কেন যে মনটাকে ব্যথিত ক'রে তোলে প্রত্যক্ষ দেখলেও সেটা বুঝে উঠতে পারি না।

এক বছর পরের কথা বলছি। উর্ম্মিলা ফার্স্ট ক্লাস অনার্স পেয়ে বি-এ পাস করেছে। ইতিমধ্যে যে তার বিয়ের সম্বন্ধ এক-আধটা আসে নি তা নয়। বরঞ্চ তার পক্ষে সম্বন্ধের ঘনঘটাযোগই ঘটেছিল। কিন্তু বাপ-মায়ের করুণ কাকুতিও তাকে বিচলিত করতে পারে নি; সে অন্তত আপাতত বিয়ে করবে না, এটাই ঠিক ক'রে রেখেছিল। নানাজনে নানাধরনের জল্পনাকল্পনা করলেও আসল কারণটা কেউই ঠাহর করতে পারে নি। তর্ক করতে করতে হেরে গিয়ে মা কেঁদে ফেলে বলেছিলেন, তোর যা খুশি কর্ বাপু, ধিঙ্গি হয়ে আমার চোখের সামনে থাকবি, সেটা সইতে পারব না ব'লেই না এই ধরপাকড়। মোহিত ছেলেই বা এমন নিন্দের কি! এই অল্প বয়সেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট্, ঠাকুরপোরই হায়ার অফিসার। উর্ম্মিলা বলেছিল—ধিঙ্গি হয়ে থাকাটা সইতে না পার মা, দূরে স'রে যাচ্ছি। নিজের দুমুঠো অন্নের সংস্থান ক'রে নিতে পারব, এমন শিক্ষা তোমরা আমাকে দিয়েছ।

বাবা বলেছিলেন, যা খুসী করুক গে, নিজেকে সামলে নিয়ে বেড়াবার ক্ষমতা আশা করি ওর আছে। না থাকলেই বা করছি কি, বিয়ে ক'রে জামাইয়ের আশ্রয়ে থেকেও তো অনেক মেয়ে জলে ঝাঁপ দিচ্ছে! ম্যাচমেকার অমূল্যরত্ন কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি করে নি, একটার পর একটা টোপ সে ভাইঝির সামনে ফেলে চলেছিল, কেউ এস-ডি-ও, কেউ ডি-এস-পি। কোনটিই কিছু সুবিধা ক'রে উঠতে পারেন নি।

শেষটা উর্ম্মিলা সত্যিসত্যিই নিজের পথ দেখলে। পুনার একটি নারী-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একটা ভাল চাকরি জুটিয়ে বাপ-মার আশ্রয় আর ম্যাচমেকার খুড়োর উৎপীড়ন এড়িয়ে সেখানে স্কুলসংলগ্ন বোর্ডিঙেই ঘর বাঁধল। ছোট ছোট অসহায় বালিকাদের ঘিরে তার মন যেন একটা অবলম্বন খুঁজে পেলে, কিন্তু হিমাদ্রি জানতেও পারলে না যে যার ছায়ামূর্ত্তি একদা আসন্ন শীতের নিশীথে তাকে হঠাৎ বিভ্রান্ত ক'রে তুলেছিল, সেই উর্ম্মিলাই আজ

নিঃসঙ্গ প্রবাসে তারই চিন্তায় কায়াকে ছায়া করবার তপস্যা করছে। সে যখন বেজওয়াটারের কাফিখানায় 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী'-সখীর কপোলের পেলবতা নিয়ে গবেষণা করছে, বাতায়নের ধারে ব'সে অন্ধকারে-মিলিয়ে-যাওয়া পাহাড়ের দিকে চেয়ে উর্ম্মিলা তখন বহুদূরাগত একটা হারানো আহ্বান ফিরে পাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করছে—কে? তুমি কে?

উর্ম্মিলা খবর পেয়েছিল, হিমাদ্রি বিলেত গেছে, সেখান থেকে ফিরলেও সে যে কলকাতায় বা বাংলা দেশে ফিরবে না, এটাও সে আন্দাজে বুঝতে পেরেছিল। তাই সে কলকাতাতে একটা ভাল চাকরি পাওয়া সত্ত্বেও পুনার চাকরিটাই নেওয়া সাব্যস্ত করেছিল। বিলেত থেকে ফিরে যদি সে কোনও দিন আসে, বোম্বাইয়ের কাছাকাছি কোথাও বাসা বাঁধবে নিশ্চয়। হয়তো কোনও দিন তার সঙ্গে দেখা হ'লেও হতে পারে—এই চিন্তায় আনন্দে তার বুকের রক্ত তোলপাড় হয়ে না উঠলেও দেহটা উত্তপ্ত হয়, বোম্বে-দেশীয় ছোট্ট একটা ছাত্রীকেই সজোরে বুকে টেনে নিয়ে বাংলাতে জিজ্ঞেস করে, আমাকে তুই ভালবাসবি চন্দ্রা? চন্দ্রা ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকে।

এতদিন দাহ ছিল না, আগুনের দাহিকা-শক্তি প্রতিদিন বেড়ে চলেছে —সঙ্গিনীর অভাবে নিজের মনটা পুড়ে ছারখার হতে লাগল। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের চতুঃসীমানায় যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ ভারবাহী গর্দ্দভের মত সহজ সরলভাবেই জীবনটাকে গ্রহণ করে, বৈচিত্র্য যে কিছু থাকে না তাও নয়, কমিটির সেক্রেটারি, একজন উচ্চশিক্ষিত মারাঠী যুবক—তার লুব্ধ দৃষ্টি সদাসর্ব্বদা তাকে সশঙ্কিত ক'রে ফেরে, এবং এই চতুঃসীমানার বাইরে নাম-ধাম-না-জানা অসংখ্য বৃদ্ধ-প্রৌঢ়-যুবক-বালক-সম্প্রদায় মুগ্ধ ও লুব্ধ দৃষ্টি দানে তাকে অপ্রতিভ করতে ছাড়ে না। উর্ম্মিলা মনে মনে হাসে আর ভাবে, এই স্থূল সংসারে শুধু ছায়াকে আশ্রয় ক'রে হয়তো বা পুরুষেরা

চলতে পারে, কিন্তু একজন নারীর পক্ষে সহজ জীবন-যাত্রায় কায়ার আশ্রয় একান্ত আবশ্যক এবং সে কায়া যত স্থূল ও মাংসল হয় ততই ভাল।

এই মুগ্ধ ও লুব্ধ ভক্ত-সম্প্রদায়ের একজন ছিল শিরীষের আঠার মত নাছোড়বান্দা—পুনারই এক সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ীর পুত্র, নাম সৈয়দ স্থলেমান। বাপের অগাধ পয়সার খানিকটা সে নারীশিক্ষার কার্য্যে ব্যয় করত এবং ও-অঞ্চলে এইটাই প্রচার ছিল যে, যে-সব হতভাগিনী নারী একবার সৈয়দ স্থলেমানের নজরে পড়েছে, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে কোথাও তার নিস্তার নেই। অসংখ্য গুণ্ডাপ্রকৃতির লোক তার হাতের মুঠোয়, পুলিস তার কাজে বাধা তো দেয়ই না, বরঞ্চ সাহায্য করে।

উর্ম্মিলা প্রথমটা বিনা নোটিসে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মালীর হাত দিয়ে উপহারের উপর উপহার পেতে লাগল—ফুল, ফল এবং আরও বিচিত্র জিনিস সব, স্থবাসিত গন্ধদ্রব্য আরও কত কি। উৎকোচে মালীর মুখ বন্ধ, সে বলে এক সাহেব রোজ এসে দিয়ে যায়। কর্ত্তৃপক্ষকে জানাবে কি না ভাবতে ভাবতেই উপহারের বদলে স্বয়ং উপহারদাতার আবির্ভাব হ'ল—শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কি-ভাবে হয় দেখবার জন্য দর্শক সেজে এসেছে। চোখে লুব্ধ দৃষ্টি—উর্ম্মিলা ঠিকই চিনলে, কিন্তু কাউকে কিছু বললে না। শুধু মালীকে সাবধান ক'রে দিলে, যদি সে এর পর কারও হয়ে কোনও জিনিস তাকে দিতে আসে, তা হ'লে তার চাকরি থাকবে না।

শ্রীমতী অম্বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আর একজন শিক্ষয়িত্রী—তার সঙ্গেই উর্ম্মিলার ঘনিষ্ঠতা। মনের কথা, স্থখের দুঃখের কথা হয়; ভালবাসার কথাও হ'ল একদিন এবং শেষে হিমাদ্রি আর সৈয়দ স্থলেমানের কথা উঠল। অম্বার জীবনও কম বিচিত্র নয়। বালবিধবা—স্বামীর স্মৃতি বুকে নিয়েই যে ব'সে আছে তা নয়, একজনকে ভালবেসেছে, কিন্তু সে তার ভালবাসার সম্পূর্ণ অযোগ্য, এত নীচ—তবু মন থেকে তাকে ঠেলে ফেলতে পারে না, সর্ব্বস্ব দিতেও পারে না।

সেদিন কিসের ছুটি ছিল—অলস দ্বিপ্রহরে শুয়ে শুয়ে জানলাপথে উর্ম্মিলা খানিকক্ষণ খণ্ড লঘু মেঘের খেলা দেখলে, তার মনটা কেমন উদাস হয়ে গেল। অম্বাকে ডেকে নিয়ে স্কুল-কম্পাউণ্ডের একেবারে শেষে দেবদারুগাছতলার বেঞ্চটাতে গিয়ে বসল। পাশের রাঙামাটি রাস্তা দিয়ে ধূলো উড়িয়ে ভারমন্থর গরুর গাড়ি চলেছে, তৈলহীন চাকায় একটানা কান্নার শব্দ, মাঝে মাঝে এক-আধটা মোটর গাড়িও হুস্ ক'রে চ'লে যাচ্ছে—তবু সর্ব্বত্র কেমন যেন একটা অবসাদের ভাব। একথা সেকথার পর অম্বা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে, আচ্ছা উর্ম্মিলা, হিমাদ্রি ফেরবার সময় অপ্সরীদের একজনকে যদি সঙ্গে নিয়ে আসে ?

এতদিন কাঁদি নি, তাতেও কাঁদতে বসব না বোন, সে যে আমার কতখানি, কোনদিন হয়তো তাকে তা জানাবার প্রয়োজন হবে না।

এতদিন তুমি কাঁদ নি বইকি—চোখের জলের দাগ যদি মুছে না যেত তা হ'লে বালিসের ওয়াড় আর বিছানার চাদরে তোমার ঘর বোঝাই হ'ত এতদিন। আচ্ছা, তুমি হিমাদ্রিবাবুকে চিঠি দাও না কেন ?

চিঠিতে লিখব কি ?

লিখবে—বঁধু, ফিরে এস, আমি তোমার প্রতীক্ষায় আছি।

এত সহজে যদি সে ধরা দিত বোন, তা হ'লে আর ভাবনা ছিল কি, আমি তাহলে এতক্ষণ এমন সুন্দর দুপুরে তোর সঙ্গে মিথ্যে হা-হুতাশ করেই বা মরব কেন ?

আমার না হয় উপায় নেই, পাপকে ভালবাসতে পারি, কিন্তু তাকে নিয়ে ঘর করতে পারি নে, কিন্তু তুমি কেন এমন ভাবে জীবনটাকে ব'য়ে যেতে দেবে ভাই ?

উর্ম্মিলা হঠাৎ শিউরে উঠল। পাপ ? হিমাদ্রি যদি সত্যসত্যই লণ্ডনে তার শুচিতা বিসর্জ্জন দিয়ে ফিরে আসে ? পাপের স্রোতে গা ঢেলে দেয় ? এ দুর্ভাবনাকে শেষ পর্য্যন্ত টানবার ক্ষমতা তার ছিল না। সে হঠাৎ উঠে

পড়ল, অম্বাকে বললে, ঘুম পাচ্ছে ভাই। অম্বা জীবন-যুদ্ধে উর্ম্মিলার চাইতে একটু বেশি এগিয়েছে, সে হাসলে।

*   *   *

আরও এক বছর। মধ্যে উর্ম্মিলা একবার কলকাতা ঘুরে এসেছে। ইচ্ছে করলে অমূল্যর সেই হায়ার অফিসার ছোকরা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে সে তখনও বিয়ে করতে পারত, কিন্তু সে ফিরে এল। ফেরবার সময় হিমাদ্রির মায়ের সঙ্গে বিনা ওজুহাতে সাক্ষাৎ ক'রে এল। ব্রজেন্দ্রের পত্নী একটু কৌতুক ক'রে বললে, উমার তপস্যা কি সফল হবে? তখনকার মহাদেবদের শুধু ষাঁড়ের পিঠ ছিল সম্বল—চেষ্টা করলেও বড় দূর ক্রোশ-খানেক পথ তিনি যেতে পারতেন, কিন্তু এখনকার মহাদেবদের বিচিত্র যানবাহন—মোটরকার, ট্রেন, জাহাজ। শ্মশানও একটা আধটা নয়—লণ্ডন, প্যারিস, নিউইয়র্ক। তার নাগাল পাওয়া মডার্ন-পার্ব্বতীর পক্ষে দুঃসাধ্য হবে না তো?

উর্ম্মিলা জবাব দেয় নাই, শান্তভাবে হিমাদ্রির মাকে প্রণাম ক'রে ফিরেছিল। এই বছরখানেক হিমাদ্রির কোনও খবর কেউই পায় নি, মাও না। কাউকে কোনও খবরও দেওয়ার মত মেজাজ তখন তার ছিল না; লণ্ডনের ইস্ট অ্যাণ্ড আর প্যারিসের ল্যাটিন কোয়ার্টারে সে তখন কাপ্তেনি করছে; ফ্যানি জোসেফাইনের কায়াবন্ধনে উর্ম্মিলার ছায়া বিলুপ্তপ্রায়। তবু মাঝে মাঝে এখনও যখন ভোরের দিকে বাড়ি ফিরে তলায়-এসে-ঠেকা মোমবাতিটা ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দেয়, মোমে-ভেজা পাকানো তুলো পোড়ার গন্ধে ঘরটি ভরে যায়—উর্দ্ধমুখী নীল ধোঁয়ার মধ্যে সে চকিতে সেই ছায়াময়ীর আভাস পায়, কিন্তু ক্ষণিকের জন্য, উদ্দাম রজনী-জাগরণের ক্লান্তিতে দেহ অবশ, ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে।

বোম্বাইয়ে তখন হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা চলেছে। নিখিল ভারতীয় নারী সম্মেলনের প্রতিনিধি হিসেবে উর্ম্মিলা বোম্বাইয়ে এসে আটকা প'ড়ে

গেছে। কিন্তু বোম্বাইয়ে সে একা নয়, ডিটেক্‌টিভ পুলিসের মত সৈয়দ স্থলেমান অলক্ষ্যে তার পাহারায় নিযুক্ত। যে বোর্ডিঙে সে বাসা নিয়েছে, সেটা একেবারে মুসলমান পল্লীর মধ্যে, স্থতরাং সৈয়দ স্থলেমানের শিকার প্রায় তার করতলগত। উৎকোচদানে বোর্ডিঙের ম্যানেজারকে বশ করা কঠিন নয়।

উদ্দামতার শেষ আছে, ব্যাঙ্কের টাকার অঙ্কও অক্ষয় নয়—পরিশ্রান্ত হিমাদ্রিকে জননী জন্মভূমি টান দিলেন; দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্যেই নিখুঁত সাহেবী পোশাক পরা হিমাদ্রিকে বোম্বাইয়ের রাজপথে দেখা গেল। সে একাই এসেছিল, কিন্তু একা থাকবার ক্ষমতাটাকে সে সাগরপারে বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছিল।

হিমাদ্রি যে বোর্ডিঙে আশ্রয় নিয়েছে সেটা ভদ্রপল্লীর মধ্যে নয়—এবং বোর্ডিঙের কামরা যাদের ভাড়া দেওয়া হয়, তারা নিছক শোওয়া বসা ছাড়া অন্য কার্য্যে সেগুলিকে ব্যবহার করে। মোটের উপর, ডিস্‌রেপুটেব্‌ল যাকে বলে বোর্ডিংহাউসটি সেই শ্রেণীর একটি।

সারাদিন নিষিদ্ধ অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে অনেক রাত্রে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় বাসায় ফিরে হিমাদ্রি বাইরের পোশাকেই বিছানায় আশ্রয় নিয়েছিল। বাতিটা নিবিয়ে দেবার কথাও তার মনে হয় নি। জুতোসুদ্ধ পা বিছানায় তুলে মাথার বালিশটাকে ঠেলে নীচে ফেলে দিয়ে নিজের বাহুকে উপাধান ক'রেই নেশায় ঘোরে সে চোখ বুজেছিল। আশে-পাশের কামরার হল্লা তখনও থামে নি। দূরের কোনও কামরায় তাসের জুয়া চলছিল, তাদের কলহ-কোলাহলে গভীর রজনীর স্তব্ধতাও লাঞ্ছিত; নীচে রাস্তায় তখনও দাঙ্গা চলছে—সোডার বোতল ফাটার শব্দ, আততায়ীর উল্লাসধ্বনি, আর্ত্তের আর্ত্তনাদ।

হিমাদ্রি ঘুমোয়নি, নেশার ঝোঁকে চোখ বুজেই দেখছিল, বহরমপুরে গঙ্গার ধারে নতুন কেনা বাড়ির দ্বিতলে সে শুয়ে আছে—সেই ছায়ার

প্রতীক্ষায়। চারিদিকের কলকোলাহল বর্ষাস্নাত গঙ্গার কুলুকুলু কল-স্রোতের মত শোনাচ্ছে, কোথায় যেন প্যাঁচা ডাকছে, দেউড়ির বটগাছটাতেই বুঝি। হিমাদ্রির হঠাৎ মনে হ'ল, কে যেন লঘু পদক্ষেপে ঘরে প্রবেশ করল। সেই তবে! ধড়মড় ক'রে উঠে বসে সে প্রশ্ন করলে, কে? তুমি কে?

যে এসেছিল সে উর্ম্মিলা, ছায়ারূপিণী উর্ম্মিলা নয়, রক্তে মাংসে গড়া উর্ম্মিলা। সৈয়দ সুলেমান তাকে ধ'রে এই বোর্ডিঙেরই এক কক্ষে আটক করেছিল; সে বহু কষ্টে সেখান থেকে বের হতে পেরেছে; হিমাদ্রির ঘরের দরজা খোলা ও ঘরে আলো জ্বলতে দেখে বিহ্বল মুহূর্ত্তে আত্মরক্ষ করবার জন্যে সে এই ঘরে ঢুকেছে। যদি সে জানত যে, তার বাঞ্ছিত সেখানে কর্দ্দমধূলায় বিলুণ্ঠিত, তা হ'লে হয়তো সে সৈয়দ সুলেমানের কবলে ফিরে যাওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে করত। ঘরে ঢোকবার সময় শয্যা-শায়িত হিমাদ্রিকে সে চিনতে পারে নি।

কিন্তু যে মধুর আহ্বান গত দুই বৎসর ধরে সে শয়নে জাগরণে শুনে আসছে, এই রুক্ষ বিশুষ্কতার মধ্যেই যা সঞ্জীবনীরসধারা সিঞ্চন ক'রে তার জীবনকে সরস ক'রে রেখেছে, সেই 'কে? তুমি কে?' আহ্বানকে তো সে ভুল করতে পারে না। সেই অস্বাভাবিক ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যেই উর্ম্মিলা অনুভব করলে যেন তার দুই কান দিয়ে গলিত মধুধারা তার মর্ম্মে প্রবেশ করল। বিস্ময় জড়িত কণ্ঠে উর্ম্মিলা চীৎকার ক'রে উঠল, তুমি? আপনি, হিমাদ্রিবাবু?

হিমাদ্রির নেশা ছুটে গেল। অপরূপ! একবার যে ছায়াময়ীকে প্রশ্নের উপর প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত ক'রেও সে জবাব পায় নি, সেই ছায়াময়ীই আজ প্রশ্ন করছে, হয়তো তাকে ধরাছোঁয়াও যায়। মুখে মদের গন্ধ যেন তাকে কষাঘাত করতে লাগল। নিমেষের মধ্যে বোম্বাইয়ের কলকোলাহল, লণ্ডন-প্যারিসের ফ্যানি জোসেফাইনের দল, গত দুই বৎসরের উদ্দাম জীবনযাত্রা,

সব কিছুই যেন রাত্রিতে দেখা স্বপ্নের মত মিলিয়ে গেল। বিছানা ছেড়ে সে উঠে দাঁড়াল, চোখ নীচু ক'রে প্রসারিত দক্ষিণ করতলে বেপথুমতী উর্ম্মিলার করতল চেপে ধ'রে বিস্মিত ব্যথিতকণ্ঠে সে বললে, কে, উর্ম্মিলা? তুমি এখানে!

ছায়া এবার মিলিয়ে গেল না। উষ্ণ করতল আর্দ্র হয়ে উঠল। ব্রজেন্দ্র কি এই করতলেরই পেলবতা অনুভব ক'রে এসেছিল? ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের কবিতার চারটি লাইন ও বাংলাতে শুধু উর্ম্মিলা নাম লিখেছিল কি এরই করাঙ্গুলিধৃত লেখনী? কিন্তু ছায়া ভেঙে পড়ছে, ধূলিলুণ্ঠিত হবার পূর্ব্বেই তাকে বাহুপাশে বন্ধন ক'রে হিমাদ্রি নিজের পরিত্যক্ত শয্যায় শুইয়ে দিলে। আলো নিবে গেল।

মুখ থেকে মদের গন্ধ, মাথায় ফেল্ট হ্যাট, গায়ের বিলিতি স্যুট ও মনের গ্লানি যখন দূর হয়েছে, হিমাদ্রি তখন অরালী-পর্ব্বত-পাদমূলে শীর্ণ স্বচ্ছ-তোয়াবিধৌত বরীচের ডাকবাংলোতে। হিরণকুমারের পত্নী মাধবী চায়ে চিনি মেশাতে মেশাতে কলহাস্যের সঙ্গে তাকে প্রশ্ন করছে—কি ঠাকুরপো, সব ঝুট্ হ্যায়? উর্ম্মিলা পাশের ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে সেদিনকার বোম্বে ক্রনিক্‌লে দাঙ্গার খবর পড়তে পড়তে আড়চোখে হিমাদ্রির দিকে চাইছে—ছায়া-মূর্ত্তি যেন! সৈয়দ সুলেমানের কোনও খবর নেই, নিখিল ভারতীয় নারী সম্মেলনের অধিবেশনেও শেষ হয়ে গেছে—অন্তত রিজাইন দিয়ে আসবার জন্যেও এবার পুনায় ফিরতে হবে।

আর "ক্ষুধিত পাষাণে"র দেশ নয়। স্থূল ও মাংসল, লজ্জা ও ঘৃণা, জর আর জরার সমষ্টি হলেও কায়া ছায়াকে অতিক্রম করলে। নবদম্পতি যখন বহরমপুরের ভুতুড়ে বাড়িতে পৌঁছল, অমূল্যরত্ন তখন নওগাঁয়ে বদলি হয়েছে—তার হায়ার অফিসারটিও।

দুইদিক

এক

দুর্দ্দশাতাড়িত অসহায় অবস্থায় তখন সবেমাত্র কলিকাতায় আসিয়াছি। গাঁয়ের লোক ভরসা দিয়াছে, কলিকাতা আজব শহর—সেখানে 'ছলে বলে কলকৌশলে পয়সা উড়ে যায়।' জাল পাতিতে পারিলেই হইল; শুধু গুটাইয়া লওয়ার অপেক্ষা মাত্র। প্রচুর আশ্বাস পাইয়া এখানে আসিয়াই প্রথম দুই দিনেই সূচীবিদ্ধ বেলুনের মত চুপসিয়া গেলাম। কলিকাতার উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম প্রায় একবার টহল দেওয়া হইল। দৈনিক সাতখানি কাগজের হেড অফিসের সামনে দাঁড়াইয়া নিখরচায় বিজ্ঞাপন দেখিয়া কোথাও দারোয়ানের তাড়া, কোথাও বাবুর মুখভ্যাংচানি এবং দুই এক জায়গায় সাহেবের আশ্বাস পাইলেও আজিও শিয়ালদহ স্টেসনে শয়ন করিতে হয়। সম্প্রতি রাজাবাজারের বিখ্যাত গুঁইবাবুরা আশ্বাস দিয়াছেন একটা ভাল-গোছের চাকরি দিবেন। আমাকে রোজ ভোর ছয়টার সময় বাবুদের বাড়ি হাজির হইতে হয়; রাত্রি দশটায় ছুটি পাই। মধ্যে বেলা একটার সময় পাশের হোটেল হইতে নগদ তেরোটি পয়সা দিয়া ভাত খাইয়া আসি। বাবুদের একটা নূতন বাড়ি উঠিতেছে; আমাকে তাহার তদারক করিতে হয়, আর কুলীদের হিসাবপত্র সব টুকিয়া রাখি। একদিন বাবুকে বলিলাম, সার্, আমার একটা ব্যবস্থা করুন; শিয়ালদা স্টেশনে থাকা আর পোষাচ্ছে না। ট্যাঁকের পয়সাও তো ফুরিয়ে এল। বাবু বলিলেন, ওহে দিনকাল তো জান! চাকরি কি আর মুখের কথা! আমার বাজার-সরকার হবার জন্যে সেদিন তেরো জন এম-এ এপ্লাই করেছিল; তার মধ্যে তিনজন হনার গ্রাজুয়েট! আরও কিছুদিন কষ্ট ক'রে থাক, তোমার চরিত্তির বুঝি, তারপর ব্যবস্থা করা যাবে।

দিন কয়েকের মধ্যেই হাতের সামান্য রেস্ত ফুরাইয়া যাইবে, ভয়ে হোটেল ছাড়িয়া ছাতু খাইতে ধরিলাম। বাবুকে জানাইলাম। বাবু বলিলেন, হবে, হবে, বিবেচনা করব।

সেদিন ছাতুর পয়সা ফুরাইয়া যাওয়াতে একেবারে নিরম্বু হরতাল পালন করিয়াছিলাম। বেলা আড়াইটা, রোদ ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। বাবু একটা ছাতা মাথায় দিয়া খালি গায়ে ভুঁড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে আসিয়া বলিলেন, কি হে কেবলরাম, কদ্দুর? না বাপু, তুমি কোনও কাজের নও—আজও ভিতটা তোলাতে পারলে না—কুলীরা খুব ফাঁকি দিচ্ছে বুঝি! অনাহারে ও রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেলেও চাকরির লোভে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে গাধা-বোটের মত বাবুর পিছন পিছন ঘুরিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে বাড়ির ভিত দর্শনে গর্ব্বস্ফীত হইয়া বাবু খোস মেজাজে জিজ্ঞাসা করিলেন, হ্যাঁ হে কেবলরাম, প্লেনটা (plan) কেমন হয়েছে বলত? আমার মেজো শালার মেজো ছেলে এই প্লেন করে দিয়েছে। খাঁটি বিলেতফেরত ইঞ্জিনিয়ার হে—তার বউও এণ্টান্স পাস। তিনি তাহার পর এই অভুক্ত দরিদ্রের কাছে তাঁহার ঐশ্বর্য্যের চিহ্নস্বরূপ গৃহের প্ল্যানটি বিশদভাবে বুঝাইতে লাগিলেন।—এই এইখানে রান্নাঘর, এই মডার্ন ফেসিয়ানে চানের ঘর—বাথরুম হে বাথরুম। সামনের তিনটে ঘর দোকানের জন্যে ভাড়া দিলে কোন্ না দেড়শো টাকা মাসে পাওয়া যাবে! দোতলার দক্ষিণ-খোলা ঘরটা হবে গিন্নীর, আর পূবের ঘরটা অতুলের! অতুল আমার মেজো ছেলে—ফাষ্ট ক্লাসে পড়ে—ছড়াটড়া বেশ লিখতে পারে। এই দিকটায় একটা বাগান করা যাবে, ওদিকটায় ইত্যাদি ইত্যাদি। শূন্য উদরে আড়াই ঘণ্টাকাল বাবুর পিছন পিছন ঘুরিয়া আমার মাথা বোঁ বোঁ করিতেছিল। চোখের কোণে একটু জলও আসিতেছিল। আমি দাঁড়াইতে না পারিয়া এক স্থানে বসিয়া পড়িলাম, বাবু আগে চলিতে চলিতে—বুঝেছ কেবলরাম, বলিয়া পিছন ফিরিয়া

আমাকে ওইভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন না বাপু, অমন আয়েশী লোক দিয়ে আমার চলবে না। কি হে, বালিশ চাই নাকি ?

ওই কথা শুনিয়াই আমার মাথায় খুন চাপিয়া গেল, আমি হিতাহিত ভুলিয়া বেগে ছুটিয়া গিয়া বাবুর স্ফীত উদরে পদাঘাত করিয়াই উত্তেজনায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম।

তাহার পর দিন সতেরো খাওয়া ও থাকার জন্য ভাবিতে হয় নাই।

দুই

জেল হইতে ফিরিবার পর একদিন ছিন্ন বেশে দরিদ্র ভিখারীর মত সারকুলার রোড ধরিয়া চাকরির খোঁজে চলিয়াছি, পথে এক স্থানে হঠাৎ নিজের নাম শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। দেখিলাম এক চায়ের দোকান হইতে কার্ত্তিকবাবু বাহির হইয়া রাস্তায় দাঁড়াইলেন। কার্ত্তিক-বাবু আমাদের গ্রামের লোক। খাঁটি কবি। পেশা কেরানিগিরি। অত্যন্ত দরিদ্র হইলেও কবিতা আর বনিতা লইয়াই ভরপুর আছেন। গ্রামে থাকিতে অনেক সন্ধ্যাই উঁহার সঙ্গে কাব্যচর্চ্চায় আনন্দে কাটাইয়াছি। কাছে আসিতেই 'কি হে কেবলরাম ভায়া' বলিয়া একেবারে আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন। আমার জীর্ণ বেশ লক্ষ্য করিয়া বলিলেন কি হে, কবিতাদেবী তোমার স্কন্ধেও ভর করলেন নাকি? আমি আগাগোড়া সমস্ত খুলিয়া বলিলাম। তিনি ব্যথিতচিত্তে বলিলেন, তুমি আমার ওখানে যাও নি কেন ভাই! আড়াইজনের পেট যদি ভরে, তবে সাড়ে তিনজনের পেটও ভরবে। দোকানে উপবিষ্ট তাঁহার বন্ধুদের নিকট বিদায় লইয়া আমাকে হিড় হিড় করিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন।

অত্যন্ত এঁদো গলিতে একটি জীর্ণ বাড়ি। তেতলায় দুটি মাত্র ঘর। আর একটি নামমাত্র রান্নাঘর। দুইটি ঘরের মধ্যে একটিকে ঠাকুর-ঘর বলিলেও চলে। সেইটি কার্ত্তিকবাবুর বৈঠকখানা। তাঁহার আদরের

পুত্র 'বাবা বাবা' বলিয়া তাঁহার কাছে আসিয়াই আমাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। কার্ত্তিকবাবু তাহাকে কোলে লইয়া আমাকে তাহার কাকাবাবু বলিয়া পরিচয় করিয়া দিলেন। গিন্নীকে ডাকিয়া বলিলেন, ওগো, আজ আমাদের অতিথশালা সরগরম। আমরা গিয়া বৈঠকখানায় বসিলাম। বাড়ির চতুর্দ্দিকের জীর্ণ শীর্ণ অবস্থা দেখিয়া লজ্জিত হইতেছিলাম, —এই দুঃস্থ পরিবারের ঘাড়ে বোঝা হইয়া থাকা! আমি অবিলম্বে প্রস্থান করিবার উপায় খুঁজিতে লাগিলাম।

হাত মুখ ধোওয়া হইলে কার্ত্তিকবাবুর গিন্নী তিনটি রেকাবিতে মুড়ি, কিছু মটরশুটি ভাজা, দুই টুকরা পাঁপড়-ভাজা এবং একটু মোহনভোগ আনিয়া আমার সামনে ধরিলেন। আমি বলিলাম, আরে, এ যে রাজ-ভোগ! কার্ত্তিকবাবু বলিলেন, গরিবের মুড়িই রাজভোগ। ও কিন্তু ঠিক মুড়ি নয় ভায়া, ও হচ্ছে ভাজা মুড়ি। সত্যসত্যই দেখিলাম গোল-মরিচ গুঁড়া দিয়া অত্যন্ত উপাদেয় করিয়া ভাজা মুড়িকে ভাজা হইয়াছে; জেলখানার কদর্য্য খানার পর শূন্য পেটে ওই সুখাদ্য খাইয়া অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইলাম।

আমার খাওয়া শেষ হইলে কবিগিন্নী অন্তরাল হইতে চিরাচরিত প্রথায় কবিকে ডাকিলেন। আস্তে আস্তে কথা হইলেও আমি শুনিতে পাইলাম। ঘরে তিনজনের উপযুক্ত চাল নাই—অতিথিকে পাতিয়া দিবার মত বিছানাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। কার্ত্তিকবাবু একগাল হাসিয়া বলিলেন, আরে, নাই তার হবে কি? মুড়ি আছে তো? না হয়, দুজনের ভাত তিনজনে ভাগাভাগি ক'রে বেশ খাওয়া যাবে। আর বিছানা? আমার বিছানাটাই ওই ঘরে পেতে দাও। আমরা তো মাদুরেই শুই। হাসিতে হাসিতে আমার কাছে আসিয়া বলিলেন ভায়া, তোমার বউদি কি বলছেন শুনেছ? দেখিলাম, দারিদ্র্য অমন মানুষকে দমাইতে পারে না।

কার্ত্তিকবাবু বলিলেন, ভায়া, গিন্নী রান্না করুন, আমরা ততক্ষণ একটু কাব্যচর্চ্চা করি—খোকা ঘুমিয়েছে। তিনি তাঁহার দপ্তরপত্র টানিয়া বাহির করিতে লাগিলেন।

কার্ত্তিকবাবু পঁয়তাল্লিশ টাকা মাহিনার সামান্য কেরানী; মাসে পনের টাকা তাঁহার ঘর ভাড়াতেই লাগে। আজ মাসের ২৯এ তারিখ, হয়তো কাল কি করিয়া রান্না চড়িবে তাহার ঠিক নাই; সেই লোক একটি স্থায়ী অতিথিকে ঘরে আনিয়াও নিরুদ্বেগে কবিতা শোনাইতে বসিলেন! ধন্য কবিতাদেবী!

কবিতার পর কবিতা শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলাম। সহসা অন্তরাল হইতে কার্ত্তিকবাবুর গিন্নীর ইশারা আসিল। রান্না হইয়াছে। কার্ত্তিকবাবু বলিলেন, যাও, তুমি ভাত দাও গিয়ে, আমরা যাচ্ছি।—বলিয়াই তাঁহার গম্ভীর গলায় পড়িতে লাগিলেন—তাঁহারই একটি কবিতা। দরিদ্র কবির সেই অদ্ভুত উচ্চাভিলাষ ছন্দোবদ্ধভাবে এখনও আমার কানে বাজিতেছে—

জানি না সুমুখে ওই রাজপথ গেছে কত দূরে
নাহি জানি ওই নীল পাহাড়ের কোথায় সীমানা,
শুধু জানি সূর্য্যকর ভালবাসে মানুষ-বন্ধুরে
আকাশের তারা তারে অজানার জানায় ঠিকানা।
যে জন শুনেছে বাণী কভু তার পথ না ফুরায়,
ভাষা যে শুনেছে কানে পথ তারে নিল সঙ্গী ক'রে,
পূর্ব্ব ও পশ্চিম তারে অনুক্ষণ ডাকে ইশারায়,
সে দেখে পথের রেখা সিন্ধুনীরে শূন্য নীলাম্বরে।
নদী তারে ডাক দেয়—নহে মাত্র জলকলধ্বনি,
ডাক দেয়, নাহি দেয় কোনো দিন সাগর-সন্ধান,

দিগন্তে বিলীন পথ ডাক দেয় দিবস-রজনী,
ডাক দেয় মুক্তকণ্ঠ বিহগের মধু কলতান।
দূরে দীর্ঘ চক্রবাল ছুঁইয়াছে ধরণীর দেহ
ধরার পরশ পেল চেয়ে দেখি দিকচক্রবাল,
আমারে ঘিরিয়া আছে অতি স্থূল মৃত্তিকার স্নেহ,
আমারে ধরিয়া আছে যুগান্তের মানব-কঙ্কাল।

শুনিতে শুনিতে ভুলিয়া গেলাম, আমি দরিদ্র, দরিদ্রের সহবাসে রহিয়াছি; ভুলিয়া গেলাম, কল্য প্রাতেই আমাকে চাকরির জন্য পথে পথে অপমানিত হইয়া ফিরিতে হইবে, কানে শুধু বাজিতে লাগিল—

আমারে ঘিরিয়া আছে অতি স্থূল মৃত্তিকার স্নেহ,
আমারে ধরিয়া আছে যুগান্তের মানব-কঙ্কাল।

পরিতৃপ্ত হইয়া সেই শাকান্ন আহার করিলাম, উদ্বেলিত মনে যখন শয়ন করিতে গেলাম, বার বার শুধু এই কথাই মনে হইতে লাগিল যে, এই মহাপ্রাণ দরিদ্রদের সত্যসত্যই অর্থের এবং শুঁইবাবুর মত হৃদয়-হীনদের জন্য অনর্থের প্রয়োজন আছে। সেই রাত্রে মনে মনে অর্থ ও অনর্থের জন্য প্রাণপণ করিব প্রতিজ্ঞা করিলাম।

উপকথা

হটেন্‌টট রাজ্য—বাইরে থেকে বেশ ধনজনসমৃদ্ধিপূর্ণ মনে হ'লেও দেশের এক দল লোকের মনে নিদারুণ অশান্তি। অশান্তির কারণ, দেশ আজ সাতশো বছর পরহস্তগত, বিদেশীর কবলে। চারশো বছর ছিল জাম্বেসী রাজ্যের হুঠান ও কুঠান সম্প্রদায়ের হাতে। তাদের শাসনে রাজ্য না থাকলেও তারা এদেশেই র'য়ে গেছে, কার্য্যত এদেশের লোক হয়ে। বিকৃত জাম্বেসী ভাষায় নিজেদের নাম রাখা, বিকৃত জাম্বেসী সাজ পরা এবং জাম্বেসীর বিকৃত ধর্ম্ম বিকৃত ভাবে অনুসরণ করা ছাড়া জাম্বেসীত্ব তাদের আর কিছুই নেই হটেন্‌টটীদের সঙ্গে রক্ত মেশামেশি হয়ে আড়াইশো থেকে তাদের সংখ্যা এখন আড়াই লক্ষ হ'লেও তারা নিজেদের হটেন্‌টট বলতে লজ্জা পায়। তারা এখনও ওদেশের রাজবংশধর ব'লে আস্ফালন করে এবং কথায় কথায় জাম্বেসীর কথা তুলে হটেন্‌টটীদের ভয় দেখায়। জাম্বেসীতে একটা কিছু ঘটলেই তারা জাব্বাজোব্বা এঁটে মাথায় জাম্বু টুপি প'রে সেখানকার দেবতা গিঠোলের নামে জয়রব তুলে তাল ঠুক্‌তে থাকে, আর মন্দিরে মন্দিরে প্রার্থনা করে। জাম্বুদের সঙ্গে এদের রঙে চেহারায় ও ভাষায় না মিললেও এক ধর্ম্মের বন্ধনে তাদিকে হটেন্‌টটীদের চেয়ে বেশি আপনার মনে করে। পূজোপার্ব্বণে নানা অছিলায় তাদের সঙ্গে গোলযোগ বাধিয়ে হল্লা করবার চেষ্টা করে এবং 'গিঠোলো গিঠ্‌কর' ব'লে সার বেঁধে জাম্বুয়ানা প্রচার করে।

জাম্বুদের পরে মাদাগাস্কার দ্বীপের লোক এখন এখানে রাজত্ব করছে। গম্বরীরা প্রথম ধর্ম্মপ্রচার আর ব্যবসা করতে ওদেশে আসে, তারপর অপূর্ব্ব গম্বরী ফন্দীতে এরা ক্রমশ হটেন্‌টটী আর জাম্বু—দুদলেরই একছত্র অধিপতি

হয়েছে। জাম্বুরা যেমন গায়ের জোরে হটেন্‌টটীদের নিজেদের ধর্ম্মে আনার চেষ্টা করেছিল, গস্করীরা তা না ক'রে নানা কৌশলে হটেন্‌টটীদের মধ্যে নিজেদের ভাষা ভাব ও সভ্যতা প্রচার ক'রে অতি অল্প দিনের মধ্যে দেশটাকে অনেকখানি গস্করী ক'রে এনেছে এবং ধীরে ধীরে হটেন্‌টট রাজ্যকে গস্কর রাজ্যের একটা উপনিবেশে পরিণত করবার মতলবও রাখে। এই অল্প দিনেই দেশটা অদ্ভুত বিদেশী চাল ধরেছে—তাই দেখে গস্করী শিক্ষায় শিক্ষিত হটেন্‌টটীরা ভীত হয়ে গস্করীচালের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছে। সভাসমিতিতে গস্করী ভাষাতেই গস্করীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলে। মোটের উপর গস্করীদের শাসনের বিরুদ্ধে দেশের লোক উঠে প'ড়ে লেগেছে—চারিদিকে ভাঙাগড়া ওলটপালট চলেছে।

এর মধ্যেই সুখে আছে জাম্বুরা। তারা মনে করে, দেশের নাড়ীর সঙ্গে তাদের কোনও যোগ নেই, তারা জাম্বু এবং খাঁটি জাম্বু—সুতরাং হটেন্‌টটীদের নিয়ে গস্করীরা কি করেছে না করেছে, তাতে তাদের কিছুই এসে যায় না; বিস্মৃত বাদশাহীর চুটকি খোরাক পেয়েই তারা সন্তুষ্ট; দেশের এতবড় একটা সম্প্রদায়কে সামান্য দু-একটা রুটির টুকরো ও পিঠচাপড়ানি দিয়ে স্বতন্ত্র রাখতে পারছে দেখে গস্করীরাও খুশি, কিন্তু এ খুশিতেও তাল কাটছে। হটেন্‌টটীদের লাঞ্ছনা দেখে এবং গস্করী শিক্ষা কিছু কিছু পেয়ে সাদর পিঠ-চাপড়ানি সত্ত্বেও দু-চারজন জাম্বু জাম্বুয়ানা ছেড়ে নিজেদের হটেন্‌টটী বলতে সঙ্কোচ করছে না এবং হটেন্‌টটীদের দেখাদেখি সভাসমিতি করে গস্করীদের শাসাতে শুরু করেছে।

মোটের উপর হটেন্‌টট রাজ্যের অবস্থা ভাল নয়। জাম্বুরা যখন রাজা ছিল, তখন তারা এদেশেই থাকত; ধর্ম্মের ওপর অত্যাচার হ'লেও অন্নের ওপর অত্যাচার হ'ত না। গস্করীদের রাজত্বে বাহ্যত ধর্ম্মের উপর অত্যাচার না হ'লেও ধনে প্রাণে দেশটা 'গজভুক্ত কপিত্থবৎ' হয়ে এসেছে। পুরানো নামডাকে বাইরের লোকে দেশটাকে সমৃদ্ধিশালী মনে ক'রে লোলুপ দৃষ্টি

দিচ্ছেও হয়তো, কিন্তু বছরে বছরে দুর্ভিক্ষ বন্যা লেগেই আছে—লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে ও রোগে মারা পড়ছে—হটেন্‌টটীদের গোলাশূন্য ক'রে মাদাগাস্কার প্রভৃতি বিদেশী রাজ্য ফেঁপে উঠল। এই সব দেখে শুনে দেশের লোক বড় ক্ষুব্ধ। প্রকাশ্যত কিছু করতে ভরসা না পেলেও গোপনে গোপনে অনেকে জটলা পাকাচ্ছে, দু-একটা লোক মাথা চাড়া দিয়ে আত্ম-বলি দিচ্ছে, কিন্তু কাজ কিছু হচ্ছে না। এক দল লোক বেশ সুখে আছে মনে ক'রেই সুখে আছে।

এমন যখন দেশের অবস্থা, তখন কোথাকার এক অজ্ঞাত পল্লীতে এক অখ্যাত লোকের গৃহে রাজপুত্রের জন্ম হল। রাজপুত্র বড় হলেন, গস্করী শিক্ষার মোহে উচ্চ শিক্ষালাভ করার জন্যে মাদাগাস্কার পর্য্যন্ত ঘুরে এলেন, গস্করীদের নানা বিপদে সাহায্যও করলেন, কিন্তু হঠাৎ একদিন রাত্রিশেষে অরুণোদয়ের মত তাঁর মনে দেশের মুক্তির জন্য বেদনা বোধ হ'ল। রাজপুত্র বললেন, সাজাও সৈন্য, দেশের জন্য আমি লড়াই করব।

কিন্তু সৈন্য কোথায়? যেদিকে চান, গস্করীদের চাকর, কেরানী, বাবুর্চ্চি, উকিল আর মোক্তার, পেটের চিন্তায় দেশাত্মবোধ লুপ্ত। রাজপুত্র ফাঁপরে পড়লেন।

আকাশে প্রসন্ন রৌদ্র, দয়ার্দ্র মেঘ, সবুজ গাছপালা—যা এতদিন রাজ-পুত্রের মনে দূরদেশের রাজকন্যার বিরহই ঘনিয়ে তুলত, হঠাৎ এক মুহূর্ত্তে সমস্ত মনে হ'ল নিরর্থক, নিজেরই রাজ্যে অভাগী দেশমাতা যেন রাক্ষসের রূপার কাঠির স্পর্শে ঘুমিয়ে আছেন। তাঁকে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে জাগাতে হবে; এখন রোদ নয়, মেঘ নয়, সবুজ পাতা নয়।

রাজপুত্র পদব্রজে বেরিয়ে পড়লেন—একা তাঁর সংগ্রাম, সঙ্গে কেউ এল কি এল না সে চিন্তা তাঁর নয়—তিনি একা চলবেন; কোথায়? যেখানে রাক্ষস তার দুর্ভেদ্য দুর্গে সোনার কাঠি রেখেছে লুকিয়ে, পাহারা দিচ্ছে হাজার হাজার ক্ষুদে ও বড় রাক্ষস। সোনার কাঠি চাই।

পথ চলতে চলতে রাজপুত্র অনুভব করলেন, তিনি একা নন। মূঢ় ভক্তেরা দলে দলে তাঁর সঙ্গ নিয়েছে, পথ চলতে চলতে তাদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। তাদের মুখে কথা নেই, শান্ত ক্লান্ত চরণে নির্ব্বাক বিস্ময়ে তারা চলেছে—কোথায় চলেছে, কেন চলেছে, তারা জানে না। রাজপুত্র আগে আগে চলেছেন ধীর পদক্ষেপে, অস্বাভাবিক দীপ্তি তাঁর চোখে—তারা তাঁরই অনুসরণ করবে। ঝড় উঠবে, রৌদ্র খরতর হবে, স্তিমিত তারাময়ী আকাশে অন্ধকার উঠ্‌বে ঘন হয়ে, বজ্র বিদ্যুৎ হয়তো মাথার উপর গর্জ্জন ক'রে যাবে; পথের কাঁকরে ও কাঁটায় পা যাবে ক্ষতবিক্ষত হয়ে। রাজপুত্র যদি উষার আভাস পেয়ে থাকেন, উষার আলোক তাদের স্পর্শ করবেই।

কৌতূহলী জনতা কাঁটা ও কাঁকর বাঁচিয়ে খানিকটা সঙ্গ নিলে, পিছিয়ে পড়ল। আবার নতুন দল। এরা ভক্ত নয় কিন্তু উৎকণ্ঠিত, অসম্ভবকে সম্ভব করতে চলেছেন রাজপুত্র; কেউ বলল—উন্মাদ, কিন্তু সকলের অজ্ঞাতসারে সকলের জোড়হস্ত মাথায় উঠল।

রাজপুত্র চলেছেন, পথে কবিশেখরের সঙ্গে দেখা—তিনি আসছিলেন উল্টো দিক থেকে, সঙ্কোচ ও লজ্জা তাঁর চোখে কিন্তু মুখে হাসি। রাজপুত্র স্নিগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে একবার কবিকে দেখে নিলেন। বললেন, কবিশেখর, তুমি এস, আমার যাত্রাপথে তুমি আমায় গান শোনাবে—পেছনের কোলাহলমুখর জনতাকে তুমি সুর দাও, তাদের চলা ছন্দে লয়ে সহজ হোক।

কবিশেখর চমকে উঠলেন, তাঁর বাঁশী হাত থেকে খ'সে প'ড়ে গেল। ক্ষীণ কণ্ঠে কবি বললেন, রাজপুত্র, আমি ক্লান্ত, সমস্ত বিশ্ব পরিভ্রমণ ক'রে এসে আমার পাখা পড়েছে ঝিমিয়ে, বুকে জোর পাচ্ছি না।

রাজপুত্র বললেন, বেশ, তবু আশীর্ব্বাদ কর—

কবি বললেন, আশীর্ব্বাদ করছি, কিন্তু তুমি ফিরে চল, রাজপুত্র! গঙ্করী আর হটেন্‌টট, জাম্বু আর গঙ্করী নিখিল বিশ্বে বড় কথা নয়। আরও

বড় কথা আছে ; নীল আকাশে সূর্য্য দীপ্তি দিচ্ছে, বাতাস ফুলের গন্ধ-মন্থর, তরুণের পেশীবহুল বাহুর দিকে চেয়ে তরুণীর বুক আজও ওঠে দুলে দুলে ; পাখী গান করে, প্রজাপতি রঙিন পাখা মেলে—

রাজপুত্র হাসলেন—কালো আকাশে তৃতীয়ার শশিকলা ! বললেন, কবি, এরা চিরকালের, চিরদিন থাকবে। কিন্তু আমার দেশমাতা—কারাগারে তাঁর দমবন্ধ হয়ে এল বোধ হয়, আমার সময় নেই কবি—

কবি বললেন, যাও রাজপুত্র, তোমার যাত্রা সফল হোক।

রাজপুত্র ততক্ষণ এগিয়ে গেছেন, নির্ব্বাক ভক্তের দল পিছু নিয়েছে।

গস্করী প্রধানদের দলের কাছে খবর গেল, রাজপুত্র পথে বেরিয়েছেন, লড়াই করবেন, কিন্তু হাতে অস্ত্র নেই, সঙ্গে সহস্র সহস্র হটেন্‌টটী চলেছে, কিন্তু কোলাহল নেই। বিস্মিত চকিত জাম্বুরা স্তব্ধবিস্ময়ে প্রহর গুনছে।

হুকুম হয়ে গেল, লাখে লাখে শান্ত্রী সেপাই ছুটল—পথ রুদ্ধ কর।

গস্করীপ্রধানরা জাম্বুপ্রধানদের কাছে ছুটলেন। আসন্ন বিপদ।

সেপাইশান্ত্রীর সঙ্গে কৌতূহলী জাম্বুজনতা—রাজপুত্রের পথ রুদ্ধ। জনতার সঙ্গে জনতার সংঘর্ষ। ধূলি উড়ল, কোলাহলে আকাশ মুখর—রাজপুত্রের সম্মুখে অবরোধ। দুই বাহু ঊর্দ্ধে তুলে রাজপুত্র বললেন, থাম, তোমরা ফিরে যাও, তোমরা অপেক্ষা কর। আমি একা যাব।

একা—তবু পথ রুদ্ধ। রাজপুত্র বললেন, বেশ, আমি তপস্যা করব।

বিমূঢ় জনতা আতঙ্কিত বিস্ময়ে প্রতীক্ষা করতে লাগল। রাজপুত্র ধ্যানে বসলেন।

একদিন যায়, দুইদিন যায়—আকাশে আলো ফোটে, অন্ধকার ঘনিয়ে আসে ; মুদ্রিতনেত্র রাজপুত্র পথের ধূলায় যোগাসনে উপবিষ্ট, শীর্ণ কলেবর প্রদীপশিখার মত ; কিন্তু স্থির, অচঞ্চল।

অকম্পিত প্রদীপশিখা স্তিমিত হয়ে আসছে, কিন্তু পৃথিবীতে কোথাও ঝড় নেই ; সমুদ্র ফুলে উঠছে না, নদীতে প্লাবন নেই ; গাছের পাতা

সবুজ, বাতাস স্নিগ্ধ, নদীজল স্বাদু। কিন্তু তবু যেন একটা চাপা হাহাকার, একটা আর্ত্ত বিলাপধ্বনি—দেবলোকে আগমনীর গান হয়তো।

গন্ধর্ব্বীরা বাইরে কঠিন, কিন্তু ভিতরে তাদের মুখে অন্ন রোচে না, জাম্বুরা পূর্ব্বপুরুষদের ধিক্কার দেয়।

* * * *

হঠাৎ কালো আকাশ দেবতার প্রসন্ন হাসিতে নীল হয়ে গেল; গন্ধর্ব্বীদের প্রতিনিধি এসে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত ক'রে বললে, রাজপুত্র, থাম।

কবিশেখর এলেন, বললেন, রাজপুত্র, আমি তোমার বন্দনাগান করব।

রাজপুত্র কবিশেখরের পদধূলি মাথায় নিয়ে শীর্ণ মুখে প্রসন্ন হাসি ছড়িয়ে বললেন, কবিগুরু, আজ আমার নবজন্ম, তোমার আশীর্ব্বাদ মাথা পেতে নিলাম। আবার আমার যাত্রাশুরু হ'ল।

আবার ধূলি উড়ল, দিগন্ত হ'ল মুখর। ধূসর অন্ধকারে কিছুই বোঝা গেল না।

কঙ্কা

রাজা-রাণীর আদরে-আবদারে রাজপুত্র বড়ো হতে লাগল। রাজ-বাড়িতে পাঠশালা বসল—রাজপুত্র পড়বে। দেশের সেরা পণ্ডিত এল; দেশ-বিদেশের কত রকমের বিদ্যা রাজপুত্র শিখতে লাগল। তার খেলাধূলোয়, হাসিতে, গানে রাজপুরী গমগম করত। হাতীশালে হাতী তাকে দেখলে শুঁড় দুলিয়ে উল্লাসে ডাক ছাড়ত, ঘোড়াশালে ঘোড়া চঞ্চল হ'ত।

রাজপুত্র যৌবনে পা দিলে। দেহে তার অমিত বল; মনে অসীম সাহস। সিংহের সঙ্গে খেলতে সে ভয় পায় না—উন্মত্ত জলস্রোতে অবাধে সে আপনাকে ছেড়ে দেয়। মৃগয়ায় তার সঙ্গীরা যেখানে আতঙ্কে শিউরে উঠত রাজপুত্রের সেখানে উল্লাস কত! খেলার আনন্দে সে এমনই মেতে উঠত যেন জীবনটার কোনই মূল্য নেই; তার বিক্রমে রাজা বিরক্ত হতেন, রাণী দেবতার কাছে মানত করতেন।

পণ্ডিত এসে বললে, মহারাজ, রাজপুত্রের শিক্ষা শেষ হয়েছে। আমার সাধ্যমত আমি তাকে শিখিয়েছি; তার পরীক্ষা হোক।

রাজা বললেন, বেশ। সভা বসল। রাজপুত্রের ডাক পড়ল। পণ্ডিত বললেন, বৎস, তোমাকে যে সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ক'রে দিলাম, রাজসভায় তার পরিচয় দাও।

রাজপুত্র বললেন, বেদ, পুরাণ, ব্যাকরণ, মীমাংসা, ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্রজ্ঞানকে আমি বিদ্যা বলি নে—তারা অবিদ্যা। তারা মনকে দুর্ব্বল এবং দেহকে অক্ষম করে। বীরত্ব, বিক্রম, তেজ ও দেহশক্তির চর্চ্চাকেই আমি বিদ্যা বলি। আমি সেই বিদ্যার পরিচয় দেব।

পণ্ডিত লজ্জিত, রাজা ক্ষুব্ধ ও অন্তরালে রাণী সন্ত্রস্ত হলেন। সভাসদেরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন। সভা ভঙ্গ হ'ল।

রাজা রাজপুত্রের সম্বন্ধে কথা বলেন না। রাণী গোপনে অশ্রু মোছেন। রাজপুত্র পূরোদমে মৃগয়া ক'রে ফিরতে লাগল, কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নেই।

রাণী অনেক ভেবে-চিন্তে একটি অনাথা মেয়েকে নিয়ে এলেন নিজের কাছে। তার নাম কঙ্কা। ঢলোঢলো ছোট্ট তার মুখখানি। একটি ব্যথিত দৃষ্টি কেন জানি না তার চোখে লেগেই থাকত, আদরে-অনাদরে সে দৃষ্টি সমান মধুর, সমান ম্লান।

রাজপুত্র তাকে দেখলে। মাকে জিজ্ঞাসা করলে, ও কে, মা।

রাণী বললেন, ও কঙ্কা।

রাজপুত্র আবার মৃগয়া করতে গেল।

হরিণ শিকার করতে গিয়ে হরিণের চোখের ব্যথিত চাউনি দেখে তার কঙ্কাকে মনে প'ড়ে গেল। শিকার করা হ'ল না।

অনুচরেরা হাঁপ ছেড়ে ভাবলে, কোথায়ও কিছু ঘটেছে।

রাজপুত্র বাড়ি ফিরে এসে ঘর থেকে আর বের হয় না। কেমন যেন অন্যমনস্ক। কারও সঙ্গে ভাল ক'রে কথা বলে না। কিন্তু তার চোখ কান থাকে সজাগ হয়ে। রাণী টের পেলেন। তাঁর ওষুধ ধরেছে দেখে খুশি হলেন।

কঙ্কা রাণীর মনের কথা বোঝে; লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে থাকে। কুমারের কাছ থেকে দূরে দূরে ফেরে।

তবু রাজকুমারকে তার ভাল লাগে।

সে কোন্ ছেলেবেলায় বাপ-মাকে হারিয়েছে। তাঁদের সে অনেক চেষ্টা ক'রেও মনে আনতে পারে না। তবু অস্পষ্ট তার মনে পড়ে

তার মায়ের সেবা। স্বামীর জন্যে সূর্য্যমুখী ফুলের মতন তিনি সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত মনকে সজাগ রাখতেন। তার বাবার তৃপ্তির হাসিটুকু সে কল্পনায় দেখতে পায়—আর অনুভব করতে থাকে, অদৃশ্য ঝরনার জলধারার মতন অবিশ্রাম তাঁদের স্নেহ ঝরছে তার মাথার ওপর। আজকাল শুধু শুধু সব পুরোনো বিস্মৃত স্মৃতি তার মনে জাগে। সে একলা ব'সে ভাবে।

একদিন রাজ-উদ্যানের মাধবী-কুঞ্জে ব'সে কঙ্কা এমনই ভাবছে। তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়েছে। দিনের ম্লান আলোক যাবার আগেও একটু স্নিগ্ধ প্রলেপ পৃথিবীর বুকে বুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল। কঙ্কার মনে কি যেন একটা ক্ষীণ আশা গিয়েও যেন যাচ্ছিল না।

রাজপুত্র আনমনে সেখানে এসে থমকে দাঁড়াল। কঙ্কা লজ্জিত ও শঙ্কিত হ'ল। রাজপুত্র ভাবলে, ফিরে যাই। কঙ্কার দিকে অনিমেষদৃষ্টিতে চেয়ে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে রাজকুমার হঠাৎ ডাকলে, কঙ্কা!

কঙ্কা উত্তর দিলে না।

রাজকুমার বললে, অপরিচয়ের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের যে বেদনা, আমার মনে সে বেদনা আমি অনুভব করছি। ছেলেবেলা থেকে যেসব জিনিস আমার চোখে অমূল্য ছিল, আজ তাদের দাম কষতে গিয়ে দেখি তাদের কোনই দাম নেই। কোথায় কিসের যেন একটা অভাব ঘটেছে। সমস্ত পৃথিবী আমার চোখে ঝাপসা ঠেকছে, বাবা মা বন্ধু রাজত্ব মৃগয়া কোথাও কিছু নেই। শুধু তোমার মলিন দৃষ্টি ছেয়ে আছে আমার ব্যথাতুর মনকে। আমার মনে কত কি যে আসছে, আমি প্রকাশ করতে পারছি নে।

কঙ্কা তার করুণ চোখ-দুটি তুলে একবার রাজকুমারের মুখের দিকে চাইলে, তার পরে মাটির দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বললে, আমি বুঝেছি

কুমার, কিন্তু এ বেদনা তো ক্ষণিকের, এর ইতিহাস নেই। তোমার কর্ত্তব্য, তোমার রাজত্ব, তোমার শৌর্য্য-বীর্য্যের ইতিহাস আছে। এই যে ব্যথা—এ তো শিউলিফুলের পাতার উপর ভোরের শিশিরটুকুর মতই কাজের তাপে উবে যাবে। এই যে অপরিচয়ের বেদনা, পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেটা মিলিয়ে গিয়ে স্মৃতির উপহাসটুকুই কি তোমার মনে জাগবে না ?

রাজকুমার বললে, না, সে ক্ষণিকের ব্যথাটুকুই নিত্য।

* * * *

কঙ্কার সঙ্গে রাজকুমারের বিয়ে হল। রাজার মত ছিল না, কিন্তু রাণী জোর ক'রে তাঁর মত করালেন—পাছে ছেলে তাঁর আবার পুরোনো চাল ধরে।

তিনি নানাভাবে দুজনকে মিলনের অবকাশ দেন। কঙ্কাকে কতরকম শিখিয়ে পড়িয়ে দেন কুমারের মন রাখতে। কঙ্কা শোনে, কিন্তু তার মন যেন কোথায় থাকে। বিয়ে ক'রে সে যেন কি হারিয়েছে ; সেই হারানো ধনের পিছনে তার মন ঘুরতে থাকে। সে কি তার সেই পুরোনো স্মৃতি ?

রাজকুমার ক্ষুব্ধ হয়। বলে, কঙ্কা, তোমার কোথায় ব্যথা ? কঙ্কা বোঝাতে পারে না, কিন্তু তার চোখ ছলছল করে।

বিকেল হ'লে দুজনে অন্তঃপুরের বাগানে সবুজ ঘাসের উপর গিয়ে বসে। রাজকুমার কত কি যে ব'লে যায়, কঙ্কা শুধু শোনে আর কুমারের মুখের পানে চেয়ে থাকে। রাজপুত্র বলে, কঙ্কা, কথা বল।

কঙ্কা বলে, কথা তো আমি জানি না। কুমার হতাশ হয়ে কঙ্কার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ে। সে তার ছোট্ট হাতখানি কুমারের কপালে বুলিয়ে দেয়। কুমার তার সলজ্জ মুখের পানে চেয়ে থাকে। তার

চোখ বুজে আসে। বাগানের হরিণটিও কঙ্কার গা ছুঁয়ে আকুল আগ্রহে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে, কঙ্কা মাঝে-মাঝে তা'কেও আদর করে।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা হয়ে আসে—ঠাণ্ডা বাতাস বইতে থাকে—আকাশে কত রকমের রঙের খেলা হয়; তার পর অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে আকাশে তারা ফুটতে থাকে—গাছের পাতার ফাঁকে-ফাঁকে জোনাকগুলো জ্বল্‌জ্বল্‌ করে। কুমার ডাকে, কঙ্কা।

কঙ্কা শুধু কুমারের কপালে হাত রাখে। এই অনন্ত ইতিহাসের নীরব সাক্ষী থাকে শুধু সেই হরিণটি আর আকাশের তারা।

দিন যায়। খেলাতে রাজকুমারের আর আগ্রহ নেই, রাজসভায় ব'সে রাজকার্য্য শেখবারও তার মন নেই। সে খালি কঙ্কার কাছে কাছে থাকে। রাণী বিরক্ত হন, রাজা ভীত হন, কঙ্কা লজ্জা পেয়ে আরও ম্লান হতে থাকে।

রাণী বললেন, চল, আমরা তীর্থ করতে যাই।

রাজা বললেন, বেশ। কঙ্কা খুব কাঁদতে লাগল, বললে, সে যে কিছুই জানে না।

রাণী বললেন, আপনিই সব শিখবে মা। আমি তো আবার ফিরে আসছি, এসে তোমার ছেলেমেয়েদের আমি দেখব; ততদিন তুমি ঘর গুছিয়ে নিয়ে ঘরের লক্ষ্মী হয়ে বসবে। কঙ্কা লজ্জিত হয়ে তাঁর পায়ের ধূলো নিলে।

কুমারকে রাজ্যভার দিয়ে রাজারাণী তীর্থ করতে গেলেন।

রাজপুত্র রাজা হয়ে রাজ্য দেখে না, নিশ্চিন্তে সব মন্ত্রীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে অন্তঃপুরে আশ্রয় নিলে। কঙ্কা গোপনে চোখের জল ফেলে। সে বুঝতে পারে না, কিন্তু অনুভব করে, কোথায় যেন একটা মস্ত ফাঁক আছে। এত আদর-আবদারের মধ্যেও সে স্বস্তি পায় না। সে ভাবে, এ মিথ্যা, সে যেন পরের জিনিস চুরি করছে। সে বলত,

ওগো, তুমি কেন নিজেকে নষ্ট করছ, তুমি যে রাজা। কুমার অমরু-শতক থেকে শ্লোক আউড়ে কন্যাকে তার অর্থ শোনাতে বসত।

কন্যা দাসীর মত কুমারের সেবা করতে লাগল। ঘরের সব কাজ সে নিজে করে, অবিশ্রান্ত সেবা দিয়ে কুমারকে ছেয়ে দিলে; ভাবলে এতেও যদি তার বিরক্তি আসে, সেও ভাল। কুমার নিজের সুখে আত্মহারা—লক্ষ্য ক'রে দেখলে না যে এই আত্মসমর্পণের পিছনে কি নিদারুণ বেদনা আর নৈরাশ্য; কন্যা মাঝে মাঝে একলাটি বাগানে গিয়ে ব'সে কাঁদে, আর ভাবে, এর শেষ কোথায়! হরিণটি তার অশ্রুসিক্ত মুখের পানে সজল চোখে চেয়ে তাকে সান্ত্বনা দেয়।

দিন যায়—কন্যার ছেলে হবে। সে আর কুমারের দিকে তত নজর দিতে পারে না, কুমার বিরক্ত হয়!

কন্যা আকুল আগ্রহে আগন্তুকের প্রতীক্ষা করে, এ এসে যদি কাজের পথে নতুন রাজাকে ফেরাতে পারে। সে এখন থেকেই তার ভাবী ছেলেকে মুক্তিদাতা ব'লে ভাবতে লাগল। বাধা-বিপত্তির মধ্যেও কুমার তখনও কন্যাকে নিয়ে আত্মহারা।

কন্যার একটি মেয়ে হ'ল—ধবধবে ফুলের মত। কন্যা বললে, ওগো, দেখ দেখ, এ যেন ঠিক আমার মায়ের মত—তাঁর মুখ এতদিনে আমার মনে পড়ছে।

কুমার কোলে নিয়ে মেয়েকে চুমো খেলে। তার মনে তখন ব্যথা ঘনিয়ে উঠছে। সে কেন আর কন্যাকে একলাটি তেমন ক'রে পায় না?

কন্যা আর বাগানে যায় না। সন্ধ্যাবেলায় দীপটি জেলে পা ছড়িয়ে ব'সে খুকীর চোখে কাজল পরিয়ে দেয়, আর তার সঙ্গে কত রকমের গল্প করে। কোত্থেকে যে এত কথা এত সুর জোটে সে ভেবেই পায় না।

রাজপুত্র তখন একলাটি বাগানে পায়চারি করে। সন্ধ্যার অন্ধকারে

মত তার মনেও অন্ধকার। হরিণটি তার কাছে কাছে ফেরে। ব্যথিত করুণ দৃষ্টিতে তাকে প্রশ্ন করে, সে কোথায়? তার চোখ ছলছল ক'রে ওঠে। তার মনে হয়, সে যেন তাকে হারিয়েছে। বাগানের প্রত্যেকটি ঘাস প্রত্যেকটি গাছ তার স্মৃতিকে পীড়া দেয়।

কঙ্কা বলে, ওগো, ও ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাসে, কার সঙ্গে যেন কথা বলে! আচ্ছা, সত্যি বল তো ওর হাসিটি ভোরের আলোর মত নয়?

কুমার বলে, হুঁ।

কঙ্কা মেয়ে নিয়ে ব্যস্ত। কুমারের মনের খবর সে পায় না। তার সময় কোথায়? সে যে মা।

কিন্তু সে মা হ'লেও, কুমার—কুমারই।

রাজকার্য্যে বিশৃঙ্খলা। কঙ্কা বলে, ওগো, রাজ্য যে যায়! বুড়ো মন্ত্রীটাকে আমার বিশ্বাস হয় না। খুকীর কথা একটু ভাবো।

কুমার অতি মনোযোগের সঙ্গে রাজকার্য্য দেখতে লাগল, প্রজারা খুশি হ'ল, তীর্থে বুড়ো রাজারাণীর আনন্দের সীমা রইল না। কঙ্কাকে লিখলেন, লক্ষ্মীর সংসারে তাঁরা শিগগির ফিরছেন।

দিন যায়—

কুমার মেঘদূত পড়া ছেড়েছে, রাত্রিদিন রাজকার্য্য নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু তার মন খাঁ-খাঁ করে, মাঝে মাঝে তার মনে হয়, সে নিজে এ-সংসারে অনাবশ্যক বোঝা হয়ে আছে—সে যেন এখানে ঠিক খাপ খাচ্ছে না, যে কঙ্কা তাকে ছেড়ে একদণ্ড থাকতে পারত না, তারই যখন তাকে না হ'লে চলে, তখন আর কারও নিশ্চয়ই কোনও প্রয়োজন নেই।

সে আড়াল থেকে মা ও মেয়ের আলাপ শোনে, কঙ্কা এত বকতেও পারে! সে আশ্চর্য্য হয়ে ভাবে, এ গোপন উৎসের খবর সে তো পায়নি!

তার পর যেদিন বুড়ো রাজারাণীর দেশে ফেরার কথা, সেদিন থেকে আর কুমারের সন্ধান পাওয়া যায় না।

কঙ্কা চমকে উঠল, সত্যিই তো সে তার প্রিয়তমকে অনাদর করেছে। এতদিনের সঞ্চিত আনন্দ, ব্যথার অশ্রু হয়ে ঝরতে লাগল।

* * * *

সে খুকীর সঙ্গে গল্প করে, শুধু তাঁরই কথা। সে কাঁদে আর খুকীর ছোট্ট হাত দুখানি দিয়ে নিজের চোখ মোছায়—বলে, মা, সে আমাকে ছাড়তে না হয় পারলে, কিন্তু তোকে অবহেলা ক'রে গেল কেমন ক'রে?

বাগানের সেই মাধবীকুঞ্জে কঙ্কা খুকীকে কোলে নিয়ে ব'সে তার সঙ্গে কত কথা বলে, পুরোনো স্মৃতিতে তা'র চোখ ছলছল ক'রে আসে, ভাবে, এ বুঝি একটা দুঃস্বপ্ন; আর খুকীকে জোরে বুকে চেপে ধরে।

খুকী ডাকে, মা!

কঙ্কা কাঁদে।

খুকী এখন আপন মনে খেলা করে, মাঝে মাঝে ছুটে গিয়ে মার গলা জড়িয়ে ধ'রে জিজ্ঞেস করে, মা, বাবা কোথায়?

মা বলে, তাকে ডাক্ তো মা, তিনি তোর ডাকে কেমন ক'রে না এসে থাকতে পারেন, দেখি!

খুকী 'বাবা, বাবা' ব'লে বাগানময় ছুটে বেড়ায়, বাবা আসেন না। বুড়ো রাজা চারদিকে সন্ধান করলেন। তিনি প্রায়ই কঙ্কাকে জিজ্ঞেস করেন, মা, কি হয়েছে বল তো?

কঙ্কা বলে, বাবা আমি তো কিছু জানি নে।

তার পর খুকী বড় হ'ল। কোন্ দেশের এক রাজপুত্রের সঙ্গে তার বিয়ে হ'ল।

যেদিন সে তার শ্বশুরঘর করতে যাবে, সেদিন কঙ্কা চারদিক অন্ধকার দেখতে লাগল। তার বুক ফেটে দীর্ঘশ্বাস বের হ'ল, বিয়ের পরের দিনগুলো তার চোখের সামনে ভাসতে লাগল, মেয়েকে বুকে নিয়ে বললে, স্বামীর অনাদর ক'রো না মা।

বর কনে যখন বিদায় হ'ল তখন প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে।

কঙ্কা শূন্যমনে বাগানের সেই সবুজ ঘাসের ওপর বসল, যেখানে দিনের পর দিন তার প্রিয়তম তার কোলে মাথা রেখে তাকে মেঘদূতের বিরহী-বিরহিণীর ব্যথা শুনিয়েছে, সে দেখলে তার কোথায়ও আর কিছু নেই—চারদিকে অন্তহীন অন্ধকার। শুধু স্মৃতির আলোহীন জ্বালাটুকু বুকের মধ্যে জ্বলতে লাগল, সে ঘাসের উপর লুটিয়ে পড়ল।

সেই হরিণটি এসে আবার তার আঁচল ছুঁয়ে তার মুখের পানে চেয়ে ব'সে করুণ চোখের দৃষ্টিতে তাকে প্রশ্ন করলে ওগো, সে কোথায়, সে কোথায়?

অন্ধকার ঘনিয়ে এল, আকাশে তারা জ্বলতে লাগল। চোখের জলে চারদিক ঝাপসা হয়ে এল।

দিন যায়, কিন্তু ব্যথার ভার ভারী হ'য়ে ওঠে—শূন্যতাকে আরও শূন্য ব'লে মনে হয়, চোখে আর জল আসে না।

ত্রিধারা

অনেক যন্ত্রণা অনেক কষ্টের পর প্রসূতির একটি ছেলে হ'ল; দাই বললে, দেখ, দেখ, কি চমৎকার! ওগো, তোমার কষ্ট সার্থক হয়েছে।

কিশোরী মায়ের সমস্ত দেহ পাথরের মত শক্ত হয়ে গেল। সে জোর ক'রে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তার আয়ত সজল কালো চোখ দুটি বুজে কান্নাভরা কণ্ঠে ব'লে উঠল, থাক, থাক, আমি চাই না দেখতে, ওকে সরিয়ে রেখে দাও,—ওকে আমি ভালবাসতে পারব না।

দাই চমকে উঠল, বললে, এমন শিউলিফুলের মত ছেলে মা, তোমার নিজের পেটের ছেলে, একবার কোলে নাও, একবার দেখ।

সদ্যঃপ্রসূত ধবধবে শিশুকে দাই তার মায়ের বুকের কাছে শুইয়ে দিয়ে বললে, মা হয়ে অমন হেলাফেলা ক'রো না গো, তা হ'লে এই কচি ছেলে বাঁচবে না। দেখ, এ যে ককিয়ে কেঁদে উঠল, ওকে বুকে টেনে নাও, একটু মাই দাও—কেঁদে কেঁদে যে ছেলে সারা হয়ে গেল!

মায়ের প্রাণ তবু গলল না।—না, না, ওকে সরিয়ে নাও, ও আমার জীবনের অনেকখানি শুষে নিয়েছে, ও রাক্ষস। আমার অনেক সুখে ও বাধা দিয়েছে; আমার যৌবন, আমার সৌন্দর্য্য, আমার রূপ ও কেড়ে নিয়েছে। আমি ওকে কখনও চাইনি—ওকে ভালবাসব কেমন ক'রে?

—পাষাণী, একবার খালি চোখ মেলে দেখ, একটিবার বুকে টেনে নাও। দেখো, আর বুক থেকে নামাতে পারবে না। দেখছ না ওর

জন্যে তোমার মাই-দুধ ঝরে পড়ছে, ও চোখ মেলে মিটমিট ক'রে তোমাকেই খুঁজছে। ঠিক তোমার স্বামীর মত চোখ। দেখ।

হোকগে, আমি দেখতে চাই না। ওই তো আমার স্বামীর ভালবাসা নষ্ট করেছে, আমি পারব না ওকে বুকে নিতে।

দাইয়ের চোখ ছলছল ক'রে উঠল। কাঁদতে কাঁদতে সে ব'লে উঠল, এমন করলে তো ছেলে বাঁচবে না মা, দেখছ না, প্রাণটা ওর কেমন ধুকধুক করছে! মায়ের বুকে ঠাঁই না পেলে ও আর কতক্ষণ? নাও নাও, একটু দয়াও কি হয় না?

পেছন ফিরে মা ঘুমিয়ে পড়ল। কাঁদতে কাঁদতে ছেলেও বুঝি ঘুমল।

ছেলের ঘুম আর ভাঙল না।

* * * *

ব্যথা-কাতর পাণ্ডুর মুখখানি তুলে কালো চোখের শীর্ণ চাউনি দিয়ে ডাক্তারের দিকে চেয়ে যন্ত্রণা-বিজড়িত কণ্ঠে মেয়েটি ব'লে উঠল, ডাক্তারবাবু, শেষে এই হ'ল?

ডাক্তার তাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, হ্যাঁ মা, তোমার পেটের ছেলে ম'রে গেছে।

মরে গেছে! না ডাক্তারবাবু, অমন কথা বলবেন না।

গভীর যন্ত্রণায় মেয়েটি বিছানার চাদরখানি তার শিথিল হাতের মুঠি দিয়ে চেপে চেপে ধরতে লাগল। অস্বাভাবিক বেদনায় তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ডাক্তার বললেন, ভগবান্ মঙ্গলময়, এ তোমার ভালই হ'ল, নইলে এ দুনিয়ার কাছে তোমার ও-ছেলের কি পরিচয় দিতে মা? ও যে তোমার ভুলের সাক্ষী হয়ে বেঁচে থাকত! তুমি দুঃখ ক'রো না।

মেয়েটির দুই চোখের কোণ বেয়ে অশ্রুর ধারা ব'য়ে গেল।

অমন কথা বলবেন না, ডাক্তারবাবু। ভাল কিছুই হয় নি। ও আমার বুকখানা খালি ক'রে গেল। ওর পরিচয় ছিল না? ছিল বইকি ডাক্তারবাবু, ও যে মায়ের বুকজোড়া ধন, সাত রাজার ধন মানিক এসেছিল। আমি হতভাগী, তাই রাখতে পারলাম না। মায়ের ছেলে—এই পরিচয়ই ওর যথেষ্ট হ'ত ডাক্তারবাবু! ওকে আমি প্রতিদিন প্রতিনিয়ত কামনা করেছি—ওকে আমার প্রয়োজন ছিল ডাক্তারবাবু।

চুপ কর মা।

ডাক্তারবাবু, সব কি শেষ হয়ে গেছে?

হ্যাঁ মা, তোমার—

আপনি ভুল করছেন ডাক্তারবাবু, আমার ছেলে আমার পাপের সাক্ষী নয়, আমার বুকভরা ভালবাসার বদলে দেবতার অযাচিত দান।

ডাক্তার মেয়েটির কপালে হাত রেখে শান্তভাবে বললেন, চুপ কর মা, তুমি অত অস্থির হ'য়ো না, তা হ'লে তোমাকেও বাঁচাতে পারব না।

বেঁচে আমার লাভ! মেয়েটি নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল।

গভীর রাতে কখন সে ঘুমিয়ে পড়ল। সে ঘুম আর ভাঙল না।

* * * *

চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার, পথ অতি দুর্গম, কঙ্কর-কণ্টক-সমাকীর্ণ; তার কচি পা দুখানি ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। ছোট হাত দুখানি দিয়ে অন্ধকারে সে পথ খুঁজে চলেছিল; দু পাশে দুর্ভেদ্য প্রস্তর-প্রাচীর, বরফের মত শীতল—কঠোর। অন্ধকার কি ভয়ঙ্কর! তার কচি প্রাণ ভয়ে মূর্চ্ছিতের মত হয়ে পড়ল। যন্ত্রণায় সে কেঁদে উঠল; কিন্তু কেউ তাকে সাহায্য করতে এল না, কেউ একটু আশ্বাসের কথা পর্য্যন্ত বলল না। সেই প্রাচীর-ঘেরা অন্ধকার পথে ক্লান্তপদে অবসন্ন-চিত্তে সে চলেছিল। কান্নায় কণ্ঠস্বর রুদ্ধ, তার শিশু-দেহ ক্ষতবিক্ষত, শিশু-মন ভয়গ্রস্ত।

দূরে—অতি দূরে সূচীভেদ্য অন্ধকার অতিক্রম ক'রে একটি ক্ষীণ আলোক-রশ্মি দেখা গেল; হায়, এই নিবিড় করাল তিমির ও অজানিত ভয় তাকে গ্রাস করবার আগে কি সে আলোকের কাছে পৌঁছতে পারবে না! কিন্তু সে যে বহু দূর! সে ক্লান্তিতে অবসন্ন। কারও স্নেহ-করস্পর্শ কি তাকে সাহায্য করবে না, কারও আশ্বাস-বাণী! এই দুর্ভেদ্য অন্ধকার থেকে কেউ কি তাকে আলোকলোকে নিয়ে যাবে না?

কোথায় স্নেহ, কোথায় স্পর্শ! শুধু দুর্গম অন্তহীন পথ আর অন্ধকার।

যুগযুগান্ত পার হয়ে গেছে; কোথায় এসেছে সে জানে না; শুধু ক্ষীণ আলোর রেখাটুকু তাকে নিয়ে চলে। মূর্চ্ছাপন্ন দেহ নিয়ে সে পথ চলেছে, পথ তবু ফুরোয় না।

সহসা একখানি কোমল হাত তাকে স্পর্শ করল, সে চমকে উঠল। কে যেন মৃদু-মধুর স্বরে তার কানে কানে বলল, বাবা, বাপ আমার!

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে পথিক-শিশু কেঁদে উঠল; তার সমস্ত দেহ-মন এক সঙ্গে ঝঙ্কার দিয়ে ডাকল, মা!

তার যুগযুগান্তের আকাঙ্ক্ষিত বাহুর নিবিড় উত্তপ্ত আলিঙ্গনে সে ধরা দিল। মায়ের বক্ষনীড় সে আশ্রয় করল। তার সব জ্বালা জুড়িয়ে গেল, মায়ের বুকভরা আলিঙ্গনের মধ্যে পথের রিক্ততা, ব্যর্থতা, ক্লান্তি এক নিমিষে সে ভুলে গেল। চুমুতে চুমুতে মা তার মাথা মুখ চোখ ছেয়ে দিলেন। শিশু অবাক হয়ে তাঁর মুখের পানে চেয়ে ব'লে উঠল, তুমি তো আমার মা নও।

অতি মৃদু উত্তর এল, না বাবা, আমি তোমার মা নই; কিন্তু যে ছেলের জন্যে আমি দিনের পর দিন পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছি, তপস্যা করেছি, কেঁদেছি, তুমি আমার সেই ছেলে। ভগবান তোমায় মিলিয়ে দিয়েছেন, আজ হতে আমিই তোমার মা।

শিশু আবার সেই কোল আশ্রয় ক'রে নিশ্চিন্ত হ'ল। মা ও ছেলে সেই অন্ধকার পথে হাত ধরাধরি ক'রে বেরিয়ে পড়ল সেই আলোক লক্ষ্য ক'রে।*

* Miss Beulah Poynter-এর গল্পের ছায়া অবলম্বনে

মৃত্যু-দর্শন

রাত্রি সাড়ে দশটার সময় নাট্যভারতী রঙ্গমঞ্চে কবি হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের দধি-বিক্রেতার (Curd-Seller) গান শুনিয়া বাড়ি ফিরিতেছিলাম। সহজ ও সাধারণ উপমার সাহায্যে বর্ত্তমান সভ্যজগতের যে রূপ আমাদিগকে কবি দেখাইলেন, তাহা মোটেই লোভনীয় নয়। আধুনিক পণ্যদ্রব্যের কথা বলিতে গিয়া তিনি গাহিলেন—

"O, all things are expensive now
Because of war and strife,
The only thing that's really cheap
To-day is human life."

[যুদ্ধবিগ্রহ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্যে সব জিনিসেরই দাম গেছে চড়ে; আজকের দিনে সত্যিকার সস্তা যদি কিছু হয়ে থাকে সে মানুষের জীবন।]

যে মানুষের জীবনকে জয়যুক্ত করিবার জন্য এ যুগের বিজ্ঞান-আশ্রিত সভ্যতা অহরহ চেষ্টিত আছে, সেই মানুষই আজ অকালে জীবন হারাইয়া ধূলিমুষ্টির মত পথে পথে জঞ্জাল রচনা করিতেছে। সৌধ-কিরীটিনী কলিকাতা নগরীর রাজপথে মৃত্যুর কি কদর্য্য রূপই না আমরা দেখিতেছি!

মনটা খুব বিষণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। "কি ও কেন"র ভাবনা স্বভাবতই মনে জাগিতেছিল। ভাবিতে ভাবিতে প্রায় বারো বৎসর পূর্ব্বে দেখা আমার এক স্বপ্নের কথা মনে পড়িল। স্বপ্নটি সেই সময়েই অসম্পূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। আজ সহসা সেই পুরাতন স্বপ্নবৃত্তান্তই আমার মনে পুনরাবর্ত্তিত হইল।

পরিশ্রান্ত দেহে আহারাদির পর সেদিন শয়ন করিয়া ছিলাম, গৃহিণী আমার পাশেই উপবিষ্ট ছিলেন। সামনের দরজাটা খোলা ছিল। চকিত হইয়া বসিলাম—দেখিলাম, একজন ভদ্রমহিলা ধীরপদক্ষেপে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। থতমত খাইয়া উঠিয়া বাহিরে যাইব ভাবিয়া গৃহিণীর দৃষ্টি আগন্তুক ভদ্রমহিলার দিকে আকর্ষণ করিতে গিয়া দেখি, গৃহিণী নাই। এখন পর্য্যন্ত ভরসা করিয়া আগন্তুক মহিলাটিকে ভাল করিয়া দেখি নাই। এইবার চাহিলাম—অনবগুণ্ঠিতা, কৃষ্ণবর্ণা এক নারীমূর্ত্তি, আলুলায়িত কুঞ্চিত কেশদাম প্রায় ধরাতল স্পর্শ করিতেছে। এত চুল এবং কালো দেহে এত রূপ আমি জীবনে দেখি নাই। আগন্তুকার মুখ ঘিরিয়া জ্যোতির্মণ্ডল, চোখে প্রখর দৃষ্টি, নাসিকা স্ফুরিত। সম্পূর্ণ নিরাভরণ দেহ। গৃহিণী এই সময়ে আমাকে বিপদে ফেলিয়া কোথায় গেলেন? আমি কি যে করিব, কি যে বলিব, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। অপরূপ ভঙ্গীতে ডান হাতখানি উত্তোলিত করিয়া আমাকে নিবৃত্ত হইতে ইঙ্গিত করিয়া রমণী বলিলেন, বৎস, তুমি উপবেশন কর, আমার জন্য ব্যস্ত হইবার আবশ্যক নাই।

আমি তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করিতেই তাঁহার অপরূপ ম্লান কালো মুখে শীর্ণ একটু হাসির আভাস দেখিলাম। বলিলেন, বৎস, আমার ব্রত আজিও উদ্‌যাপিত হয় নাই, তোমার ও-শয্যায় আমি বসিতে পারিব না।

প্রশ্ন করিলাম, আপনি—

আমি কৃষ্ণা, দ্রুপদনন্দিনী। পঞ্চপাণ্ডব আমার স্বামী, ধৃষ্টদ্যুম্ন আমার ভ্রাতা, আমি যজ্ঞবেদীসমুত্থিতা যাজ্ঞসেনী। খল কর্ণ ও ধৃতরাষ্ট্রের পিশাচ পুত্রেরা হস্তিনাপুরের রাজসভাতলে পঞ্চবাসবতুল্য পঞ্চ স্বামীর সম্মুখেই আমার কেশাকর্ষণ করিয়া বস্ত্রহরণ করিতে সেই যে চেষ্টা পাইয়াছিল, অন্তঃপুর হইতে একবস্ত্রা আমাকে ধরিয়া আনিয়া যে লাঞ্ছনা করিয়াছিল, আজিও তাহার প্রতিকার হয় নাই। সেদিন আমার এই

উন্মোচিত বেণী হাতে লইয়া আমি পণ করিয়াছিলাম—দুঃশাসনের হৃদিরক্তে এই কেশকলাপ সিঞ্চিত না হইলে আমি পুনর্ব্বার বেণীবন্ধন করিব না। দেখিতেছ না, আমার ভুজঙ্গসদৃশ কুটিলাগ্র সুদর্শন কেশকলাপে জটা পড়িয়াছে! আমার বেণীবন্ধন আজিও হয় নাই।

বিস্মিত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিলাম—স্থির অচঞ্চল মুখ। দ্বিধা-জড়িত কণ্ঠে বলিলাম, কিন্তু মহাভারতকার তো অন্য রকম লিখিয়াছেন; কুরুক্ষেত্রে মহাবীর পাণ্ডবেরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সহায়ে কৌরবকুলের নিধন সাধন করিয়া—

ভুল বৎস, মহাভারতকার মিথ্যা রচনা করিয়াছেন। পিশাচ কৌরবেরা আজিও বাঁচিয়া আছে; আমার অক্ষম স্বামীরা এখনও প্রতিবিধান করিতে পারিল না।

আমার মুখ দিয়া বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না; মুগ্ধ সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম। স্নিগ্ধকণ্ঠে রমণী কহিলেন, বৎস, কৌরব যদি মরিত, তাহা হইলে—তাহা হইলে—শুনিতে পাইতেছ না হাহাকার? অন্তঃপুর হইতে বাহিরে টানিয়া আনিয়া নারীর লাঞ্ছনা করিতেছে—বুকফাটা আর্ত্তনাদে গগন বিদীর্ণ হইয়া গেল। দুঃশাসন মরিল কোথায়? বধির দেবতা প্রহর গনিতেছেন, কবে পঞ্চস্বামী পাঞ্চালীর পণরক্ষা হইবে। নারীকণ্ঠের কাতর হাহাকার সমস্ত ভারতের উপর দেবতার রুদ্ররোষ টানিয়া আনিবে না? ওই দেখ বৎস—

ফিরিয়া চাহিয়াই আমি অতর্কিত বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া গেলাম। দেখিলাম, বিস্তীর্ণ মরুভূমির উপর সারি সারি চিতা জ্বলিতেছে; গগন-ললাট অগ্নিবর্ণ ধারণ করিয়াছে। শকুনি গৃধিনী উড়িতেছে। শৃগাল-সারমেয় প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

হাত জোড় করিয়া সেই ভয়ঙ্করকে প্রণাম করিলাম।

মাথা তুলিতেই দেখি স্বতন্ত্র লোক। প্রশ্ন করিলাম, আপনি?

আমি পদ্মিনী।

পদ্মিনী!

হাঁ বৎস, আমি চিতোর হইতে আসিতেছি। লোকে বলিত, আমি চিতোরের রাজ-উদ্যানে প্রফুল্ল পদ্মিনী। লোকের সে কথা সত্য নয় বৎস; আমি চিতোরের অভিশাপ। জহরব্রত করিয়া মরিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু আমার মৃত্যু হয় নাই। দগ্ধ দেহ লইয়া আমি চিতাশয্যা হইতে উঠিয়া আসিয়াছি। আমার ভীমসিংহের মত স্বামী মরিয়াছে। গোরা মরিয়াছে, বাদল মরিয়াছে, স্বর্ণ চিতোর ছারেখারে গিয়াছে। কিন্তু আমার মৃত্যু হইল কই? প্রেতের মত ভারতের শ্মশানে শ্মশানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। বৎস, বলিতে পার, আমার শাপমুক্তি হইবে কবে?

রমণীর দিকে চাহিয়া দেখিলাম—দগ্ধ দেহ, কেশবিহীন মস্তক, কিন্তু নীলপদ্মের মত সুন্দর দুইটি চোখ। সেই চোখ দুইটি দিয়া অবিরলধারে অশ্রু ঝরিতেছে। রমণী দূরে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন, বলিলেন, বৎস, দেখ—

দেখিলাম। কুণ্ড জ্বলিতেছে, লেলিহান অগ্নিশিখা গগনগাত্র স্পর্শ করিবার জন্য লকলক করিয়া উঠিতেছে। আকাশে রুধিরের রঙ। সেই অগ্নিকুণ্ডকে বেষ্টন করিয়া দ্বাদশ সহস্র রাজপুতরমণী অগ্নিদেবের স্তব করিতেছেন—"হে অগ্নি, হে পবিত্র উজ্জ্বল স্বর্ণকান্তি, পৃথিবীর অন্ধকার তোমার আলোকে বিদূরিত হোক। হে অগ্নি, হে মহাতেজ, তুমি দুর্ব্বলের বল, সবলের সহায়; হে দেবতা, হে ভয়ঙ্কর, আমাদের ভয় দূর কর, সন্তাপ নাশ কর, আশ্রয় দাও। লজ্জা-নিবারণ, দুঃখ-বিনাশন অগ্নিশিখা, তুমি জীবনের শেষ গতি, বন্ধনের মহামুক্তি।"

প্রচণ্ড আলোয় রাত্রির অন্ধকার টলমল করিয়া উঠিল। আমি সভয়ে সেই ভয়ঙ্করকে প্রণাম করিলাম।

আপনি ?

আমি বাংলা দেশ, তোমার মাতৃভূমি।

বন্দে মাতরম্, এখানে কেন মা ?

বৎস, তোমার নিকট কিছু নিবেদন করিবার আছে।

ভীতচকিত হইয়া উঠিলাম, বলিলাম, মা, এই অক্ষমকে ক্ষমা কর, তোমার কোন কথাই শুনিতে পারিব না। অর্ডিন্যান্সকে আমি ভয় করি।

কিন্তু আমাকে ভালবাস না ?

যথেষ্ট বাসি মা, কিন্তু গোপনে। প্রকাশ করিয়া কিছু বলিবার ভাষাও নাই, সাহসও নাই।

বৎস, আমি আশীর্ব্বাদ করি তোমার সাহস হোক, আমি চলিলাম।

মা চলিয়া যাইতেছিলেন, আমি তাঁহার আঁচল টানিয়া ধরিলাম, বলিলাম, মা, দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা আসিয়াছিলেন, চিতোররাজমহিষী পদ্মিনী আসিয়াছিলেন—তাঁহারা দুইজনে দুইটি দৃশ্য দেখাইয়া গেলেন। তুমি কিছু দেখাইবে না ?

মা দূরে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিলেন, বলিলেন, দেখ—

দেখিলাম।

কি দেখিলাম, বলিতে পারিব না। অতীত যতই ভয়ঙ্কর হউক, তাহা অতীত, তাহার ভীষণতা আমাকে স্পর্শ করে না। কিন্তু ভবিষ্যৎ ? সেই ভয়ঙ্কর ভবিষ্যৎ মায়ের কৃপায় প্রত্যক্ষ করিয়া আমি বিমূঢ় হইয়া রহিলাম।

* * * *

সেদিন স্বপ্নঘোরে ভবিষ্যতের গর্ভে যাহা দেখিয়াছিলাম, কল্পনাও করিতে পারি নাই যে, মাত্র বারো বৎসরের মধ্যেই সেই ভয়ঙ্করের বাস্তব-

ভীষণ প্রত্যক্ষ রূপ দেখিতে পাইব। স্বপ্ন ও কল্পনার সকল সীমা লঙ্ঘন করিয়া মৃত্যু যে একটা সভ্য দেশের সভ্যতম নগরে এমন করাল ছায়া বিস্তার করিতে পারে, চোখে না দেখিলে তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। বর্ত্তমান যুদ্ধই কি তাহার একমাত্র কারণ? ভাবিতে ভাবিতে আবার বঙ্গমাতাকে স্বপ্নে দেখিতে বাসনা হইল। চোখ বুজিয়া শয়ন করিতেই প্রথমে বিগত তিন বৎসরের ইতিহাস ছায়াছবির মত আমার মানসনেত্রে আবর্ত্তিত হইতে লাগিল। সংবাদপত্র এবং সাময়িক পত্রের টুকরা টুকরা রচনাও স্মরণে উদিত হইল।

মালয়, ব্রহ্মদেশ ও সিঙ্গাপুরে জাপানীরা হানা দেওয়ার পূর্ব্বেই ব্ল্যাক আউটের কৌতুক এবং বিভ্রাট সমানেই আরম্ভ হইয়াছিল। প্রথম প্রথম কিছু অসুবিধা হইলেও অন্ধকারকে অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ত করিয়া লইতে বিলম্ব হয় নাই। বাফ্‌ল, স্লিট ট্রেঞ্চ এবং ব্যাফল ওয়াল ব্ল্যাক আউটের মত সহিয়া গিয়া আমাদের কাব্যের বিষয় হইয়াছিল। সমস্ত অসুবিধা ও দুঃখের মধ্যেও এ-আর-পি-উপদেষ্টাগণ মুহুর্মুহু আদেশ ও ঘোষণা জারি করিয়া আমাদের অসহনীয় একঘেয়ে জীবনে বৈচিত্র্য আনিতে-ছিলেন। কাচ অপসারণ বা বন্ধন এবং পরিচয়-চাকতির ব্যবহার লইয়াও অনেক রহস্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। এমন সময় হঠাৎ রেঙ্গুনে জাপানী বোমাবর্ষণের সংবাদ কলিকাতায় পৌঁছিতেই লণ্ডভণ্ড শুরু হইল। আমরা চকিত হইয়া উঠিলাম।

আসছে গো ঐ তারা আসছে,
নীল আকাশের গায়ে রজতবিন্দু শোভা
তাদের সম্ভাবনা ভাসছে।

ভাসছে মানসে নব সম্ভাব-শঙ্কা,
জননী জন্মভূমি চির-অকলঙ্কা;

কিন্তু আমাদের মনে তখনও আশা ছিল। সমস্ত ক্ষয়-ক্ষতি বিলয়-বিলুপ্তির সম্ভাবনার মধ্যেও মহাকালের কল্যাণরূপে আমাদের বিশ্বাস ছিল, তাই নটরাজ এবং শিব—এই দুই মূর্ত্তিতেই সেদিন তাঁহাকে কল্পনা করিতে আমাদের বাধে নাই। আমরা এক দিকে যেমন বোমার ভয়ে স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্র, আত্মীয়-বান্ধবের পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার ক্লেশকর সম্ভাবনায় অনুভব করিয়াছিলাম—

দুদিনের সহযাত্রী, এল ঝড়, হ'ল ছাড়াছাড়ি,
এক কুলায়ের পাখী দুই পারে বাঁধে দুই নীড় ;
পাহাড়ের জলধারা অকস্মাৎ প্লাবি দুই তীর
প্রান্তরের মানুষের ভাসাইল যত্নে-গড়া বাড়ি।
ঝড়ের কারণ খুঁজি, মেপে মরি তটিনীর নীর,
তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ জলে চাহি পুন জমাইতে পাড়ি,
নবতর ঝঞ্ঝা আসে বাকি যাহা তাও নেয় কাড়ি,
পাকা ঘুঁটি যায় কেঁচে, চিরস্থির নিয়ত অস্থির।
চোরাবালি-ভিত্তি 'পরে আমরা বাঁধিয়া আছি ঘর,
সে ঘর তাসের ঘর, নিয়তির নিষ্ঠুর নির্দ্দেশ,
গড়ার নিয়তি ভাঙা; তত দুঃখ যত আড়ম্বর—
অকরুণ হত্যা তারো উপলক্ষ্য মাটি আর দেশ !
মদমত্ত মানুষের লোভ নিল নাম মনোহর—
দুই পক্ষে শক্তিহীন সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ।

এবং এই বিরহ-বিচ্ছেদ অবস্থায় একটি ক্ষুদ্র বালিকাকেও যেমন তাহার মাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে শুনিয়াছিলাম—

মাগো, আমরা পালিয়ে এলাম চ'লে
বাবা কেন রইল কলকাতায় ;
কখন দেখ নিলে আমায় কোলে

এস না ঘুম চোখের দুই পাতায়!

ঝাপসা চোখে ঘুমুই কেমন ক'রে
যতই কেন দোলাও মাগো জোরে;
মিথ্যেমিথ্যি বকছ তুমি মোরে
বুদ্ধি তোমার একটুও নেই মাথায়,
নইলে তুমি আসবে কেন চ'লে
বাবা যখন রইল কলকাতায়!

তেমনই অন্য দিকে এ কথাও ভাবিতে পারিয়াছিলাম—

শ্মশানের ধ্বংসস্তূপে জীবনের জাগে নবাঙ্কুর,
দধীচির অস্থি হতে বড় আরো দধীচির প্রাণ,
বজ্র-গর্জনের ঊর্ধ্বে শুনা যায় বাঁশী সুমধুর
যুগে যুগে মহাকাল শিবরূপে করেন কল্যাণ।
... ...
জীবন পবিত্র হয় রহি রহি করি মৃত্যুস্নান—
যুগে যুগে মহাকাল শিবরূপে করেন কল্যাণ।

সেই অবস্থায় কিছুকালের জন্যও আমাদের মানসদর্পনে মৃত্যু ও বিরহের একটা সহনীয় রূপ আমরা গড়িয়া তুলিয়াছিলাম—

বিরহ-বিলাস খুঁজে আজ যেতে হয় না বাহিরে,
মৃত্যু আসে—ঘরে শুয়ে, আপনার পরিচিত ঘরে
প্রেয়সীর হাতে রচা দৈনন্দিন আরাম-শয্যায়,
ঊর্ধ্ব হতে অকস্মাৎ নিম্নমুখে ছুটে আসে বাণ,
[illegible]া-বিক্ষেপ নাই—সে সময় হয় না কাহারো।
প্রিয় ও প্রিয়ার মাঝে নেমে আসে গাঢ় ব্যবধান,
নেমে আসে রাত্রির আঁধার,
নেমে আসে বন্যাস্রোতে বিরহের সমুদ্র বিপুল।

বিরহের রাজপাটে আমরা বসিয়া আছি সবে,
হাসি খেলি গান গাই বিরহীরা সকলে মিলিয়া,
তলে তলে বিরহের ক্ষীণ সুর ফল্গুধারা সম
কুলুকুলু কলকল মনে মনে অবিশ্রাম বহে।
কেন, কেন, কেন—প্রশ্ন শুধু
গভীর অন্তর মাঝে ক্ষণে ক্ষণে হয় যে বাহির।
কার কাছে জানাব নালিশ ?
তোমার আমার মত সকলেই জানি অসহায়।
নিয়তির পাপচক্রে বিশ্বব্যাপী বিরহ-পাথার
করিতেছে থৈ থৈ অসহায় মানুষেরে ঘিরি।
কেহ কিছু নাহি জানে, কেন কেন—কে দিবে উত্তর !

কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের সকল প্রতীক্ষা ও সংশয়কে উপেক্ষা করিয়া মৃত্যু নিম্নমুখী অগ্নিশলাকা বা বোমারূপে দর্শন দিতে বিলম্ব করিল। শহরের নানা সুবিধায় অভ্যস্ত নাগরিক মানুষ পল্লীর শ্যামল শোভা, গাঢ় নীল আকাশ ও দিগন্তবিস্তারী প্রান্তরের মহিমা দীর্ঘকাল সহ্য করিতে পারিল না; অন্নাভাব, জলাভাব এবং ঔষধ ও চিকিৎসকের অভাবে নানাবিধ ব্যাধির প্রকোপে পীড়িত হইয়া শহরের মানুষ আবার শহরে ফিরিতে লাগিল। সেই সঙ্গে বেনো জলের মত নিরন্ন গ্রামবাসীরাও শহরে প্রবেশ করিয়া হঠাৎ পথঘাট ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল। শুরু হইল আমাদের স্বাধীনতা-যুদ্ধে নূতন পর্ব্ব; রাজশক্তির সহিত সংঘর্ষে মৃত্যু সম্পূর্ণ অভাবনীয়রূপে আমাদের দর্শন দিল। রাজায় প্রজায় এই সংঘর্ষের মধ্যে আমরা শহরের আর এক চেহারা দেখিতে পাইলাম; কা[illegible] তাহা এই রূপ লইয়াছিল—

প্রেয়সী, আজিকে শারদ-যামিনী
চাঁদের হাসিতে ভাসিয়া যায়,

পূবালি বাতাস বহে মৃদু মৃদু
দোলে লঘু মেঘ আকাশ-গায়।

সঙ্গীবিহীন প্রাণ গায় গান
মিলন-রাগিণী বিরহ মাঝে,
ভুল হয়ে যায় উদ্যত অসি
চলি অভিসারে অলস সাঁঝে।

চকিতে মাথার উপরে বিমান
বাতাস কাটিয়া যায় যে কেঁদে,
মনে প'ড়ে যায় তমসার তীর,
নিষাদের শর ক্রৌঞ্চে বেঁধে।

মরমের শ্লোক বাষ্প হইয়া
ভরে দু নয়ন অবোধ শোকে,
এখানে বসিয়া পারি যে বুঝিতে
জল ভরিয়াছে তোমারো চোখে।

জানি তুমি আমি ফেলি যে চরণ
পীড়িত ধরার তপ্ত বুকে,
পাতাল-গর্ভে রহি রহি শুনি
ধ্বনি অবিরাম কাহার মুখে,
"আমি যে ক্ষুধিত—কে মিটাবে ক্ষুধা",
কে মিটাবে ক্ষুধা ক্ষুধিতা মা'র ?

লক্ষ ছেলের বুকের রক্তে
মিটিবে পিপাসা পিপাসিতার ?

উঠে চৌদিকে ক্রন্দনধ্বনি—
কিম্বা জননী, রাখিবে কেবা ;